

সৌন্দর্য্য





পল্লীবালা

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

Art - -
of
Beauty. -





প্রকাশক

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট ।

***

মুদ্রাকর

শ্রীশশিভূষণ দত্ত,

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "অলোকা প্রেস" ।

***

চিত্র-শিল্পী

থ্যাকারস্পিঙ্ক কোংর ফটো-টাইপ কোং ।

***

চিত্রশিল্পে উৎসাহদাতা

মিষ্টার শ্লেটার ও মিঃ বুথরয়

***

প্রাপ্তিস্থান

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ।



দ্বিতীয় সংস্করণ

পুনর্যাত্রা

১৩২৭



মূল্য ২৲

Souvenier.



শ্রী————————————

My own

সৌন্দর্য্য বুঝিতে পার, সৌন্দর্য্য পূজিতে পার,
পার তুমি করিবারে Beauty admire.
তাই এ সৌন্দর্য্য-হার, পাঠালেম উপহার,
Approval মাত্র আমি করি Aspire.

শ্রী————————————



সৌন্দর্য্য-সুষমা





সুরঞ্জিত চিত্র	চিত্রকর	চিত্রশিল্পী
পল্লীবালা	কে, ভি, সেন	কে, ভি, সেন
সুন্দরী	এন, সরকার	”
স্নানান্তে	শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ	”
প্রত্যাখ্যান	”	ফটোটাইপ কোং
বিরহিণী	”	”
লজ্জাবতী	”	”
আবেশ-চুম্বন	”	”
স্নানে	”	”
পলাতকা	”	”
পাঠে তন্ময়	”	”
মানভঞ্জন	”	”
প্রতীক্ষায়	বি, দত্ত	”
অভিমান	পি, জি, দাস	পি, জি, দাস
উপহারে	”	”
বীণাবাদিনী	শ্রীভবানীচরণ লাহা	”
ভক্তিমতী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার	এস, সি, মিত্র

চিত্র	চিত্রকর	চিত্রশিল্পী
পদ্মিনী, চিত্রাণী, শঙ্খিনী, হস্তিনী	এইচ, ঘোষ	থ্যাকার স্পিঙ্ক
সৈকত-প্রেম প্রতীক্ষায় মাতৃস্নেহ		পি, জি, দাস
সহর ও পল্লীরমণী কেশচর্চ্চার দৃশ্য স্নেহময়ী জাপানীসুন্দরী	পি, জি, দাস	,,
রোষবিহ্বলা	শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘোষ	,,
বিরহচিন্তা অশ্রুমুখী		,,
প্রার্থনা	শ্রীবামাপদ বন্দ্যো	,,



সৌন্দর্য্যচ্ছটা





প্রথম সংস্করণের

কৈফিয়ৎ



পার্লিসার প্রভু! অকস্মাৎ এ কি আজ্ঞা
তব,—কুলিশ-নিস্বন সম আচম্বিতে
বিনা মেঘে; সুকঠিন, নির্ম্মম কঠোর।
গোয়েন্দা-প্রবর প্রতি প্রভু-আজ্ঞা যথা
গ্রেপ্তারিতে ধড়িবাজ ছোঁড়াদের দল,
বোমাকারী;—একরাত্রে ভীষণ-গর্জ্জনে
কিংবা যথা জর্ম্মণ-কৈশর আদেশিলা
পরাজিতে, কেল্লা নামুরের সৈন্যবৃন্দে,
ঘড়ি-ঘড়ী। কিংবা যথা মেলের কৃপায়
কর্ম্মশ্রান্ত জন উপনীত কাশীধামে
এক রাত্রে। বিবাহ-প্রমোদ যথা শেষ
এক রাত্রে। তেমতি সম্বল করি—দৃঢ়
আজ্ঞা তব, দিতে হবে দিব্য কৈফিয়ৎ—
মনোরম নূতনত্বে পূর্ণ আগাগোড়া—
নূতন তর্কের পাঁতি খুলি ধীরে ধীরে,
দেখাইয়া দিতে হবে প্রামাণ্য যুকতি,
দিশে-হারা হবে যাহে পাঠক সুধীর!
কিন্তু এক রাত্রিমাত্র ব্যবধান মাঝে;
কালি প্রাতে প্রকাশিবে পুস্তক নিশ্চয়!
উপায়-বিহীন রোষে কড়িকাঠ গণি।
কালিদাস-বরদাত্রী সরস্বতী সনে
বাদ মম চিরদিন; সাধে বাদী তিনি।

রাজনীতি-কূট-মায়াজালে বন্দি দেবী
দুষ্ট সরস্বতী—কবি-কুঞ্জ-বিলাসিনী।
প্রভাবে যাহার, য়ুরোপখণ্ডেতে চলে
প্রলয়-তাণ্ডব! ব্যস্ত তিনি ফুকারিতে
ভূপতিমণ্ডলে দিব্যমন্ত্র জ্বালাময়—
ধ্বংসের ইঙ্গিত সম! বোমা-প্রহেলিকা
যথা সৃজিলা কৌতুকে—ভ্রান্তি লীলাময়ী
ছাড়ি তাঁর আশ অকূল পাথার-মাঝে
নাহি হেরি কোন আলো আলেয়ার মত
সহসা মরমে জাগে শুদ্ধ রাগিণীর
অনাহত অনুপম ঝঙ্কারের রেশ—
রঙ্গব্যঙ্গকাব্য মূর্চ্ছনার সুধাধার!
গুরুদেব ক্লারিনেটে সুঝঙ্কৃত যাহা
পূজার আসরে। আনন্দ-বিভ্রমে কাঁপি
চাহিনু চাকতে আকাশের পানে, মরি!
শারদীয়া পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাহেমহার
হীরক-বরণ-নিভা দেন ছড়াইয়া
চন্দ্রদেব সুষমার হাসিরাশিসম।
প্রসীদ ভকতে তব, গুরো! উরু মোর
মস্তিষ্কপঙ্কজে, ফুটিয়া উঠুক মম
উদ্ভট কল্পনা, ফোটে যথা গোবরের
স্তূপে পদ্ম—কিংবা যথা খড়ের পোয়ালে

ভেকচ্ছত্র ! সুন্দরীর বিম্বাধরে যথা
ফোটে ধীরে মৃদুহাস্য 'সৌন্দর্য্য'-উল্লাসে,
তেমতি এ মসীদিগ্ধ নিব্-মুখে যাহে
কবিতার রম্য খই আপনি ফুটিবে
কৈফিয়ৎ-রূপে ! যথা চোরে করে চুরি,
প্রদানিতে কৈফিয়ৎ আদিষ্ট দারোগা,
নিমতলা-রেজিষ্ট্রার দেন কৈফিয়ৎ
প্লেগমৃত্যু রিপোর্টেতে যথা । কিংবা যথা
ডেপুটীগণেশ করেন হুজুরে পেশ্
সর্ব্বদোষ-চাপাদাতা দিব্য কৈফিয়ৎ ;
কিংবা বাবুলোক যথা প্রিয়ার সকাশে
প্রদানেন হাসি, নিত্য নব কৈফিয়ৎ
উষাকালে আসি, খণ্ডি, প্রশ্ন অনর্গল ।
তেমতি প্রদানো মোরে বিচিত্র শকতি
শুষি পুস্তকের কালী কৈফয়ৎ-ব্লটিংএ
সাহেবের ভয়ে ত্রস্ত কেরাণীর মত ।
এ হেন ভাষার বল দাও শীঘ্র মোরে
জিনিবারে পাঠকের রুচির বিকার,
'এণ্টোস্মার্প'-দুর্গ সম দুর্ভেদ্য কঠিন ।
যে ভাষার বলে, অবহেলে হব পার
তথ্যের সে অকুপার, তর্ক উর্ম্মিময়,
জলনিধিকূলবাসী নুলিয়ারা যথা
উত্তাল-তরঙ্গ-মালা কাটাইয়া যায়
অনায়াসে ক্ষুদ্রতরী বাহি । অসম্ভব
রুচি-বিশ্লেষণ এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গেতে ।
বিবর্ত্তন—অগ্রগতি ধর্ম্ম মানবের
মানবজীবন সাথী, দান ধরণীর ।
কোন্ বিশ্বজয়ী বীর রোধে তার গতি ?
মিলাইতে এক রুচি নবীনে প্রবীণে ।
তার পর তর্কযুদ্ধে. আহ্বানে সাদরে
শ্লীল অশ্লীলতা নীতি 'আর্ট'-বিজয়িনী ;
কলম-সায়কে রণ, ক্ষুদ্র রণভূমে
'ব্রজবুলি' দিয়া বিদ্যা না কুলায় মোর ।
ভাষার অনন্ত ভাণ্ড হইতে তোমার
দাও কিছু লাফিং-গাস, হাসির ফোয়ারা;
দিব্যশক্তি, তারবাহী ইলেক্‌ট্রিক মত,
অমোঘ পরশে যার হাসিবে পাঠক
সপ্তদিবানিশি ! কাতুকুতু সম যাহে
হেসে হেসে বাবুলোক খাবে লুটোপুটী,
হাস্যরঙ্গে ভুলে লোকে তর্কস্রোত যথা
খোলে যবে খানসামা স্যাম্পেন-বোতল ।
তেমতি মিশিবে মেঘে সৌদামিনী সম
সুযুক্তির তীক্ষ্ণধার লহরীর মালা
বিস্ময়ে সে বিস্মৃতির অতলসলিলে ।
অশ্লীলতা পরিহার এ মর-জগতে
করিয়াছে মানসীর বরপুত্র কেবা ?
ব্যস্ত সবে ঢাকিবারে ছিদ্র আপনার,
দেখাইতে পরচ্ছিদ্র সহস্রলোচন ।
অনুপ্রেরণায় তব ছত্রে ছত্রে আসে
যুক্তিছলা, স্মৃতি উদ্ভাসিয়া—"উচ্চ পীন
পয়োধর আধ্যাত্মিক ছবি মহেশের ।
বিবসনা রমণীর, রমণীয় ছবি,

নিরাকার শুচিতার দিব্য নিদর্শন
অকলুষ শুভ্রতার' চাঁদিনী যামিনী
পুলকের মনুমেন্ট! সুরুচির চারু
চন্দ্রহার নিতম্ববিহারী! সুনীতির
মেদী-রাগ-রক্ত পদে সার্থক জীবন
রুণুঝুণু-রব-রম্য সোনার নূপুর।
তাই কবি দিব্যালোকে কহেন ফুকারি,
আপনার মানসীকে—'ফেল গো বসন,
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ।'
তার পর ঘুচিলে অঞ্চল—আবরণ
খসিলে সুধীরে, প্রত্যাদেশে কন কবি—
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর,'
কামলোক কাঁপি উঠে থাকিয়া থাকিয়া"
অশ্লীলতা-দোষ যদি এ কাব্যেতে নাহি,
সৌন্দর্য্যের কোন্ ছত্র, কোন্ ছবিখানি
তবে দুষ্ট কলুষিত—অশ্লীল-পরশে?
সাহিত্যের মনোহর, রম্য-উপবনে
সযতনে রক্ষিবারে অধিকার নিজ,
বঙ্গ-গর্ব্ব মহারথিগণ সবে হর্ষে
ধরেছেন মর্ম্মস্পর্শী, তেজস্বী লেখনী!
কারে রাখি কার গুণ বাখানিব আগে,
কার মধুচক্রপাশে, উড়িয়া উড়িয়া
গুঞ্জরিব মধুকর-রূপে; দেখাইতে
সুষমার পসরা-সম্ভার—কালজয়ী?
অশ্লীল কলঙ্করেখা পারে কি গো কভু
কলুষিতে সুকলসে সুষমা-সুধার?

কে আছে এ বঙ্গদেশে পূর্ণেন্দু-বিজয়ী?
পরাজিতে ইঁহাদের সাহিত্য-আহবে?
বীর ধনঞ্জয় যথা বিরাট-গো-গৃহে
পরাজিলা কৌরব-বাহিনী! ইথে যদি
বিশ্বনিন্দুকের তুষ্টি নাহি হয়—তবে
কি করিতে পারে বল—কৈফিয়ৎ-উকীল
দরবারে এক্‌রার করি শতবার
মনোব্যথা মাত্র শেষ পুরস্কার লয়ে।'
মেটেনি কো সাধ মম—ক্ষুদ্র প্রাণী আমি
মরুতৃষা বাড়ায় পিয়াসা,—কহে যত্নে
সংগোপনে—কানে কানে কল্পনাসুন্দরী
সৌন্দর্য্য-সমুদ্র মথি, কৌতুক-মন্থনে
অমিয়া সুষমা লয়ে ত্রিদিবে দুর্ল্লভ
আকাশ-কুসুম বাসে করিয়া সুরভি
ভ্রান্তি-সুধারস ঢালি তাহে—লোটা ভরি
রচিবার আশে মোহন-মদিরা রঙ্গে
ভ্রান্তি-শেরী-মেদিরা-বিজয়ী!—মধুমতী!
পান করি সেই সুধা আশার চমকে
'সৌন্দর্য্য'-সেবীর যূথ হবে মাতোয়ারা!
বিশ্বকর্ম্মা যথা গড়িলেন তিলে তিলে
সৌন্দর্য্য-সম্ভারে—নারীরত্ন তিলোত্তমা,
কবি-সোহাগিনী রাণী! তেমতি সৃজিতে
মানসী সুন্দরী—সৌন্দর্য্য-গরব-রাণী!
অলক্তকরাগ-রাঙ্গা কমল-চরণে
যার অধীর মঞ্জীর মৃদুমঞ্জু ভাষে,
আহা, মরি! পিয়ানোর ধ্বনি বিনিন্দিয়া

কৈফিয়ৎ

ডাকে সমর্পিতে প্রাণমন শ্রীচরণে !
কল্পনা-স্বপন কিন্তু দানিলা চম্পট
ফক্কিকার রাজ্যে—আশার ছলনে ভুলি
সফল না হলো স্বপ্ন—অদৃষ্ট বিদ্রূপে ।
সম্পাদকী-কৈফিয়ৎ-কেতা—ফুরাইলা
একে একে ফুরায় যেমতি হাইকোর্টে
ব্যারিষ্টার-আর্গুমেণ্ট দীর্ঘ বক্তৃতায় ।
যত কিছু ভ্রম আছে নেত্র-প্রবঞ্চক,
হাসিমুখে চাপাইয়া প্রিণ্টারের ঘাড়ে
লব অব্যাহতি ! নিষ্কৃতি মিলিবে না কি
নব্যপ্রথামত, যথা উইল করিয়া
যায় লোক শান্তি লভি নিশ্চিন্ত-নগরে !
এস মা শারদ লক্ষ্মী—জলধি-দুলালী
অরবিন্দ-কুমুদের মালায় সাজিয়া
বরতনু উজলিয়া শারদশশীর
তরল রজতকান্তি স্নিগ্ধ জোছনায়
সোণার কমল করে—কল্যাণী বরদে !
সুবর্ণ ধান্যের শীর্ষে—পরিপুষ্ট ফলে—
নীলাভ অপরাজিতা, রক্তিম গোলাপ,
রক্তবৃন্ত শেফালিকা কুসুমের হারে
সুষমা-সৌরভ ঢালি । আছি দাঁড়াইয়া,
মা গো, তব প্রতীক্ষায়—পূজিবার আসে
রাতুল চরণ দুটি—ভক্তের আশ্বাস,
অতুল সৌন্দর্য্য-আভা—স্থিররশ্মিসম
বিদ্যুতের । চরণ-নির্ম্মাল্যরূপে, মা গো
সৌন্দর্য্য বিতরি তব বরপুত্রগণে—
আতঙ্ক-সম্ভ্রমে কাঁপি, সভয় হরষে
নিরেলা কামনা মম, তব বরে যেন
যাদুযষ্টি-পরশেতে হয় সুধাবৃষ্টি
তব কৃপাবলে রমা, গৃহে গৃহে যেন
হাসিলে মুকুতা ঝরে—কাঁদিলে মাণিক ;
অচলা হ'য়ো মা, হেরি সৌন্দর্য্যের জয় ।
নিমন্ত্রিত গর্ব্ব যথা যায় গড়াইয়া
ভক্ত পূজকের ব্যাঙ্কে প্রণামী আকারে,
সেইরূপে পাঠকের পকেটেতে রুপি
সদয়ে চাহিও মা গো, পাব্লিসার পানে
ঝন্ ঝন্ রবে তাঁর টেবিল-উপরে
বৃষ্টি হোক তব দয়া—চক্রাকাররূপে
মূর্ত্তিমতী—ঝঙ্কারিয়া সশব্দে সগর্ব্বে ।
কি ছার ইহার কাছে পিয়ানোর ধ্বনি
অর্গ্যান-আরাব—চারু শিঞ্জিনী-নিক্কণ !
ব্যাঙ্কের মাঝারে উঠে যার সপ্ততান
ভেদি দীর্ঘ কোলাহল ! এক নিশ্বাসেতে
শেষ হলো রামায়ণ, কৈফিয়ৎ-রূপী
সপ্তকাণ্ড—মন শান্তিদাতা—ভাগ্যবশে ;
নীরবিলে মিষ্ট যথা ঢক্কার নিনাদ !
নাহি এতে হাহাকার কবিজনপ্রিয়,
বিছুটির কুটকুটি, সুজ্বালা বেতের,
খোসামোদ ম্যাঙ্গেষ্টিন, বিনয়ের স্রোতে
অশ্রুধার । চলিবে কি, মেকিতঙ্কাবৎ ?
নাহি করেন্সির কাঁচি নির্ভয় অন্তর
সম্পাদক নহি আমি, মাত্র মালাকর ।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।



"যাও যাও, ফিরে যাও মন বাঁধা যেথানে"

বসুমতী প্রেস

প্রথম উচ্ছ্বাস



লেখক—কমলাকান্তরূপে বঙ্কিমচন্দ্র।

স্ত্রীলোকের রূপ*

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটীতে দেন না। ভাবেন, যে দিক্ দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যান, লাবণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়। নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের রূপের ঝড় যে দিকে বয়, সে দিকে সকলের ধৈর্য্য-চালা উড়িয়া যায়, ধর্ম্ম-কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে। যখন পুরুষের মন-চড়ায় তাঁহাদের রূপের বাণ ডাকে, তখন তাঁহাদের কর্ম্ম-জাহাজ, ধর্ম্ম-পান্সী, বুদ্ধি-ডিঙ্গী সব ভাসিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনীকুলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে; পুরুষেরাও যখন মহিলাগণের মোহিনীশক্তির বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারম্ভ করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন গগনের জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্ব্বত, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, লতা-গুল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমার জন্য টানাটানি পাড়ান—আবার অনেককেই

অপমানিত করিয়া পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া, তাঁহারা পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আবার মসীবৎ ম্লান বলিয়া ফেরত পাঠান; গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটের সিন্দূরবিন্দু দেখিয়া তাঁহারা ঊষার সীমন্ত-শোভা তরুণতপনের নিন্দা করেন; রাগে সূর্য্যদেব পৃথিবী দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর আস্যের হাস্যরাশি অবলোকন করিয়া প্রফুল্লকমলে সৌররশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না; সে অবধি কমলকুমুদে কীট-পতঙ্গের অধিকার। কামিনীর কণ্ঠহার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা স্বর্ণ-কারের বিদ্যায় মন দিবেন। রঙ্গিণীর শরীরসঞ্চালনে তাঁহারা এত লাবণ্য-লীলা বিলোকন করেন যে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত কম্পিত সিন্ধুহিল্লোলে চন্দ্রি-কার খেলায় তাঁহাদিগের আর মন উঠে না। এই জন্যই বা রাত্রে নিদ্রা যান এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুষিতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরের মলয়-মারুতে দোদুল্যমান নীলোৎপল দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না।

এই নারী-মূর্ত্তির স্তাবককুলের উপমানুভবশক্তির কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক চক্ষু, তাঁহাদিগের কল্পনা-প্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খঞ্জন, চকোর; কখন মৎস্য, যথা সফরী। কখন উদ্ভিদ, যথা পদ্ম,

পদ্মপলাশ, ইন্দীবর ; কখন জড়পদার্থ, যথা আকাশের তারা। এক চন্দ্র কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখন তাহার পায়ের নখর। উচ্চ কৈলাস-শিখর এবং ক্ষুদ্র কমল-কোরক একেরই উপমাস্থল ; কিন্তু ইহাতেও কুলায় না বলিয়া দাড়িম্ব, কদম্ব, করিকুম্ভ এই বিষম উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি ; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণী-কুল-চরণ-বিন্যাসের অনুকারী। আবার যে সে হাতীর গমনের সহিত, এই হংসগামিনীদিগের গমনসাদৃশ্য নির্দ্দেশ করা বিধেয় নহে। যে হাতী হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্র-গামিনীগণের গতি তুলনীয়। শুনিয়াছি, হাতী এক দিনে অনেক দূর যাইতে পারে ; অশ্বাদি কোন পশু তত পারে না। যাঁহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান না কেন ? যে দিকে রেলওয়ে হয় নাই, সে দিকে বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনী মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয় ?

আমিও এক কালে কামিনীভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাইতাম না। চম্পক, কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীষ, কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনীকান্তিগ্রথিত কুসুম-মালিকার ন্যায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমময়ী মহিলাকে ভালবাসিতাম ; বর্ষার উচ্ছ্বসিত-সলিলা চির-রঙ্গিণী তরঙ্গিণী অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি

মায়াময়ী-মানবী-মণ্ডলের কুহক-জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছি।

সকলে সৌন্দর্য্য-বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রূপের টীকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট। হে মানময়ী মোহিনীগণ! কুটিল-কটাক্ষে কালকূট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না, কালসর্পী-বিনিন্দিত বেণী দ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না, ভ্রূ-ধনুতে কোপে তীক্ষ্ণ শর-যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নথ-ফাঁদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন্ ছার! তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা;. চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমণীপ্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে, তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বিকৃত প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে

না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর আশ্রয় লইতে হয় না। যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ঠ-পদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। যে বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাবমোচনার্থে যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্ব্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী। ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা; এমন কি, বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে নোলকজগন্নাথকে দোলায়; যাহার কান সুন্দর নহে, সেই ঢাকাই-কানরূপ নানা ফলফুল-পশুপক্ষি-বিশিষ্ট বাগান যোড়া কানে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনর-ফাঁসির দড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকদিগের ভীতি-বিধান করে। যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত

ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সন্তুষ্ট থাকে; স্ত্রীলোক ভূষণ বিনা মনুষ্য-সমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্য-বিষয়ে নিকৃষ্ট।

স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রকলাপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রকলাপ ময়ূরের আছে; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুঁটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টি-কর্ত্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে মূল "বিদ্যাসুন্দর"কার! তোমার মনে কি এ তত্ত্বটি উদিত হইয়াছিল? এই জন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে?

সৌন্দর্য্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু, রূপান্ধ ভামিনীগণ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। কুড়ি হইলেই তোমরা বুড়ী হইলে। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গসকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার

লাবণ্যমালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ পঁচিশের ঊর্দ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্ত্তের জন্য না হউক, অত্যল্পকালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি ;—আমার জীবনে ঘোর দুঃখ এই যে, অন্নব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যরূপ বুক্‌ড়ি-চালের ভাত প্রণয়-কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষারূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদর-লবণের ছিটা দিয়া, কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।

হে সৌন্দর্য্যগর্ব্বিত কামিনীকুল! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের রূপের এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া, তোমাদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্য-নির্ণয়ে অশক্ত? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে। যে সকল গ্রন্থকারদিগের মত ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগনেত্রে কামিনীকুলের রূপবর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, "যার যাতে মজে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর

দেখাইবে। মনোমোহিনার রূপ-নিরীক্ষণকালে তাহাকে প্রীতির অঞ্জনে মাখাইয়া দেখিব। পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য্য কেন না অধিক বোধ হইবে?

হে প্রণয়দেব! পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয়-বস্তুর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে, সে বিশ্ববিমোহন পদার্থ-পরম্পরায় পরিবৃত থাকে। বিকট মূর্ত্তিকে সে মনোহর দেখে; কর্কশ স্বরকে সে মধুময় ভাবে; প্রেতিনীর অঙ্গ-ভঙ্গীকে মৃদু-মন্দ-মারুতে দোদুল্যমানা ললিতলবঙ্গলতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান করে। এ জন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর। এ জন্যই বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিড়ালচোকের আদর। এ জন্যই কাফ্রিদেশে স্থূল ওষ্ঠাধরের আদর। এ জন্যই বাঙ্গালাদেশের উল্কি-চিত্রিত মিশি-কলঙ্কিত চাঁদবদনের আদর। এ জন্যই মানব-সমাজে স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে আনিতেন, তাহা হইলে, হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা শুনিতে পাইতাম যে, পুরুষের সৌন্দর্য্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের গুপ্তভাব বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা, তথাপি কার্য্য দ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গূঢ়তত্ত্বগুলি কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন? ইহাতে কি বুঝাইতেছে না যে, মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের পক্ষপাতিনী?

রূপ, রূপ, করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে রূপই কামিনীকুলের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্ব্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্যবস্তুর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্য-সমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।

অস্থায়ী সৌন্দর্য্যই যোষিদ্‌মণ্ডলীর একমাত্র সম্বল, সংসারসাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, এ কথা আর আমি শুনিতে চাহি না। অনেক দিন শুনিয়াছি। শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পারি না। আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটি গুণে মহত্ত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি। যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহ্য করিয়া জননী সন্তানের লালন করেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবাশুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতিপুত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন, ধর্ম্মের জন্য বাহ্যসুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়ৎদূর বুঝিয়াছেন যে, কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানসপটে সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে,—চিতা জ্বলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন। আস্তে আস্তে বহ্নি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। অগ্নিদগ্ধা স্বামিচরণ

ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতে বলিতেছেন বা সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ-পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল। ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য প্রীতি! ধন্য ভক্তি!

যখন আমি ভাবি যে, কিছু দিন হইল, আমাদিগের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়, তখন আমার বিশ্বাস হয় যে, মহত্ত্বের বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহত্ত্ব দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গপৌরাঙ্গনাগণ—তোমরা এ বঙ্গদেশের সাররত্ন! তোমাদের মিছা রূপের বড়ায়ে কাজ কি?

রূপের তুলনা

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে গেছো কথা, কদলীফলের সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না। কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাখাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন। যে বলে, সে দুর্ম্মুখ। আমি তাহা বলিব না।

আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারে নারিকেল। বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। করকচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর—নারিকেলের জলে উদর স্নিগ্ধ হয়—কিশোরীর

অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণশূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দুই জাতীয়,—ফলজাতীয় এবং মনুষ্য-জাতীয় নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম—কেমন জ্যোতির্ম্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে—যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায়—উভয়ই চতুর্দ্দিক্ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ—দেখিয়া ভুলিও না—এই চৈত্রমাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না—বড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্যা কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না—তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে। আম্রের ন্যায় ডাবকেও বরফজলে রাখিয়া শীতল করিও—বরফ না যোটে, পুকুরের পাঁকে পুতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও—মিষ্ট কথায় না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী—জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও—সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র্য চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ বৈশাখে,—তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?

তবে ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে

পর রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এই জন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর।

নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি! করকচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য? তখন ইহাকে গৃহিণীপনা বলে। গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। একদিকে কন্যা বসিয়া আছেন, মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,—কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বসিল না—ঝুনো দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল। হয় ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন—ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাতসিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি—টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না—ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি। দুই চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন—বুড়া-বয়সে দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, তত দিন অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না।

তার পরে মালা—এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখন আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্ অষ্টেন বা জর্জ্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।

ছোবড়া স্ত্রীলোকের রূপ। ছোবড়া যেমন নারিকেলের বাহিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহিক অংশ। দুই বড় অসার; পরিত্যাগ করাই

ভাল। তবে ছোবড়ায় একটি কাজ হয়—উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে,—তখন তাহাতে এ রথ-টানা নিষেধের জন্য, যেন একটা ধারা থাকে—তাহা হইলে অনেক নরহত্যা-নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্তু রমণীর রূপরজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোকই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে?

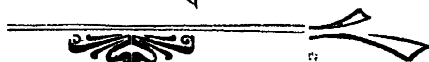
রূপের হাট।

প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিস ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয়।—দেখিলাম যে, সংসারে সেই মেছো-হাটা। পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া ঝুড়ি-চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিস, চুনো, পুঁটি, কই, মাগুর, খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে। যত বেলা বাড়িতেছে, তত বিক্রয়ের জন্য খাবি খাইতেছে—মেছোনীরা ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো! কুলপুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়্বো—বোঝা বিক্রী হলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো—ধন-সাগরের মিঠে মাছ—যে কেনে, তার পুনর্জ্জন্ম হয় না—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির মুণ্ডে

পরিণত হইয়া তার ঘর-দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে, কিনিবে। সোনার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া, হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাঁধিতে হয়—কে খরিদ্দার সাহস করিস্—আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা—নাতি ঝাঁটা—গলায় বাঁধ্‌লে শ্বাশুড়ীরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়—কাঁটার জ্বালায় খরিদ্দার হ'লে কি পলায়?" কেহ ডাকিতেছে, "ওরে আমার সরমপুঁটি, বিক্রী হলেই উঠি। ঝোলে, ঝালে, অম্বলে, তেলে, ঘিয়ে, জলে, যাতে দিবে ফেলে, রান্না যাবে চ'লে—সংসারের দিন সুখে কাটাবে, আমার এই সরম-পুঁটির বলে।" কেহ বলিতেছে,—"কাদা ছেঁচে চাঁদা এনেছি—দে'খে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।"

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম—কেন না, আমার নিরামিষ ঘর-কর্‌না। দেখিলাম, মাছের দালাল আছে; নাম পুরোহিত। দালাল খাড়া হইলে দর জিজ্ঞাসা করিলাম—শুনিলাম, দর "জীবন-সর্ব্বস্ব"; যে মাছ ইচ্ছা সেই মাছ কেন, একই দর "জীবন-সর্ব্বস্ব।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, এ মাছ কত দিন থাইব?" দালাল বলিল, "দুই দিন চারি দিন, তার পর পচিয়া গন্ধ হইবে।" তখন "এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব?"—ভাবিয়া আমি মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম। দেখিয়া মেছনীরা গামছা কাঁধে মিন্‌সেকে গালি পাড়িতে লাগিল।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস



লেখক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীনা ও নবীনা *

আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা, নূতন কীর্ত্তিস্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। "এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর," ইহাই তাঁহাদিগের উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালীরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ। কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার সমালোচনা কেবল আজি কালি হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটী ফল সুপক্ক এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময়—উদাহরণ মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের পাল। আবার দিনকতক ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রীশিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর এবং অন্যান্য প্রকারে

পাঁচী রামী মাধীকে বিলাতী মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতী মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও একদিন ওক্-বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। যে রীতিগুলির চলন আপাততঃ অসম্ভব, সে গুলি চলিত হইল না। স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহা এক-প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালী স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সামান্য; পরিবর্ত্তনশীল সমাজে অবস্থিতির জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের অনুকরণকারী পিতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইতেছে? বাঙ্গালী যুবকের বাঙ্গালী চরিত্রে যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, যুবতীগণের চরিত্রে সেরূপ লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে কি না? যদি দেখা যাইতেছে, সে গুলি ভাল না মন্দ? তাহার উৎসাহ দান বিধেয়, না তাহা দমন আবশ্যক? এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখকদিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্ত্বও আর নাই, তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা নূতন কীর্ত্তিস্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের বর্ত্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন।

বিষয়টি অতি গুরুতর। সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই। মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তে মন্ত্রী ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর

কার্য্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গরু কেনা হইতে ফরাসিস রাজ-বিপ্লব এবং লুথরের ধর্ম্মবিপ্লব পর্য্যন্ত সকলেই স্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ। ফরাসিস্ স্ত্রীগণ ফরাসিস্ রাজ্যবিপ্লবে মহারথী ছিলেন। জ্ঞানবলীন হইতে ইংলণ্ড প্রটেষ্টাণ্টে—

...Gospel light first dawned
From ballen's eyes...

ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি এবং অনেক স্থানে প্রবৃত্তি সকলের মূল আমাদের গৃহিণীগণ। অতএব স্ত্রীজাতি আমাদের শুভাশুভের মূল। স্ত্রীজাতির মহত্ত্বকীর্ত্তনকালে এই সকল কথা বলা প্রাচীন প্রথা আছে। এ জন্য আমরাও এ কথা বলিলাম; কিন্তু এ কথাগুলি যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক ভাব এই যে, পুরুষই মনুষ্যজাতি; যাহা পুরুষের পক্ষে শুভাশুভ বিধান করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয়। স্ত্রীগণ পুরুষের শুভাশুভবিধায়িনী বলিয়াই তাঁহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়, বাস্তবিক আমরা সেরূপ কথা বলি না। আমাদিগের প্রধান কথা এই যে, স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য, বা অধিক; তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধাংশ। তাঁহারা পুরুষগণের শুভাশুভবিধায়িনী হউন বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, কেন না স্ত্রীজাতি সমাজের অর্দ্ধেক ভাগ। স্ত্রী-পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি

সমাজসংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতিসহায় বলিয়াই অন্যভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্য। এ কথা নীতিবিরুদ্ধ।

কিন্তু সমাজের নিয়ন্তৃবর্গ সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, এই ভ্রমে পতিত। তাঁহারা বিধান করেন যে, স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে।

কেন করিবে? উত্তর, তাহা হইলে পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে, বা অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে। সমাজবিধাতৃদিগের সর্ব্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এই জন্যই সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি, পুরুষের সেই ধর্ম্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতিশাস্ত্রের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা স্ত্রীকৃত ব্যভিচার পুরুষকৃত পরদার-গ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ দুই-ই সমান; একপুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, এক-স্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক সেই-ই স্বাভাবিক অধিকার, কিছুমাত্র ন্যূন নহে। তথাপি পুরুষের এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহা বাবুগিরির মধ্যে গণ্য; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক অস্পৃশ্যা হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষে পুরুষের ইন্দ্রিয়সংযম আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিব্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল।

সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষপাতিতাই ইহার কারণ; পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্য্যকর্ত্তা; স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী; তাহার অতিরেক তিলার্দ্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীনকালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি; কেবল অবস্থাবিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয় ক্ষমতার অভাব; সহমরণবিধি, বহুকাল-প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ। বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়মসকল, স্ত্রীপুরুষের গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ। তৎপরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী, স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীরও কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দুহিতার তাহাও ছিল না। আজিকালি পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক, বা ইংরেজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার সর্ব্বাংশই কি উন্নতিসূচক? বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই; কিন্তু বঙ্গীয় যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা কি উন্নতি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বকালে বঙ্গীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। প্রাচীনার সহিত

নবীনার তুলনা আবশ্যক। পূর্ব্বকালে যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাঁখা শাড়ী সিন্দুরকৌটা মনে পড়িবে, বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসা-পেড়ে শাড়ীর রাঙ্গাপাড় আসিয়া পড়িয়াছে; হাতে পৈঁছা, কঙ্কণ এবং শঙ্খ, (যাহার জুটিল, তাহার বাঁউটি নামে সোণার শঙ্খ)— মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়তর সম্মার্জ্জনী বা রন্ধনের বেড়ী; কপালে কলা-বউয়ের মত সিন্দূরের রেখা; নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ; দাঁতে অমাবস্যার-মিশি এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরী-শিখর। আমরা স্বীকার করি যে, সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া দাঁড়াইত, তখন অনেক পুরুষের হৃৎকম্প হইত। যাহারা এবংবিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বাদানুবাদে সাহস করিতেন, তাঁহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দাঁড়াইতেন! ইহাঁরা কোন্দলে বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্ঠত্বকের সঙ্গে তাঁহাদের হস্তের সম্মার্জ্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের ভাষাও যে বিশেষ প্রকার অভিধানসম্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না। কেন না, তাঁহারা "পোড়ারমুখো" "ডেকরা" ইত্যাদি নিপাতসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ-প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন এবং "আবাগী" "শতেক খুয়ারী" প্রভৃতি আধুনিক "সখি" "ভগিনী" স্থানে প্রয়োগ করিতেন।

এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিতে উজ্জ্বলা করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন প্রকৃতি। সে শাঁখাশাড়ী সিন্দুর মিশি মল মাদুলী, কিছুই নাই; অনভিধানিক প্রিয় সম্বোধন-সকল সুন্দরীগণের রসনা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে। যেখানে আগে মোটা মনসা-

পেড়ে শাড়ী মেযে-মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তিপুরে ডুরে রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগ বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। হাতা বেড়ী ঝাঁটা কলসীর পরিবর্ত্তে, সূচসূতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে, পরিধেয় হাঁটু ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে; কবরী মূর্দ্ধা ছাড়িয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিণ্ডত্ব ছাড়িয়া অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে। ধূলিকর্দ্দমরঙ্গিণীগণ, সাবান-সুগন্ধাদির মহিমা বুঝিয়াছেন; কলকণ্ঠধ্বনি প্যাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জ্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে ডেক্‌রা সর্ব্বনেশে নহে; তৎস্থানে সম্বোধন পদ সব দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। স্থূল কথা এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। স্ত্রীজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয়া বিবেচনা করি। তাঁহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা করা আমাদিগের ঘোরতর বেয়াদবি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদিগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্করটনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। তাঁহাদিগের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ম্মে সুপটু ছিলেন, নবীনা ঘোরতর বাবু; জলের উপর পদ্মের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছ দর্পণে আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান, গৃহকর্ম্মের ভার প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত, ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে;—প্রথম, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে।

প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্ব্বকালের যুবতীগণের শরীর স্বাস্থ্যজনিত এবং অপূর্ব্ব লাবণ্যবিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। নবীনাদিগের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাঁহাদিগের স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্ব্বদা জ্বালাতন এবং অসুখী; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী রুগ্ন-শয্যা-শায়িনী হইলে গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে, শিশু-গণের প্রতি অযত্ন হয়; সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহ মধ্যে সর্ব্বত্র দুর্নীতির প্রচার হয়। যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবার দুঃখ সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং দম্পতীপ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে; এবং মাতার অকাল-মৃত্যুতে শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে যে, তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে। সত্য বটে, ইংরেজজাতীয় স্ত্রীগণকে আলস্যপরবশ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় না।

দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান দুর্ব্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকাল মৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগশূন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না, এখন নিত্যপীড়া; আগে লোক দীর্ঘজীবী ছিল, এক্ষণে অল্প বয়সে মরে। অনেকের বিশ্বাস আছে, এ সকল কালমহিমা; কলিতে অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন যে, নৈসর্গিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ম্যে পরিবর্ত্তিত হয় না; যদি আধুনিক

বাঙ্গালীরা বহু রোগী এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রসূতিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর বর্ত্তিয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগণের আলস্যবশ্যতার এরূপ বৃদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই।

আলস্যের তৃতীয় কুফল এই যে, নবীনাগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না, ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। প্রাচীনারা, নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন; রন্ধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এত দূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্য্য করিলেই যথেষ্ট। কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে অতি ঘৃণিতরূপে জীবননির্ব্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। পরস্পরের সুখবর্দ্ধন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী ভূমণ্ডলে আসিয়া শয্যায় গড়াইয়া দর্পণ-সম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া, কার্পেট তুলিয়া. সীতার বনবাস পড়িয়া এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখবৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক। এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহন যন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা হয়েন।

গৃহিণী গৃহকর্ম্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল

হইয়া পড়ে; অর্থে উপকার হয় না; অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য-সামগ্রী নষ্ট যায়, অর্দ্ধেক দাসদাসী এবং অপর লোক চুরি করে। বহু ব্যয়েও খাদ্যাদির অপ্রতুল ঘটে; ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। পৌরজনে অপ্রণয় ও কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি-অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়।

নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ ধর্ম্মসম্বন্ধে। আমরা এখনকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্ম্মিকা বলিতেছি না,—বঙ্গীয় যুবকদিগের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্মা বটেন, কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মে লঘু সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, সেই গুলিতে এখনকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। অদ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে তুলনারহিত। কিন্তু যাহা ছিল, তাহা কি আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়া যায় না। প্রাচীনাগণের পাতিব্রত্য যেরূপ দৃঢ় গ্রন্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, পাতিব্রত্য যেরূপ তাঁহাদিগের অস্থিমজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশ কি তাই? নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোক-নিন্দা ভয়ে, তত ধর্ম্ম-ভয়ে নহে।

তাহার পর দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোনিবেশ ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেখা যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান করে, সে স্বর্গে যায়। এখন-কার যুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে; তাহাদের পরলোকে

স্বর্গপ্রাপ্তি-কামনা তত বলবতী নহে। ইংরাজী সভ্যতার ফলে দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুর্য্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, স্ত্রীলোকদিগেরও বাড়িয়াছে;—এজন্য দানে তাদৃশ অনুরাগ আর নাই। তত দান করিলে আর কুলায় না। টাকায় যে সকল সুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে, দানের আধিক্য করিলে এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকে (এবং পুরুষে) আর তত দানশীল নহে।

হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম অতিথিসৎকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্টকরণপক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন। নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। গৃহে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ত হয়েন। লোককে আহার করান, প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ্ মনে করেন। ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখাপড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাঁহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে, প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক। অতএব তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া ধর্ম্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিলুপ্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রন্থিবদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখা-পড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফল ইহা সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে যে, তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়,

সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে লোকে, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র-ঘটিত ধর্ম্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়; প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম্ম, তাহা সত্য বলিয়া চিনিতে পারে। অতএব বিদ্যায় ধর্ম্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে যাদৃশ ধর্ম্মিষ্ঠ, মূর্খে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্তু অল্পবিদ্যার দোষ এই যে, ধর্ম্মের মিথ্যা মূল তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়, অথচ সত্য-ধর্ম্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটি যথার্থ ধর্ম্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা জানে, মূর্খদিগের মধ্যে ধর্ম্মে যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্ত্তী হয়। তাহার কারণ এই যে, এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, মূর্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতি প্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবর্ত্তী, পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্ত্তী, কিন্তু তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া তদুক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি জানেন যে ধর্ম্মে কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, তাহা অবশ্য পালনীয়; এবং পরোপকারবিধি সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে ধর্ম্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্যার আলোচনা করে যে, তদ্দ্বারা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যতদূর বিদ্যার আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে ততদূর না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্ম্মের কোন মূল থাকে না। লোক নিন্দাভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্ম্মবন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি দুর্ব্বল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক-যুবতীগণ কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন। এজন্য ধর্ম্মাংশে তাহারা প্রাচীনদিগের সমকক্ষ নহেন। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায়

বাতিবস্ত, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, আপনারা বালকদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্ম্মবন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন ?

তৃতীয় উচ্ছ্বাস




লেখক—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

নবীন সাহিত্যে রমণীর সৌন্দর্য্য

প্রাচীন সাহিত্যে রমণীরূপ-বর্ণনার বাহুল্যই ছিল; নবীন সাহিত্যে তাহার বাহুল্য বর্জ্জিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই। কীটস বলিয়াছেন (A thing of beauty is a joy for ever)—যাহা সুন্দর, তাহা চিরদিনই আনন্দদায়ী—তাহার মাধুরীই বৰ্দ্ধিতই হয়—শেষ হয় না। স্বভাবের নিয়মে পুরুষ রমণীরূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়। সেক্সপীয়র বলিয়াছেন—প্রেমিক উন্মাদেরই মত মৈশরীর ভ্রূবিলাসেও তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল প্রেমিক কেন—ভাবুক—সৌন্দর্য্য জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। কামে বা প্রেমেই এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার পরিণতি নহে; সৌন্দর্য্য বিমল—বিশুদ্ধ—দিব্য আনন্দ দান করে।

বাঙ্গালার রামমোহন রায়ের সময় হইতে সাহিত্যে নূতন যুগ—ইংরাজী-প্রভাবে পরিবর্ত্তিত যুগ ধরিলে মধুসূদনই সে সাহিত্যের সর্ব্ব-প্রথম দিক্‌পাল। তাঁহার কাব্য হইতেই নব্য বাঙ্গালা সাহিত্যে রমণীরূপ-বর্ণনার উদাহরণ দিয়া আমরা গ্রন্থের বর্ত্তমান ভাগ আরম্ভ করিলাম।

মধুসূদনের পর বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবারিধিতে রমণীরূপ-বর্ণনা-রত্নের অভাব নাই; রত্নাকরে কি রত্নের অভাব হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। জীবিত সাহিত্যিকদিগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। তাহার পর বড়াল কবি। আমাদের স্থানাভাব, তাই আমরা অন্যান্য জীবিত লেখকের রচনা হইতে রমণীরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

রমণীরূপ বর্ণনায় মধুসূদন প্রাচীন রীতিতে প্রাচীন কবিদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন। "তিলোত্তমার" রূপবর্ণনা এইরূপ—

* * * * পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙ্গা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা;

সুগোল নিতম্ব-বিম্ব ; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা।
গড়িলেক বাহুযুগ লইয়া মৃণালে।
দাড়িম্বে কদম্বে হৈল বিষম বিবাদ,
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ-বনে ; সে বিবাদ দেখি
দেব শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইলা বদন দেব অকলঙ্কভাবে ;
ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী ;
ইন্দ্রচাপে বানাইলা মনোহর সিঁথি,
জ্বলে যে তারা-রতন ঊষার ললাটে
তেজঃপুঞ্জ, তুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুর্দ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া
মাখিয়া অমৃত-রসে গজ-মুক্তাবলী,
শোভিল রে দন্তরূপে বিশ্ব-বিমোহিয়া।
আনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভূসচ্ছলে বসাইলা নয়ন উপরে ;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর ; বাছি বাছি সে তূণ হইতে

খরতর ফুল-শর, নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানারত্ন-সাজে
সাজাইলা বর বপু, পুষ্পাবলী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুম-ভূষণে।
চম্পক, পঙ্কজবর্ণ সুবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে; এ সবারে ত্যজি—
হরিতালে শিল্পিবর রাগিলা সুতনু।
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধুরব, কিন্তু বীণাপাণি,
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী।
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
জীবাইলা কামিনীরে; সুমোহিনী বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা মূর্ত্তিমতী!"

মেঘনাদ[illegible] বর্ণনা এইরূপ। লক্ষ্মণকে ছলিবার জন্য [illegible]

"দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন।
কেহ অবগাহে দেহ, স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা। দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল-সলিলে,
মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণ পদ্ম যথা।



কেহ তুলে পুষ্পরাশি, অলঙ্কারে কেহ
অলক কাম-নিগড়! কেহ ধরে করে
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকুতা-খচিত
কোলম্বক! ঝকঝকে হেম-তার তাহে,
সঙ্গীত রসের ধার। কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী, কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ববিম্বে ধ্বনিছে রসনা।
মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে
পরাণ। হেরিলে ফণী পলায় তরাসে,
যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা; খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র; সমীরণ বহিছে কৌতুকে
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে।”

প্রমীলার লঙ্কাযাত্রাকালের বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য—

“নাচিল শীর্ষক-চূড়া; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।

হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল।”

আর রমণীর রূপের স্বরূপ প্রমীলার কথায় ব্যক্ত হইয়াছে—

“অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা ; * * *”

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে রমণীর রূপ বর্ণনায় প্রাচীন পন্থারই অনুসরণ করিতেন।

“দুর্গেশনন্দিনী”তে তিলোত্তমার রূপবর্ণনা এইরূপ—

“তিলোত্তমা সুন্দরী। পাঠককে সুন্দরীর রূপানুভব করাইতে বাসনা করি, কিন্তু কিরূপে সে রূপরাশি অনুভূত করাইব? পাঠক! কখন কিশোর-বয়সে কোন স্থিরা, ধীরা, কোমলা প্রকৃতি কিশোরীর নব সঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষে দেখিয়াছেন? একবারমাত্র দেখিয়া চিরজীবনমধ্যে যাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্‌ভবয়সে, কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায় পুনঃ পুনঃ যে মনোমোহিনী মূর্ত্তি স্মরণপথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে কখন চিত্তমালিন্যজনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, তবেই তিলোত্তমার অবয়ব মনোমধ্যে স্বরূপ অনুভূত করিতে পারিবেন। যে মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যপ্রভা প্রাচুর্য্যে মন প্রদীপ্ত

করে, যে মূর্ত্তি লীলালাবণ্যাদির পারিপাট্যে হৃদয়মধ্যে বিষধর-দন্ত রোপিত করে, এ সে মূর্ত্তি নহে; যে মূর্ত্তি কোমলতা—মাধুর্য্যাদিগুণে চিত্তের সন্তুষ্টি জন্মায়, এ সেই মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তি সন্ধ্যাসমীরণ-কম্পিতা বসন্তলতার ন্যায় স্মৃতি-মধ্যে দুলিতে থাকে, এ সেই মূর্ত্তি।

তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগল্‌ভ-বয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়-তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতি প্রশস্তও নহে, নিশীথ কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাবপ্রকাশক; তৎপার্শ্বে অতি নিবিড়বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশ সকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংশে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে, মস্ত-কের পশ্চাদ্‌ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে, ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড়বর্ণ চিত্রকর লিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার, আর এক সূতা স্থূল হইলে নির্দ্দোষ হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবেন না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত, তাহাতে বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ-চকিত-কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না। চক্ষু দুটি অতি প্রশস্ত, অতি সুঠাম, অতি শান্তজ্যোতিঃ। আর চক্ষুর বর্ণ, ঊষাকালে সূর্য্যো-দয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চন্দ্রাস্তের সময়ে আকাশের যে কোমল নীলবর্ণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ; সেই প্রশস্ত পরিষ্কার চক্ষে যখন তিলোত্তমা দৃষ্টি করিতেন, তখন তাহাতে কিছুমাত্র কুটিলতা থাকিত না; তিলো-ত্তমা অপাঙ্গে অর্দ্ধ দৃষ্টি করিতে জানিতেন না, দৃষ্টিতে কেবল স্পষ্টতা আর সরলতা; দৃষ্টির সরলতাও বটে, মনের সরলতাও বটে, তবে যদি

তাঁহার পানে কেহ চাহিয়া দেখিত, তবে তৎক্ষণাৎ কোমল পল্লব দুইখানি পড়িয়া যাইত, তিলোত্তমা তখন ধরাতল ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টি করিতেন না। তিলোত্তমার সুগঠন নাসিকা কখন নথের ভারবহন যন্ত্রণা ভোগ করে নাই; ওষ্ঠাধর দুই খানি গোলাপী, রসে টলমল করিত; ছোট ছোট, একটু ঘুরান, একটু ফুলান, একটু হাসি হাসি; সে ওষ্ঠাধরের যদি একবার হাসি দেখিতে, তবে যোগী হও, মুনি হও, যুবা হও, বৃদ্ধ হও, আর ভুলিতে পারিতে না। অথচ সে হাসিতে সরলতা ও বালিকা-ভাব ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।"

আয়েষাও সুন্দরী—

"আয়েষার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। আয়েষা দেখিতে পরমা সুন্দরী, কিন্তু সে প্রণালীর সৌন্দর্য্য দুই চারি শব্দে সেরূপ প্রকটিত করা দুঃসাধ্য। তিলোত্তমাও পরম রূপবতী, কিন্তু আয়েষার সৌন্দর্য্য সে প্রণালীর নহে; স্থির—যৌবনে বিমলারও এ কাল পর্য্যন্ত রূপের ছটা লোক-মনোমোহিনী ছিল; আয়েষার রূপরাশি তদনুরূপও নহে। কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায়; নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্ম্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায়; নির্ব্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্ক পল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাববিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য্য নব-রবিকরফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়; সুবিকশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত, না সঙ্কুচিত না বিশুষ্ক; কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না। পাঠক মহাশয়, রূপের আলো



কখনও দেখিয়াছেন? দেখিয়া না থাকেন, শুনিয়া থাকিবেন। অনেক সুন্দরী রূপে দশদিক্ আলো করে। শুনা যায়, অনেকের পুত্রবধূ ঘর আলো করিয়া থাকেন। ব্রজধামে আর নিশুম্ভের যুদ্ধে কালরূপের আলো হইয়াছিল। বস্তুতঃ পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন, রূপের আলো কাহাকে বলে। বিমলা রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে প্রদীপের আলোর মত একটু একটু মিট্‌মিটে, তেল চাই, নইলে জ্বলে না; গৃহ-কার্য্যে চলে, নিয়ে ঘর কর, ভাত রান্ধ, বিছানা পাড়, সব চলিবে; কিন্তু স্পর্শ করিলে পুড়িয়া মরিতে হয়। তিলোত্তমাও রূপে আলো করিতেন—সে বালেন্দু-জ্যোতির ন্যায়; সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য্য হয় না; তত প্রখর নয় .আর কিছু দূরনিঃসৃত। আয়েষাও রূপে আলো করিতেন, কিন্তু সে পূর্ব্বাহ্ণিক সূর্য্যরশ্মির ন্যায়; প্রদীপ্ত, প্রভাময়, অথচ যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।"

আস্‌মানীর রূপ তাহার গুণেরই অনুরূপ। তাই তাহার রূপবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসের অবতারণার অবকাশ পাইয়াছিলেন—

"আস্‌মানীর বেণীর শোভা ফণিনীর ন্যায়, ফণিনী সে তাপে মনে ভাবিল, যদি বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম, তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইয়া বেড়াইবার প্রয়োজনটা কি? আমি গর্ত্তে যাই। এই ভাবিয়া সাপ গর্ত্তের ভিতর গেলেন, ব্রহ্মা দেখিলেন—প্রমাদ; সাপ গর্ত্তে গেলেন, মানুষ দংশন করে কে? এই ভাবিয়া তিনি সাপকে লেজ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিলেন; সাপ বাহিরে আসিয়া আবার মুখ দেখাইতে হইল, এই ক্ষোভে মাথা কুটিতে লাগিল, মাথা কুটিতে কুটিতে মাথা চেপ্টা হইয়া গেল, সেই অবধি

সাপের ফণা হইয়াছে। আসমানীর মুখচন্দ্র অতি সুন্দর, সুতরাং চন্দ্রদেব উদয় হইতে না পারিয়া ব্রহ্মার নিকট নালিশ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, ভয় নাই, তুমি গিয়া উদয় হও, আজি হইতে স্ত্রীলোকদিগের মুখ আবৃত হইবে। সেই অবধি ঘোমটার সৃষ্টি। নয়ন দুটি যেন খঞ্জন, পাছে পাখী ডানা বাহির করিয়া উড়িয়া পলায়, এইজন্যই বিধাতা পল্লব-রূপ পিঁজরার কবাট করিয়া দিয়াছেন। নাসিকা গরুড়ের নাসার ন্যায় মহা বিশাল; দেখিয়া গরুড় আশঙ্কায় বৃক্ষারোহণ করিল, সেই অবধি পক্ষিকুল বৃক্ষের উপরেই থাকে। বক্ষঃস্থল দেখিয়া দাড়িম্ব বঙ্গদেশ ছাড়িয়া পাটনা অঞ্চলে পলাইয়া রহিলেন; আর হস্তী কুম্ভ লইয়া ব্রহ্মদেশে পলাইলেন; বাকি ছিলেন ধবলগিরি। তিনি দেখিলেন যে, আমার চূড়া কতই বা উচ্চ, আড়াই ক্রোশ বইত নয়, এ চূড়া অন্যূন তিন ক্রোশ হইবে; এই ভাবিতে ভাবিতে ধবলগিরির মাথা গরম হইয়া উঠিল, বরফ ঢালিতে লাগিলেন, তিনি সেই অবধি মাথায় বরফ দিয়া বসিয়া আছেন।"

দুর্গেশনন্দিনীর পর 'কপালকুণ্ডলা'। 'কপালকুণ্ডলা' গদ্য কাব্য। তাহার রূপ ও ভাব কবিতারই উপযোগী। প্রথমে সাগরতীরে কপালকুণ্ডলা—

"ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদিবারিধিতীরে, সৈকতভূমে, অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে ছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতে ছিল। বিশাল

লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণ লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটী মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্র-নিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে, তাহার মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না।"

তাহার পর বিলাসলালসাবিহ্বলা মতি বিবি। তাহার রূপে বাসনার বহ্নিশিখাও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"শরীর ঈষৎ দীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্ত-পদ-হৃদয়াদি সর্ব্বাঙ্গ সুগোল, সুবিস্তৃত। বর্ষাকালে বিটপিলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইঁহার শরীর তেমনি আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল; সুতরাং ঈষৎ দীর্ঘ দেহেও পূর্ণতাহেতু অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্র-কৌমুদীর ন্যায়, কাহারও কাহারও ঈষদারক্তবদন উষার ন্যায়। ইহাঁর বর্ণ এতদুভয়বর্জ্জিত; সুতরাং ইঁহাকে প্রকৃত গৌরাঙ্গী বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকরী শক্তিতে ইঁহার বর্ণও ন্যূন নহে। ইনি শ্যামবর্ণা! "শ্যামা" বা "শ্যামসুন্দর" যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে। তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকর-

লেখা অথবা হেমাম্বুদ কিরীটিনী ঊষা যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণ প্রতিমা হয়, তবে বসন্ত প্রসূত নবচ্যুতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গীর বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্তু যদি কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন, তবে তাঁহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্য বলিতে পারিব না। এ কথায় যাঁহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচ্যুতপল্লববিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর তুল্য, সেই উজ্জ্বল শ্যামললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন; সেই সপ্তমী চন্দ্রাকৃত ললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগল মনে করুন; সেই পক্কচূতোজ্জ্বল কপোলদেশ মনে করুন; তন্মধ্যবর্ত্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন; তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরী-প্রধানা বলিয়া অনুভব হইবে। চক্ষু দুইটী অতি বিশাল নহে; কিন্তু সুবঙ্কিমপল্লবরেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল; তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী; তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহময় রসে গলিয়া যায়। আবার কখনও বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তিপ্রকাশমাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা, কখনও বা লালসাবিস্ফারিত মদন রসে টলটলায়মান। আবার কখনও লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘ মধ্যে বিদ্যুৎদাম। মুখকান্তি মধ্যে দুইটি অনির্ব্বচনীয় শোভা; প্রথম, সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, তিনি রমণীকুলরাজ্ঞী।” °

বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী'—গিরিজায়া সে উপন্যাসের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গিরিজায়া শ্যামা—কিন্তু সুন্দরী, তাহার রূপবর্ণনা এইরূপ—

"গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। ষোড়শী, খর্ব্বাকৃতা এবং কৃষ্ণাঙ্গী। সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণ, তাই বলিয়া তাহার গায়ে ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালী মাখিলে জল মাখিয়াছে বোধ হইত, কিংবা জল মাখিলে কালী বোধ হইত, এমন নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাথুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ যেমন হউক না কেন, ভিখারিণী কুরূপা নহে। তাহার অঙ্গ পরিষ্কার, সুমার্জ্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট; মুখখানি প্রফুল্ল, চক্ষু দুটি বড় চঞ্চল, হাস্যময়; লোচন-তারা নিবিড় কৃষ্ণ, একটি তারার পার্শ্বে একটি তিল। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, রক্তপ্রভ, তদন্তরে অতি পরিষ্কার অমলশ্বেত কুন্দকলিকাসন্নিভ দুই শ্রেণী দন্ত। কেশগুলি সূক্ষ্ম; গ্রীবার উপরে মোহিনী কবরী, তাহাতে যূথিকার মালাবেষ্টিত। যৌবনসঞ্চারে শরীরের গঠন সুন্দর হইয়াছিল। যেন কৃষ্ণপ্রস্তরে কোন শিল্পকার পুতুল খোদিত করিয়াছিল! পরিচ্ছদ অতি সামান্য, কিন্তু পরিষ্কার—ধূলিকর্দ্দম পরিপূর্ণ নহে। অঙ্গ একেবারে নিরাভরণ নহে, অথচ অলঙ্কারগুলি ভিখারীর যোগ্য বটে। প্রকোষ্ঠে পিত্তলের বলয়; গলায় কাষ্ঠের মালা, নাসিকায় ক্ষুদ্র একটি তিলক, ভ্রূমধ্যে ক্ষুদ্র একটি চন্দনের টিপ।"

কিন্তু জীবন্ত কবিতা মনোরমার চিত্রের মত মনোরম চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র বুঝি আর অঙ্কিত করেন নাই—



সুন্দরী

"মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাহার রূপরাশি অতুল—চক্ষুতে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, সর্ব্বকালে সে রূপরাশি দুর্ল্লভ। একে বর্ণ সোনার চাঁপা, তাহাতে ভুজঙ্গশিশুশ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; এক্ষণে বাপীজলসিঞ্চনে সেই কেশ ঋজু হইয়াছে; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত নির্ম্মল ললাট; ভ্রমরভরস্পন্দিত নীলপুষ্পতুল্য কৃষ্ণতারচঞ্চল লোচনযুগল; মুহুর্মুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণপ্রবৃত্ত গন্ধযুক্ত সুগঠন নাসা; অধরোষ্ঠ যেন প্রাতঃ-শিশিরে সিক্ত, প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন রক্তকুসুমাবলীর স্তবক যুগল তুল্য; কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাম্বুবিস্তার-বৎ প্রসন্ন; শাবকহিংসা শঙ্কায় উত্তেজিত, হংসীর ন্যায় গ্রীবা, বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে আবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশসকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিরদ-রদ যদি কুসুমকোমল হইত কিংবা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিংবা চন্দ্রকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত,—সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। ঐ সকলই সুন্দরীর আছে। মনোরমার রূপরাশি অতুল, কেবল তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌকুমার্য্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার; অধর, ভ্রূযুগ, ললাট সুকুমার; সুকুমার কপোল; সুকুমার কেশ; অলকাবলী যে ভুজঙ্গ-শিশুরূপী, সেও সুকুমার ভুজঙ্গ-শিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে সৌকুমার্য্য; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে সৌকুমার্য্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য্য; সুকুমার চরণ, চরণ-বিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার, বসন্ত-বায়ু-সঞ্চালিত কুসুমিতলতার

মন্দান্দোলনের তুল্য; বচন সুকুমার, নিশীথ সময়ে জলরাশি পার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য; কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্র জন্য মেঘমালাযুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য; আর ঐ যে মনোরমা দেবী গৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,—পশুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমুখী, নয়নতারা ঊর্দ্ধস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র, আবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ এক হস্তে ধরিয়া, এক চরণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্ত্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছেন, ও ভঙ্গীও সুকুমার, নবীন সূর্য্যোদয়ে সদ্যপ্রফুল্লদলমালাময়ী নলিনীবৎ প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার।

'বিষবৃক্ষে' উল্লেখযোগ্য রমণীরূপবর্ণনা নাই বলিলেই হয়; 'চন্দ্রশেখরে' আছে। কিন্তু এই সময় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা স্বীয় স্বতন্ত্র পথের পথিক হইয়াছে। রূপবর্ণনা আর কেবল রূপবর্ণনাই নহে।—

যুবতীর জলখেলার ছলে রমণীর রূপবর্ণিত—

"যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না; আমরা জল নই; যিনি কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারিবেন। তিনিই বলিতে পারিবেন, কেমন করিয়া জল কলসীতাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার-সিঞ্চিতের তালে তালে নাচে। হৃদয়োপরি গ্রথিত জলপুষ্পের মালা দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। সন্তরণ-কুতূহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গটিকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, হৃদয়ে উঁকিঝুঁকি মারিয়া,

জলতরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে। আবার যুবতী কেমন কলসী ভাসাইয়া দিয়া মৃদু-বায়ুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া, বিম্বাধরে জলস্পৃষ্ট করে; বক্তৃ মধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে, সূর্য্যাভিমুখে প্রতিপ্রেরণ করে, জল পতনকালে বিম্বে বিম্বে শতসূর্য্য ধারণ করিয়া যুবতীকে উপহার দেয়। যুবতীর হস্তপদ-সঞ্চালনে জল-ফোয়ারা ফাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলের হিল্লোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। তুই-ই সমান, জল চঞ্চল; এই ভুবন-চাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি ?”

চন্দ্রশেখর গৃহী হইয়াও প্রায় সন্ন্যাসী। কিন্তু সুষুপ্তা সুন্দরী পত্নীকে দেখিয়া তাঁহার স্থির হৃদয়-সাগরেও তরঙ্গ উঠিল—

“তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতি-বিস্ফারিতনেত্রে শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগলতলে মুদিত পদ্ম-কোরকসদৃশ লোচন-পদ্ম দুটি মুদিয়া রহিয়াছে,—সেই প্রশস্ত নয়ন-পল্লবে সুকোমল সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন, ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে—যেন কুসুম-রাশির উপর কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে, রসপূর্ণ তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্ভিন্ন করিয়া, মুক্তাসদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিন্মাত্র দেখা দিতেছে। একবার যেন, কি সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল—যেন একবার জ্যোৎ-

স্থার উপর বিদ্যুৎ হইল ! আবার সেই মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ সুষুপ্তি সুস্থির হইল। সেই বিলাস-চাঞ্চল্যশূন্য সুষুপ্তি সুস্থির বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল।"

এই 'চন্দ্রশেখরেই' আর একটি বিবৃত হইয়াছে—

"সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী স্ত্রী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অস্ত্র।"

'রজনীতে' যে রূপবর্ণনা আছে, তাহা দার্শনিকের অনুভূতির বিবৃতি—

"তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গকলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল। চক্ষের চাহনী চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল--উচ্চহাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল দ্রুত-গতি মন্থর হইয়া আসিয়াছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই—সৌন্দর্য্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না। বস্তুতঃ অতীত শৈশব অথচ অপ্রাপ্ত-যৌবনার সৌন্দর্য্য এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য, ইহাই মনে হয়,—যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসন-ভূষণের ঘটা, হাসি-চাহনীর ঘটা,—বেণীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনী, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ এক প্রকার দোকানদারি আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃত। যে সৌন্দর্য্য উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।"

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস। তাহাতে কোথাও বাহুল্য নাই—তাই রূপ বর্ণনাও নাই বলিলেই হয়। আছে কেবল জাহ্নবীর জলে ডুবিবার পর সংজ্ঞাহীনা রোহিণীর বর্ণনা—

"বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত সে মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্জ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল দীর্ঘবিলম্বিত ঘোর কৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু- তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জল সৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদিত; কিন্তু সেই মুদিত পদ্মের উপরে ভ্রূযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জা-ভয়-হীন কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট, গণ্ড এখনও উজ্জল; অধর এখনও মধুময় বান্ধুলী পুষ্পের লজ্জাস্থল।"

'আনন্দমঠে' নায়িকা স্বামীসোহাগবঞ্চিতা দুঃখিনী—প্রোষিতভর্ত্তৃকা তাহার পক্ষে "শরীর-সংস্কার" নিষিদ্ধ। তাহার—

"নবীন যৌবন; ফুল্লকমল তুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য্য; তেল নাই, কেশ নাই, আহার নাই,—তবু সেই প্রদীপ্ত অননুমেয় সৌন্দর্য্য এই শতগ্রন্থিযুক্ত বসন মধ্যেও প্রস্ফুটিত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য্য। আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়; বেশভূষা নাই—তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে

অনির্ব্বচনীয় কি ছিল ; অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নত ভাব, অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি।”

আর সন্ন্যাসী ব্রতধারী “সন্তান” রমণীরূপলাবণ্যে মুগ্ধ—

“ভবানন্দ তখন উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণ-কুঞ্চিত সুগন্ধি অলকরাশি আকর্ণ-প্রসারী ভ্রূযুগের উপর পড়িয়া আছে। মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণে ললাটদেশ মৃত্যুর করালকবলচ্ছায়ায় গাহমান হইয়াছে। যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব করিতেছে। নয়ন মুদ্রিত, ভ্রূযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তারপর যেমন করিয়া শরৎ মেঘ-বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার সৌন্দর্য্য বিকশিত করে, যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য্য তরঙ্গাকৃতি মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, স্থল, জল, কীট, পতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতেছিল। আহা, কি শোভা!”

তাই বঙ্কিমচন্দ্র বড় দুঃখে বলিয়াছেন—

“হায়! রমণীর রূপলাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্ ;”

‘দেবীচৌধুরাণীতে’ বঙ্কিমচন্দ্র যখন দেবীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন, তখন দেবীর দেহে যৌবনের সাফল্য সংযমশিক্ষার প্রভাবে শান্ত—স্থির হইয়াছে।

“গালিচার উপর বসিয়া একজন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান

করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নীচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাঁওয়া যায় না। বয়স যাই হউক, সে স্ত্রীলোক পরমা সুন্দরী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথবা স্থূলাঙ্গী বলিলেও ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ তাহার অবয়বের সর্ব্বত্র ষোলকলা সম্পূর্ণ—আজ ত্রিস্রোতা যেরূপ কূলে কূলে পূরিয়াছে—ইহারও শরীর তেমনিই কূলে কূলে পূরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ—তেমন উন্নত বলিয়াই স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবনবর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে—পূরিয়া টল্‌মল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে, জল অস্থির কিন্তু নদী অস্থির নহে; নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে– নির্ব্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুসঙ্গিনী। সেই নদীর মত, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্য্যাদা নাই—কিন্তু এক শত বৎসর আগে কাপড়ও ভাল হইত, উপযুক্ত মর্য্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরা-মুক্তা-খচিত কাঁচলি ঝক্‌মক্ করিতেছে। হীরা, পান্না, মতি, সোণায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত; জ্যোৎস্না-আলোকে বড় ঝক্‌মক্ করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জ্যোৎস্নাপুলকিত স্থির নদী-জলের মত—সেই শুভ্র বসন, আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জ্যোৎস্নার চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মতির



টিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্ত্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে, কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশ পৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, চক্ষে পড়িয়াছে ; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে ; তাহার সুগন্ধিচূর্ণ-গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে : এক ছড়া যুঁইফুলের গড়ে সেই কেশরাজি বেষ্টন করিতেছে।"

'সীতারামে'ও রূপ বর্ণনা আছে। প্রথমে তুলনার সমালোচনা—

"তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি স্ত্রীর খেদ মিটে নাই—তাই তাঁর পিতা আবার হিমরাশি-প্রতিফলিত কৌমুদীরূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আজ একজন বসন্ত-নিকুঞ্জ-প্রহ্লাদিনী অপূর্ণা কল্লোলিনী, আর একজন বর্ষাবারিরাশি প্রমথিতা পরিপূর্ণা স্রোতস্বতী। দুই স্রোতে শ্রী ভাসিয়া গেল। তারপর আর শ্রীর কোন খবরই নাই।"

তাহার পর শ্রীর বর্ণনা, দেবীর পূর্ণপরিণতি যেমন হয়, তাহারই বর্ণনা—

"শ্রী ত চিরকালই মনোমোহিনী। যে শ্রী বৃক্ষবিটপে দাঁড়াইয়া আঁচল হেলাইয়া রণজয় করিয়াছিল, রূপে এ শ্রী তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে রূপসী। শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি শতগুণে বাড়িয়াছিল। সদ্যঃপ্রস্ফুটিত প্রাতঃপুষ্পের যেমন পূর্ণস্বাস্থ্য—কোথাও অপুষ্ট নয়, কোথাও অঙ্গহীন নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, কোথাও বিশুষ্ক নয়,—সর্ব্বত্র মসৃণ, সম্পূর্ণ শীতল, সুবর্ণ,—শ্রীর তেমনই স্বাস্থ্য, শরীর সম্পূর্ণ,

সেই জন্য শ্রীর প্রকৃতির মূর্ত্তিমতী শোভা। তার চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয় ক্ষোভশূন্য, চিন্তাশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তিময়, প্রীতিময়, দয়াময়,—কাজেই সেই সৌন্দর্য্যের বিকার নাই, কোথাও একটা দুঃখের রেখা নাই, একটু মাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই; সর্ব্বত্র সুমধুর, সহাস্য, সুখময়,—এ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির কাছে সে সিংহ-বাহিনী মূর্ত্তি কোথায় দাঁড়ায়?"

হেমচন্দ্র।

হেমচন্দ্র কবিতায় পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের প্রথা ত্যাগ করিয়া, ভাবে রূপ প্রকাশ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।—তাঁহার ঐন্দ্রিলা

সাজিলা ঐন্দ্রিলা; মধুর মাধুরী
বসন-ভূষণে পড়ে যেন ঝুরি;
পড়ে যেন ঝুরি চারু-পয়োধরে!
লাবণ্য-তরঙ্গ থরে থরে থরে
নাচিল পায়!
বসন্ত-সময়ে কিবা সাজে রতি
ভুলাতে কন্দর্পে—রূপ কুলপতি?
শিবের সমাধি ভাঙ্গিতে পার্ব্বতী
সাজিল বা কি বা? মোহিনী যুবতী
সুধা—তুমুলে?

তবে তিনি বাঙ্গালীর মেয়ের যে রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর নিকট চিরদিনই সমাদৃত হইবে।

কামিনী-কুসুম।

(১)

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ কুসুমে ?
কোথায় এমন আর
কোমল—কুসুমহার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে।
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয় মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে ?
বঙ্গনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমের ?

(২)

কি ফুলে তুলনা দিব, বল চ্যুত-মুকুলে ?
কোথায় এমন স্থল,
খুঁজিলে এ ধরাতল,
সেখানে এমন মৃদু মধু ঝরে রসালে ?
যেখানে এমন বাস,
নবরসে পরকাশ,
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথুলে !
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে !

(৩)

মধুর সৌরভময়, ভাব দেখি চামেলি
ঢালে কি অতুল বাস
ফুল্লমুখে মৃদুহাস,
তরুকোলে তনু রেখে, অলিকুলে আকুলি।
কি জাতি বিদেশী ফুল
আছে তার সমতুল,
রাখিতে হৃদয়-মাঝে পরে চিত্তপুত্তলি ?
বঙ্গ-কুলনারী এর তুলনাই কেবলি !

(৪)

কি আছে জগতে বেল মতিয়ার তুলনা ?
সরল মধুর প্রাণ,
সুধাতে মিশায়ে ঘ্রাণ
ভুলায় মুনির মন নাহি জানে ছলনা,
না জানে বেশ-বিন্যাস,—
প্রস্ফুটিত মুখে হাস,
অধরে অমিয়া ধরি হৃদে পূরি বাসনা—
বঙ্গের বিধবা সম কোথা পাব ললনা ?



(৫)

কে দেয় বিলাতি, 'লিলি' নলিনীতে উপমা ?
দেশে যে কুমুদ আছে
আসুক তাহারি কাছে,
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা ।
বিধুর কিরণ-কোলে
কুমুদ যখন দোলে,
কি মাধুরী মরি তায় কে বুঝে সে মহিমা ?
কোথায় বিলাতী 'লিলি' নলিনীর উপমা ?

(৬)

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাঁপাতে ?
প্রগাঢ় সুবাস যার
প্রেমের পুলকাগার,
বঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে ।
কোথায় ঈরাণী 'গুল,'
এ ফুলের সমতুল !
কোথা ফিকে 'বায়োলেট' গন্ধ নাহি তাহাতে
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাঁপাতে ?

(৭)

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ-আগারে
মালতী, কেতকী, জাতি,
বান্ধুলি, কামিনী, পাঁতি,
টগর, মল্লিকা, নাগ, নিশিগন্ধা শোভারে,
কে করে গণনা তার—
অশোক, আতস আর,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশি তুষারে—
সুধার লহরী-মাখা বঙ্গগৃহ-মাঝারে।

(৮)

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী!
লতায়ে লতায়ে যায়,
ভ্রমরে তুষি সুধায়,
লাজে অবনতমুখী, তনুখানি আমরি।
তাই এত ভালবাসি,
মেঘের চপলা হাসি—
কে খোঁজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী?
মরি কি অপরাজিতা নীলিমার লহরী?

(৯)

এ মাধুরী সুধারস কোথা পাব কুসুমে,
কোথায় এমন আর,
কোমল কুসুম-হার,
ধরিতে, দেখিতে ছুঁতে, আছে এ নিখিল ভূমে।
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা সরমে—
বঙ্গনারী পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক। তিনি সুকবি ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন, তিনি বঙ্গসাহিত্য সেবায় রত থাকিলে, ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষা বাঙ্গালা রচনার একমাত্র আদর্শ হইয়া থাকিত না। তিনি যৌবনকালে 'বাসবদত্তা' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পুস্তক লিখেন যে, যদি তাঁহার রচনা ভারতচন্দ্রের রচনা হইতে উৎকৃষ্ট না হয়, তবে তিনি আর কবিতা লিখিবেন না। আপনার কবিতা পাঠান্তে তাহা ভারতচন্দ্রের রচনাকে পরাভূত করিতে পারে নাই

বুঝিয়া, তিনি বাঙ্গালায় আর কোন কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহার রমণী-রূপ-বর্ণনা পূর্ব্ববর্ত্তীদিগেরই মত—

কামিনীর রূপ বর্ণন।

কুটিল কুন্তলে কিবা বান্ধিয়াছে বেণী।
কুণ্ডলী করিয়া যেন কাল-কুণ্ডলিনী॥
রমণী-স্বরূপ মণি সদা রক্ষা করে।
তার চোরে অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে বিষে জারে॥
ভালে ভাল বিলসিত অলকা-বিলাসে।
মুখপদ্মমধু আসে অলি আসে পাশে॥
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ-সুষমা।
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা॥
ফুলধনু ছাড়ি ধনু দেখিয়া ভ্রূধনু।
অভিমানে হর-হুতাশনে ত্যজে তনু॥
নাসা-বংশী নয়ন-যুগল-মাঝে শোভে।
যেন বৈসে শুকপক্ষী ওষ্ঠবিম্ব-লোভে॥
কিম্বা নেত্র সুধাসিন্ধু বিভাগের হেতু।
তার মধ্যে বুঝি বিধি বান্ধিয়াছে সেতু॥
সুদীর্ঘ নয়ন তাতে রঞ্জিত অঞ্জন।
সে চাঞ্চল্য শিখিবারে চঞ্চল খঞ্জন॥
একে ত অসহ্য শর কটাক্ষ বিষম।
তাহাতে অঞ্জন কটু কালকূটসম॥

কি কহিব অধর অধর করে বিম্ব।
অনুমানি ত্রিভুবনে নাহি প্রতিবিম্ব॥
সে বদন-বিধু অতি পরম বিভব।
অধররাগেতে যেন সন্ধ্যা অনুভব॥
কুন্দ-সুকুসুম সম দশনের শোভা।
ঈর্ষায় দাড়িম্ববীজ বুঝি শোণ-আভা॥
হাস্যমুখী সে যখন মৃদু মৃদু হাসে।
পদ্মরাগোপরি কত মুক্তা পরকাশে॥
শোভে ভুজ-মৃণাল লাবণ্যসরোবরে।
পাণিপদ্ম প্রকাশে নখর রবিকরে॥
ক্ষীণাঙ্গিনী সে রমণী হইয়া তৎপর।
উচ্চ কুচ-ধরাধর ধরে বক্ষোপর॥
কি জানি কখন যদি পড়ে নিজ ভারে।
চুচুকের ছলে বিধি বিন্ধে লৌহসারে॥
নিরখি সে কুচ-শম্ভু বুঝি কাম ডরে।
পশিল অনঙ্গ হয়ে কটির মাঝারে॥
ত্রিবলির ঊর্দ্ধে তার শোভে রোমাবলী।
নাভিপদ্মগন্ধে যেন ধায় ভৃঙ্গাবলী॥
কি বলি ত্রিবলি কিছু বলিতে না পারি
রতিপতি উঠিতে সোপান সারি সারি॥
সুবলনি মধ্যখানি কি বাখানি তার।
আছে কিনা আছে অনুমান করা ভার

ভূধর হইতে গুরু সে নিতম্ব ভারী।
বুঝি বুঝিবারে হরি হন গিরিধারী॥
জঘনেতে শোভে মণি-কাঞ্চী-গুণশ্রেণী
যুব-জন-মনোহারী বান্ধিতে বন্ধনী॥
সতর্কেতে নানা তর্ক করি হয় স্থির।
জঘন মদনপুরে কনকপ্রাচীর॥
কেবা করে করিকরে সে উরু তুলনা।
কদলী তুলনা তার মনেও তুল না॥
সুধু ধরা ভারে ধৈর্য্য নহে বিষধর।
তাহে তার ধরাধর সম পয়োধর॥
আর ততোধিক গুরু নিতম্বের ভর।
এ সকল ভারে ফণিপতি সকাতর॥
তাহা দেখি বিধি তার কৈল মন্দগতি।
যথা মন্দ মন্দ চলে মরালের পাঁতি॥
তথাপিও ফণিপতি থাকিয়া থাকিয়া।
মেদিনী সহিত উঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া॥
করিবর হেরি উরু গুরু পয়োধর।
মন্দমতি মন্দগতি নিরখি তৎপর॥
কি হইবে মুণ্ড শুণ্ড মন্দগতি তার।
ইহা ভাবি দেয় দেহে ধূলি অনিবার॥
নিজ নিপুণতা ধাতা জ্ঞাপন করিতে।
অপরূপ রূপ তাঁর সৃজিল জগতে॥

তার নিদর্শন দেখ এই বিপরীত।
নখচন্দ্রে করে পাদপদ্ম বিকসিত॥
বুঝি মণি-নূপুরের করি কলধ্বনি।
পঞ্চস্বরে পঞ্চশরে জাগায় সে ধ্বনি॥
সপ্তস্বরা-স্বরসম শুনি তার স্বর।
দেখি পিক উহু উহু করে নিরন্তর॥
হেরি হরে হেন মন পুনঃ পাওয়া ভার।
মদনের মোহ হয় ভাবি রূপ তার॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কয়খানি সুখপাঠ্য কাব্যগ্রন্থের লেখক। মধুসূদনের চরিতকার তাঁহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিকুল ও মধুসূদনের মধ্যবর্ত্তী যোগসেতু বলিয়াছেন। তাঁহার রমণী-রূপ-বর্ণনাও সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃতানুরূপ। তাঁহার রচনা হইতে আমরা রমণী-রূপ-বর্ণনার তিনটি দৃষ্টান্ত দিলাম;—

পদ্মিনীর পদ্ম-নেত্র, বিনোদ বিহার-ক্ষেত্র,
ব্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে।
পলকেতে প্রতিপলে, বঙ্কিম কটাক্ষ ছলে,
চারি দিকে অমৃত সঞ্চারে॥

সতীর শুভদা দৃষ্টি, করে নানা সুখ সৃষ্টি,
অনলের বৃষ্টি পাপী-জনে।
সতীরে হরিতে আশ, যে করে তাহার নাশ,
ভাব কি দুর্দ্দশা দশাননে॥
পদ্মিনী রূপের নিধি, বিরলে গড়িল বিধি,
নীর-নিধি-নন্দিনী সমান।
কি ছার পদ্মিনীচয়, সহ বিস-কিসলয়,
পুষ্করে প্রকাশে অভিমান?
অতুলনা রাজকন্যা, ভুবনে ভাবিনী ধন্যা,
অগ্রগণ্যা রূপসী-সমাজে।
কিরূপ তাহার রূপ, কি বর্ণিব অপরূপ,
বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে॥
কোন্ মূঢ় চিত্রকরে, পদ্ম-দেহ চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা?
কিংবা সেই কোকনদে, মাখাইলে মৃগমদে,
অতি সুখ লভে মধুলোভা?
কষিত কাঞ্চন কায়, কিবা কার্য্য সোহাগায়,
কিবা কার্য্য রসানের ছটা?
হেন মূর্খ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধনু দেহে,
অভিনব রূপরঙ্গঘটা?
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর-ভাতি,
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।

কি কাজ সিন্দুরে মাজি, গলমুক্তাফলরাজি,
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল ?
সেইরূপ ভূপজার, রূপ গুণ চমৎকার,
বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন।
মৃগপতি যুথপতি, দ্বিজপতি গজমতি,
তিলফুল কোকিল খঞ্জন ॥
এই সব উপমার, প্রয়োজন নাহি আর,
নব কবি-জনের বাঞ্ছিত।
কহিলাম যতগুলা, পদ্মিনী-রূপের তুলা,
কেহ নহে সকলি লাঞ্ছিত ॥
এই শ্রুতি পূর্ব্বাপর, যুবতীর মনোহর,
রূপ দৃষ্টে মুগ্ধ মুনি নরে।
কহ কোন্ নৃপমুনি, রূপের ব্যাখ্যান শুনি
মজিয়াছে পঞ্চশর-শরে ?

পদ্মাবতী।

কিবা অপরূপ, পদ্মাবতী-রূপ,
অলপবয়সী বালা।
কেতকী কুসুম, কেশর কুঙ্কুম,
লাবণ্য ফুলের ডালা ॥
নয়ন সুন্দর, নীল নিভাধর,
কাজলে উজল ভাতি।

যেন ইন্দীবরে, অলি শোভা করে,
রবহীন মদে মাতি ॥
পলকে পলকে, দামিনী দলকে,
চমকে যুবক-প্রাণ।
আকর্ণ-সন্ধান, কামের কামান,
যুগল ভূরুর টান ॥
অধরোষ্ঠ কিবা, প্রবালের ডিবা,
দশন মুকুতাধার।
মৃদু মৃদু হাসে. দর পরকাশে,
কি শোভা করে সঞ্চার ॥
নাসিকার কোলে, গজমতি দোলে,
তিলফুলে হিমকণা।
প্রলম্বিত বেণী, নাগিনীর শ্রেণী,
উভে কি বিস্তার ফণা ॥
প্রতিভার খনি, চন্দ্রসূর্য্য মণি,
সীমন্ত শ্রীমন্ত করে।
রত্ন কর্ণফুল, শোভে কর্ণমূল,
দোলে কি আনন্দভরে ॥
পাটলী কি রসে, কপোলে বিকসে,
কপাল কি আধ ইন্দু।
মৃগাঙ্কের প্রায়, শোভিছে কি তায়,
মৃগমদ-লেখা বিন্দু ॥



রাঙা কোকনদ, শ্রীকর শ্রীপদ,
অঙ্গুলী চাঁপার কলি।
রস-প্রস্রবণ, প্রথম যৌবন,
কিবা ভাব টল-টলি॥

কর্ম্মদেবী।

আহা মরি এ কি মাধুরী-ছটা।
রূপের বাণিজ্য-বহিত্র-ঘটা॥
মাণিক-মণ্ডিত চরণ লাল।
অধরে জ্বলিছে মাণিক-মাল॥
দ্বিকর শোভিত লোহিত রাগে।
পদ্মরাগ শোভে যুগল ভাগে॥
দশন বিমল-মুকুতা-পাঁতি।
কিবা সমুজ্জ্বল তাহার ভাতি॥
অধর-অন্তরে শোভিত কিবা।
মৃদু মৃদু মুক্ত মোতির ডিবা॥
নিমীলিত আঁখি রতন নীল।
পলকের দ্বারে দিয়াছে খিল॥
চাঁচর চিকুর চামরজাল।
চরণ অবধি শোভিছে ভাল॥
তনুর সুরভি অগুরু প্রায়।
মধুপ মধুর মানসে ধায়॥
বাহুতে গজেন্দ্র দশন বিভা।

চন্দ্রকান্ত-মণি হাসির নিভা ॥
প্রবালের ছড়ি অঙ্গুলী-দলে।
কম্বুর কলনা নিরখি গলে ॥
কনক-বরণী তরুণী চারু।
কোন খানে দৃশ্য না হয় দারু ॥
অপরূপ এই প্রমদা-তরী।
যৌবন-সাগরে লোকন করি ॥
ইহার ধনিক বণিক্ কই !
কহ না আমায় যতেক সই ॥
বিভ্রম ভ্রমিতে পতিত তরী।
নাবিক-বিহীনা বিচার করি ॥

নবীনচন্দ্র।

রমণীর রূপ-বর্ণনায় নবীনচন্দ্রের একটু আনন্দ ছিল। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সুশোভিত চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, – তথায় পার্ব্বত্য-জীবনের সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি 'অবকাশ-রঞ্জিনীতে' নিম্নে নারী-মূর্ত্তির রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে
ঢলিয়া পড়েছে বামা কুসুমেষু-শরে,
কুসুম-শয়নে, কিন্তু কুসুমে কি পারে
নিবাইতে যে অনল জ্বলিছে অন্তরে ?

সুগোল সুবর্ণনিভ চারু ভুজোপরে
শোভে পূর্ণ-বিকশিত-বদন-কমল,
(রূপের কমল, মরি, কাম-সরোবরে)
ভানুর বিরহে—কিন্তু নিমীলিতদল !
শোভিতেছে অন্য করে কাব্য মনোহর,
স্খলিত অলকারাশি, পয়োধর-থর
বিশ্রামিছে অযতনে কাব্যের উপর,
পুণ্যবান্ কবি—কাব্য পুণ্যের আকর !
বিনোদ বদন-চন্দ্র, বিনোদ নয়ন
পল্লবে আচ্ছন্ন, পটে স্থির সন্নিবেশ ;
অতুল—বিনোদতম—ত্রিদিব-মোহন,
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিলাস-আবেশ।
বিলাস-বঙ্কিম-রেখা, কুহকী যৌবন
চিত্রিয়াছে কি কৌশলে সর্ব্ব অঙ্গে মরি,
পূর্ণতার পূর্ণাবেশ— সুনীল বসন
বিকাশি'ছে তলে তলে কনক-লহরী।

তিনি অন্যান্য স্থানে অন্যান্য ভাবে নারীচিত্র চিত্রিত করিয়াছেন—

শিলাকক্ষে,—একি দৃশ্য চিত্ত-বিদারক !
এক পার্শ্বে শিলাসনে একটী রমণী,
শায়িতা-মূর্চ্ছিতা ! মরি ! ফুলরাশি যেন
বনদেবী পুষ্পপাত্রে রহেছে পড়িয়া।

ক্ষুদ্র এক মেঘখণ্ড, সহ সৌদামিনী,
পড়িয়া ভূতলে, যেন পতনে মূর্চ্ছিতা।
নিমীলিত নেত্রদ্বয়। মুখশ্রী-সুন্দর
মিলন-স্তিমিত কান্তি; করুণা প্লাবিত।
অচঞ্চল ভ্রূযুগল দীর্ঘ-সুবঙ্কিম,
তুলিতে এঁকেছে যেন চারু চিত্রকর,—
স্থূল মধ্য-প্রান্তদ্বয় সূক্ষ্ম-রেখাঙ্কিত।
কোমল-কনক-কান্তি কপোল যুগলে
বিশ্রামিছে নয়নের কৃষ্ণ-রোমাবলি,
স্বভাব-অঞ্জন যেন, মরি কি সুন্দর!
উরস-স্খলিত চারু-কৌষিক বসন
কাঁপিতেছে সমীরণে দেখায়ে ঈষদে,
নবীন-যৌবন-শোভা রূপের সাগরে।
মানব-দুর্ল্লভ-রূপ! যেন শিল্পকর
কক্ষ শিলাধার হতে তুলিছে কাটিয়া,
অমানুষী শিক্ষা বলে, রেখেছে মাখিয়া,
তরল বিদ্যুতে কিম্বা স্বর্ণ মলম্বায়।
কিন্তু যে অচিন্ত্য ভাব দর্শক হৃদয়ে
হয় বিভাসিত রূপে;—দেখিতেছ যেন
অনন্ত স্বর্গের শোভা সম্মুখে তোমার,
উন্মোচিত;—হায়! তব তাপিত হৃদয়
শারদ-জ্যোৎস্না-স্নাত হইতেছে যেন।

শিথিল সুভুজবল্লী শীতল পাষাণে
অযত্নে পড়িয়া পার্শ্বে বিকাশিছে মরি,
যেই চিত্তদ্রবী ভাব দীন, নিরাশ্রয় ;—
নাহি সাধ্য—না পারিবে নর-শিল্পী কভু
তুলিতে চিত্রিতে পটে, কাটিতে পাষাণে ।
বহুমূল্য রত্ন-রাজি উজ্জ্বল উরসে,
সুগোল প্রকোষ্ঠে, কর্ণে, বঙ্কিম গ্রীবায়,
নিটোল বাহুতে, চারু কটি-কুম্ভোপরে,
শোভিতেছে অঙ্গে অঙ্গে ; কহিছে দর্শকে
রত্নাকর-রত্ন এই রূপসী রমণী ।

অন্য চিত্র-

বাম করে বক্ষে, দক্ষিণ করেতে,
শোভিছে মোহিনী মালা,
মালা করে নিজে শোভিছে মোহিনী
কানন করিয়া আলা ।
গৌরাঙ্গ গৌরবে ঈষৎ-রক্তিমা,—
তরুণ—অরুণাভাস ;
সুগোল বদন, বালার্ক মণ্ডলে
মহিমার পরকাশ ।
বিলাস-বিহ্বল বিস্তৃত নয়নে
মদালস দুই তারা ;

যৌবন কুরঙ্গ ছুটিয়া, ছুটিয়া,
অঙ্গে অঙ্গে মাতোয়ারা।
ঈষৎ-ঝুলান রক্তিম অধরে
বাসনা-সমুদ্র জাগে ;
সুপ্ত ক্রোধানল, মানের ঝটিকা
সুকুঞ্চিত প্রান্তভাগে।
ভুবন-মোহিনী দাঁড়ায়ে নীরবে
দেখিতে সখীর হাসি,
হাসি হাসি সখী, নয়ন ভরিয়া,
দেখিছে রূপের রাশি।

অন্য চিত্র-

ফলে পুষ্পে তরুগণ, শোভে তীরে অগণন,
শোভে শৈল-ঘাটে সুহাসিনী,
যেন নীলোৎপল চারু, রূপবতী জরৎকারু,
বাসুকীর কনিষ্ঠা ভগিনী।
প্রফুল্ল নীলাব্জ মুখ, ফুটন্ত নীলাব্জ বুক,
শোভে অঙ্গ নীলাব্জ বরণ,—
কাদম্বিনী-মনোহরা, বারি বিদ্যুতেতে ভরা,
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে নয়ন।
গর্ব্ব-পূর্ণ-রক্তাধরে, সবারি বিদ্যুৎ ঝরে ;
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে হৃদয় ;



হৃদয় ভরিয়া হায়! তরঙ্গ খেলিয়া যায়,—
উত্তাল, উন্মত্ত, ফেনময়।
আকর্ণ যে যুগ্মভুরু, পূর্ণ সে নিতম্ব উরু,—
কি লাবণ্য-লীলা স্থূল তায়!
নবীন যৌবন-রঙ্গে, ছুটিয়াছে যে তরঙ্গে,
কে বলিবে পূর্ণতা কোথায়?
তরঙ্গিত রূপরাশি, শেষ সোপানেতে বসি;
পড়িয়াছে দীর্ঘ কেশভার,
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে, পশ্চাতে সখীর অঙ্গে,
শৈল-ঘাটে, করিয়া আঁধার!
উরুপরে বাম কর, কর-পদ্মে শশধর,
একগুচ্ছ কেশে অন্য কর,
নীরব নয়ন স্থির, চেয়ে আছে নীল নীর,
নীল নীরে প্রতিমা-সুন্দর।

প্রেমিকের নয়নে প্রেমিকার চিত্র কত সুন্দর!—

সুনীল উজ্জ্বল দুই নয়ন তোমার,
মানস-সরসে মম দিতেছে সাঁতার।
কোমল কাঞ্চন কান্তি, রূপের কিরণ,
হাসিছে আলোকি' মম হৃদয়-গগন।
মুকুতার হারে গাঁথা অধর যুগল,
সুন্দর গোলাপী রসে করে টলমল।

মধুর তরল হাসি সতত তথায়,
বিরাজিছে যেন স্থির বিজলীর প্রায় ।
এখনও দেখি যেন ধরিয়া গলায়,
প্রেমভরে কত কথা কহিছে আমায় !
দুলিছে সৌন্দর্য্য তব, স্মৃতির গলায়,
দোলে যথা নব লতা সহকার গায় ।

উত্তরার চিত্র কবির মানসী প্রতিমা—

ক্ষুদ্র এক খণ্ড ফুল্ল নিরমল
বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরিয়া,
সৃজিলেন বিধি মূর্ত্তি উত্তরার,
অঙ্গে অঙ্গে রূপ-তরঙ্গ তুলিয়া ।
আনন্দ-নির্ঝর উছলে হৃদয়ে,
আনন্দ-নির্ঝর নয়ন-তারা,
আনন্দ-নির্ঝর ক্ষুদ্র রক্তাধর
ঢালে অবিরল আনন্দধারা ।
সে হাসি আনন্দ, আনন্দ সে ভাষা,
কাঁদিতেও হাসি অশ্রুতে ভাসে ;
অভিমান-ভরে থাকে যদি বালা,
কোথা হাসি যেন লুকায়ে হাসে ।
যথায় উত্তরা তথা উচ্চ হাসি,
তরঙ্গে-তরঙ্গে বাঁশরী ঝঙ্কার,

যথায় উত্তরা তথা উচ্চ ভাষা—
কিশোরীর ? না, না, স্বর্গীয় বীণার !
হাসিতে, ভাষিতে, কিম্বা মূর্চ্ছনায়
আনন্দ-সঙ্গীত বহে অবিরল ;
চঞ্চলার মত যাইতে ছুটিয়া,
না ছোঁয় ধরণী চরণ চঞ্চল ।
এই হাসি-রাশি কুসুম-কাননে
কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ !
কহিছে যৌবন—"উত্তরা যুবতী ।"
কৈশোর কহে—"না, কিশোরী এখন ।"

আরও একখানি মধুর চিত্র—

সিন্ধুতীরে শিলাসনে, বিস্ফারিত দু'নয়নে,
বসি বামা নারী-গর্ব্বে প্রদীপ্ত নয়ন ;
নারিগর্ব্বে পূর্ণ মুখ, পূর্ণিত পীবর বুক,
শোভিছে বিদ্যুৎদীপ্ত মেঘখণ্ড সম ।
অনার্য্যের সেনাপতি, সাজিয়াছে রূপবতী,
কেশের উষ্ণীষ শোভে ললাট উপর ;
উষ্ণীষে চূড়ার শোভা, চন্দ্রকরে মনোলোভা,
উরস্ত্রাণাবৃত উচ্চ উরস সুন্দর ।
পৃষ্ঠে তূণ, শরাসন, নিদ্রিত ভুজঙ্গ সম,
কটিবন্ধে ক্ষীণ কটি শোভে ক্ষীণতর ;

খচিত কোষে ঝলসি নিতম্ব-বিলম্বী অসি,
শোভিছে সফণা ফণী তীব্র বিষধর ।
শোভে ভুজে সুকুমার মনমথে কণ্ঠহার—
রতন কঙ্কণ কিবা আদরে আবরি !
সুপ্রকোষ্ঠে মনোলোভা, বিলোল বলয়-শোভা,
খেলে কর সঞ্চালনে—কিবা লীলা করি !
কর্ণের কুণ্ডলদ্বয়, খেলে কিবা লীলাময় !
সুগোল কোমল কণ্ঠে কণ্ঠী মনোহর ;
কোমল কৌষিক শোভা,কি উরুতে মনোলোভা,
সুগোল চরণে শোভে মঞ্জীর মুখর ।
রয়েছে ঈষদ্ হাসি, অধর কোণায় ভাসি,
চাহি চন্দ্র পানে বামা বসি অবিচল,

অনার্য্যার শ্যামরূপ কি মনোহর—

"নীলাব্জের লীলা-নীলিমায়
দেখি নাই যতদিন, ভাবিতাম মনে
তামরস ত্রিদিব শোভায় ।
শ্যামাঙ্গিনী অনার্য্যার রূপে যে মদিরা,
আছে যেই লালসা প্রখরা,
গৌরাঙ্গিনী আর্য্যবালা রূপ জ্যোৎস্নায়
নাহি সেই লাবণ্য মুখরা ।

অনার্য্যা কানন-বালা কানন-মদিরা,
বিদ্যুৎ-পূরিতা উগ্র সুরা।
উদ্যান দাড়িম্ব-সুধা আর্য্যা বামাঙ্গিনী,—
পুষ্প-সুধা কোমলা মধুরা।

ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর চিত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা বিদায় লইলাম-

অর্দ্ধ-অনাবৃত পীণ পূর্ণ-পয়োধর
তুষার উরস, স্বচ্ছ স্ফটিক আকার,
দেখাইছে রমণীর অমল অন্তর—
চির প্রসন্নতাময়, প্রীতি-পারাবার।
নহে উপমেয় সেই বদন-চন্দ্রমা,
কিংবা যদি দেখিতাম লিখিতাম তবে—
স্বর্গীয় শারদ-শশী-সে মুখ সুষমা;—
বিশ্ব-বিমোহিনী আহা! অতুলিতা ভবে।
বসন্তরূপিনী ধনী; নিশ্বাস মলয়;
কোকিল কোমল কণ্ঠ; নেত্র কুবলয়।

কোটি কহিনুর কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাট-রত্ন সেই বরাননে;
গৌরবের রঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক-কিরণে,
কনক অলকাবলী—বিমুক্ত কুঞ্চিত,

অপূর্ব্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির-বিকসিত-পুষ্প, চির-সুবাসিত
বামার সুরভি শ্বাস, কুসুম-সৌরভ
ঘ্রাণে মর অমরতা করে অনুভব ।

ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্ম্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্ম্মালায় খচিত,
জ্যোতিরত্নে অলঙ্কৃত, জ্যোতিই সকল ;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতিঃ চিরপ্রজ্বলিত ।
উজ্জ্বল সে জ্যোতিঃ জিনি মধ্যাহ্ন-তপন ;
অথচ শীতল যেন শারদ-চন্দ্রিমা ;
যেমন প্রখর তেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃতমাখা পূর্ণ-মধুরিমা ।
ক্লাইব মুদিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে,
ভুবন-ঈশ্বরী-মূর্ত্তি দেখিলা নয়নে !

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

এক 'মহিলা' কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তিনি কাব্যের আরম্ভে লিয়াছিলেন,—

"গাবো গীত খুলি হৃদি-দ্বার—
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার ।"

তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি গ্রন্থের অবতরণিকায় রমণী-সৃষ্টির চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন—সহসা "ভূলোক পুলকপূর্ণ, জন্মিল ললনা—তাহার রূপ—

বিকচ-পঙ্কজ-মুখে—শ্রুতি-পরশিত
সলাজ লোচন ঢল ঢল,
চাঁচর চিকুর চারু চরুণ-চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল!

কাতর হৃদয় ভরে,
স্বচ্ছ মুক্তা কলেবরে
ঢল ঢল লাবণ্যের জল!
পাটল কপোল কর চরণের তল।

পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধমুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধ-মুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে!

স্পর্শে পদ রাগ-ভরা,
অশোক লভিল ধরা,
এলোকেশে কে এলো রূপসী!
কোন্ বন-ফুল কোন্ গগনের শশী (!)

অক্ষয়কুমার বড়াল

রমণীরূপে কামনার ছায়া স্পর্শ হইতে দেন না। তিনি সে রূপে আত্মহারা হইয়া লালসা-কালিমা-কলঙ্কিত পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া রূপমাধুরী পান করেন। তাঁহার নিকট রমণীর সবই সুন্দর—

সে দিঠি তরল জোছনায়
এলাইয়া পড়ে দেহ আলসে।
হৃদয়ের মেঘ থরে থরে
সুখের লহরী কত অলসে!
সে শ্বাস মলয়-সমীরণে
কি মদিরা অধীরতা বরষে!
কল্পনার বনে উপবনে
কত ফুল ফোটে ঝরে হরষে!
সে হাসি বিমল ঊষালোকে
কি নব চেতনা জাগে পরাণে!
স্বপনের ম্লান ঝোপে ঝোপে
কত পাখী গেয়ে উঠে কে জানে!
সে স্বর—নির্ঝর ঝর-ঝর,
উছলি চলিছে প্রেম-গরবে—
কামনার কূল উপকূল
রসে রসে ভেসে যায় নীরবে!

সে পরশ—তড়িত-চমকে
এ ধরা-জনম লয় ছিনিয়া—
কোটি জন্ম এ জন্মে মিশায়ে,
কোটি ধরা এ ধরায় আনিয়া !

তাঁহার "রমণী" কবিতায় তাঁহার এই ভাব পরিস্ফুট—

রমণি রে, সৌন্দর্য্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা,
যেন বিধাতার দৃষ্টিজড়িত প্রকৃতি সনে ;
দেব প্রাণ বেদ-জ্ঞানে সাধা ।
সৌন্দর্য্যের মেরুদণ্ড তুমি,
শৃঙ্খলা দাঁড়ায়ে তোমা পরে ।
তপনের রশ্মি-বলে চলে যথা গ্রহগণ,
তালে তালে গেয়ে সমস্বরে ।
তোমারি ও লাবণ্য-ধারায়
কালের মঙ্গল পরকাশ ।
অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
মেঘ ঘোরে স্বর্গের আভাস !
প্রাণান্তক জীবন-সংগ্রামে
তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ ।
নিত্য জয়-পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
অঞ্চলে লইয়া সুখ-সাধ ।

বিধাতার মহাকাব্য তুমি,
সসীমে অসীমে সম্মিলনী ।
ঘরে ঘরে কোটি যোগী, কোটি কবি সিদ্ধকাম,
তোমা-মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনি ।
স্বর্গ-চ্যুত, নরক-উত্থিত,
নিয়তি-তাড়িত নর-মতি
ভুলে গেছে জন্মগত সে অতৃপ্তি উদ্দমতা
পেয়ে তব প্রেমের আরতি ।
দেবতারা স্বর্গ হ'তে নামে
লভিতে তোমার ভালবাসা ।
হেন ত্রিভুবন-ঘেরা সুধা-সিন্ধু নাহি বুঝি
ব্রহ্মাণ্ডের জুড়াতে পিপাসা !
নিজ-করে গড়ি ও প্রতিমা,
নিজে বিধি মুগ্ধনেত্রে চাহি !
স্বর্গের স্খলিত ধরা আবার উঠিছে স্বর্গে
ও দেহে হৃদয় অবগাহি ।

রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রমণী-রূপের বর্ণনার অভাব নাই। সে সব বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উপযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে রচিত কবিতাতেও এইরূপ বর্ণনা অনেক ছিল—

লতা-পাতা-ঘেরা জানালা মাঝারে একটি মধুর মুখ।
চারিদিকে তার ফুটে আছে ফুল,
কেহ বা হেলিয়া পরশিছে চুল,
দু'একটি ছায়া কপাল ছুঁইয়া,
দু'একটি আছে কপোলে নুইয়া,
কেহ বা এলায়ে চেতনা হারায়ে
চুমিয়া আছে চিবুক।
বসন্ত প্রভাত লতার মাঝারে মু'খানি মধুর অতি!
অধর দুটির শাসন টুটিয়া
রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
দুটি আঁখি পরে মেলিছে মিশিছে
তরল চপল জ্যোতি।

আর একটি বর্ণনা—

পূর্ণিমা-রূপিনী বালা! কোথা যাও, কোথা যাও!
একবার এই দিকে নয়ন তুলিয়ে চাও!
কি আনন্দে চেলেছ যে, কি তরঙ্গ তুলেছ যে
আমার হৃদয়-মাঝে, একবার দেখে যাও!

আমার এ লঘু-পাখা কল্পনার মেঘগুলি
তোমার প্রতিমা বালা, মাথায় লয়েছি তুলি ;
তোমার চরণ-জ্যোতি পড়িয়া সে মেঘপ'রে
শত শত চন্দ্রধনু রচিয়াছে থরে থরে !
তোমার প্রতিমা লয়ে কিরণে কিরণে ভরা
উড়িছে কল্পনা—কোথা ফেলিয়ে রেখেছে ধরা !
হরিত-আসন পরে নন্দন-বনের কাছে,
ফুল-বাস পান করি বসন্ত ঘুমায়ে আছে,
ঘুমন্ত সে বসন্তের কুসুমিত কোল পরে
তোমার কল্পনা-রাণী বসায়েছে সমাদরে
চারিদিকে যূঁই-ফুল—চারিদিকে বেলফুল,
ঘিরে ঘিরে রহিয়াছে অজস্র কুসুম-কুল ;
শাখা হোতে নুয়ে পড়ে পরশিয়া এলোচুল ;
শতেক মালতী কলি হেসে হেসে ঢলাঢলি
কপালে মারিছে উঁকি, কপোলে পড়িছে ঝুঁকি,
ওই মুখ দেখিবারে কৌতূহলে সমাকুল।
মর্ম্মভেদী আশা এক লুকানো হৃদয়তলে,
ওই হাতে হাত দিয়ে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে
সেবিব বসন্তবায় কুসুমের পরিমলে,
আকাশে হাসিবে চাঁদ নয়নে লাগিবে ঘোর,
জাগরণে স্বপ্নাবেশে করিব রজনী ভোর !

এই সকল বর্ণনায় চিত্র আঁকিবার আগ্রহ পরিস্ফুট—

যেন রে কোথায় তরুর ছায়ায়
বসিয়া রূপসী বালা,
কুসুম-শয়নে আধেক মগনা,
বাকল-বসনে আধেক নগনা,
সুখ দুখ গান গাহিছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা !

আবার—

এলোথেলো চুলগুলি ছড়িয়ে
ওই দেখ সে দাঁড়িয়ে রয়েছে ;—
নিমেষ-হারা আঁখির পাতা দুটি
চোখের জলে ভ'রে এয়েছে !—
গ্রীবাখানি ঈষৎ বাঁকানো
দুটি হাতে মুঠি আছে চাপি,
ছোট ছোট রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট
ফুলে ফুলে উঠিতেছে কাঁপি !
সাধিলে ও কথা কবে না,
ডাকিলে ও আসিবে না কাছে ;
সবার পরে অভিমান ক'রে
আপ্‌না নিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আছে !

কি হয়েছে কি হয়েছে ব'লে
বাতাস এসে চুলগুলি দোলায় ;—
রাঙ্গা ওই কপোলখানিতে
রবির হাসি হেসে চুমো খায় !
কচি হাতে ফুল দু'খানি ছিল
রাগ ক'রে ওই ফেলে দিয়েছে,
পায়ের কাছে প'ড়ে প'ড়ে তা'রা
মুখের পানে চেয়ে রয়েছে !

রমণীর স্বরূপ কে জানিতে পারে ? রমণী যে সৌন্দর্য্যের সার—

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা !
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা !
কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি !
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে,
ঐ নয়নের তারা !

রবীন্দ্রনাথ রুচিবাগীশদিগের কন্তার বর্ণনা না করিয়া যে সব বর্ণনা করিয়াছেন, সে সব সাহিত্যে সমাদৃত—

ফেল গো বসন ফেল— ঘুচাও অঞ্চল।
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ

সুর-বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি—বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা!
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা!
সর্ব্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ
সর্ব্বাঙ্গে মলয়-বায়ু করুক সে খেলা।
অসীম নীলিমা মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মত।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল ঊষা মানব-ভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে।

পুনঃ—

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়,
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শতলক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপন!
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়!
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্য্যলোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণচ্ছায়ায়!

যৌবন সঙ্গীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে,
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হোথা যে নিঠুর মাটী, শুষ্ক ধরাতল,—
এস গো হৃদয়ে এস, ঝুরিছে হেথায়
লাজ-রক্ত লালসার রাঙা শতদল।

আবার -

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি,
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
শিশিরেতে টলমল ঢল ঢল ফুল,
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগত আকুল
সারা নিশি সারা দিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি।
পূর্ণ দেহখানি হ'তে উঠিছে সুবাস।
মরি মরি কোথা সেই নিভৃত নিলয়,
কোমল শয়নে কোথা ফেলিছে নিশ্বাস
তনু-ঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়!
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালা।

পুরুষের নয়নে রমণীর রূপ কত মনোহর—

বর। কি করিছ বনে শ্যামল শয়নে
আলো করে' বসে' তরুমূল ?
কোমল কপোলে যেন নানা ছলে
উড়ে এসে পড়ে এলোচুল !
পদতল দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বহে' যায় নদী কুলুকুল।
সারাদিনমান শুনি' সেই গান
তাই বুঝি আঁখি ঢুলুঢুল !
আঁচল ভরিয়া মরমে মরিয়া
পড়ে' আছে বুঝি ঝুরো ফুল ?
বুঝি মুখ কার মনে পড়ে, আর
মালা গাঁথিবারে হয় ভুল !
কা'র কথা বলি' বায়ু পড়ে ঢলি'
কানে দুলাইয়া যায় দুল।
গুন্ গুন্ ছলে কা'র নাম বলে
চঞ্চল যত অলিকুল ?
কানন নিরালা, আঁখি হাসি ঢালা,
মন সুখস্মৃতি সমাকুল !

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার রূপ-বর্ণনা প্রচুর—

নিবিড় নির্জ্জন বনে নির্ম্মল সরসী—
এমনি নিভৃত নিরালয়, মনে হয়

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সেথা বঙ্গলক্ষ্মীগণ
স্নান ক'রে যায় ; গভীর পূর্ণিমা রাত্রে,
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শষ্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে
স্খলিত অঞ্চলে।

পুনঃ –

সেথা তরু অন্তরালে
অপরাহ্ন বেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম
আশৈশব জীবনের কথা ; সংসারের
মূঢ় খেলা দুঃখ-সুখ উলটি পালটি ;
জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা,
অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্ত্ত্য মানবের।
হেন কালে ঘন তরু অন্ধকার হ'তে
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল,
সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে !
কি অপূর্ব্ব রূপ ! কোমল চরণতলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল ?
ঊষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব্ব-পর্ব্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকসিত, তেমনি বসন তার



মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে। নামি' ধীরে সরোবর-তীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া ;
উঠিল চমকি'। ক্ষণ পরে মৃদু হাসি'
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ ; মুক্তকেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে
কোমল কাতর—প্রেমের করুণা-মাখা।
নিরখিলা নত করি' শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া, নব গৌরতনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস ; সরোবরে
পা দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন
চরণের আভা।—বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরক বয়স
যাপিল নয়ন মুদি,—যে দিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবর-জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন

রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। ক্ষণ পরে,
কি জানি কি দুঃখে, হাসি মিলাইল মুখে,
ম্লান হ'ল দুটি আঁখি ; বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি ;
নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে' গেল ;
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি'
আঁধার রজনী পানে ধায় মৃদু পদে।

* * * *

ভাবিতে ভাবিতে
সর্ব্বাঙ্গে হানিতেছিল ঘুমের হিল্লোল
দক্ষিণের বায়ু। সপ্তপর্ণ শাখা হ'তে
ফুল্ল মালতীর লতা আলস্য আবেশে
মোর গৌর তনুপরে পাঠাইতেছিল
নিঃশব্দ চুম্বন ; ফুলগুলি কেহ চুলে,
কেহ পদতলে, কেহ স্তনতটমূলে
বিছাইল আপনার মরণ শয়ন।

* * * *

পূর্ব্বাচল হ'তে
ধীরে ধীরে সরে' এসে পশ্চিমে হেলিয়া
দ্বাদশীর শশী, সমস্ত হিমাংশু-রাশি
দিয়াছে ঢালিয়া, স্খলিতবসন মোর
অম্লান নূতন শুভ্র সৌন্দর্য্যের পরে।

সুপ্তা-সুন্দরীর রূপের বর্ণনা এইরূপ—

কমলফুল-বিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।
মুখের পানে চাহিনু অনিমিষে
বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা !
মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে।
একটি বাহু বক্ষপরে পড়ি'
একটি বাহু লুটায় একধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি' পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি',
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি !
দেখিনু তারে উপমা নাহি জানি ;
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি ;
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন ভরা লাবণ্যে নিরালা।

রবীন্দ্রনাবুর উর্ব্বশী কবিতায় এই রমণী-রূপলাবণ্যের পূর্ণবিকাশ—

যুগ-যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশি !
মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল,



তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ-চিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে !
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা বিদ্যুৎ চঞ্চলা ।
সুর-সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশি !
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্ত-ধারা ।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসংবৃতে !
স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশি !
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার ।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত-রঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনি !

কিন্তু রমণীর রূপ কি পুরুষের কল্পনাপুষ্ট নহে ?—

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী !
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হ'তে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার পরে নূতন মহিমা।
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা ;
কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না,
সিন্ধু হ'তে মুক্তা আসে খনি হ'তে সোনা,
বসন্তের বন হ'তে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমায় দুর্ল্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।

রমণী-রূপলাবণ্য মানবমাত্রকেই আকৃষ্ট করে—চিত্ত মোহিত ও আকৃষ্ট করাই রূপের ধর্ম্ম। কবিরা মানবের মনোগত ভাব ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাই যুগে যুগে কবিকুল রমণী-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন ; তাঁহাদের সেই সকল রচনা সাহিত্যের অলঙ্কার—সর্ব্বত্র সমাদৃত ; বাঙ্গালাদেশে সুলেখকের—সুকবির অভাব নাই। তাই বাঙ্গালা-সাহিত্যও তাঁহাদিগের রমণী-রূপ-বর্ণনায় সমৃদ্ধ। আমরা তাঁহাদিগের রচনা

রত্নাকর হইতে সেই সকল রত্ন সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। আমরা নানা কারণে জীবিত লেখকদিগের অনেকেরই রচনা হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিয়াছি। তাঁহাদের অনেকের বর্ণনা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। রূপ বহ্নিরই মত পবিত্র—বহ্নিরই মত সুন্দর—কিন্তু তাহার দাহিকা-শক্তিও প্রবল। মানুষ যুগে যুগে সেই বহ্নিদাহ হইতে মুক্ত হইয়া তাহার পবিত্র সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করুক; ইহাই কবির স্বপ্ন—ইহাই ভক্তের কামনা—ইহাই সাধকের সাধনা।

চতুর্থ উচ্ছাস



লেখক—শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

"প্রাচীন সাহিত্যে নারীর রূপ"

এই রোগ-শোক-আধি ব্যাধি-সঙ্কুল মানব-জীবনে উল্লাসময় আনন্দ-রাজ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মহাকবিগণ যত প্রকার সৌন্দর্য্য-প্রধান ভাবময়ী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার মধ্যে রমণী-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই প্রধানভাবে উল্লেখযোগ্য; এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে যে কয়জন মহাকবি অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতির নামই সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য সেই মহাকবিদ্বয়ের কবিতাসৃষ্টির নন্দন-কানন হইতে বাছিয়া বাছিয়া—রমণী-সৌন্দর্য্যরূপ চির-সৌরভময় পারিজাতপুষ্পরাজির একগাছি সুন্দর মালা গাঁথিয়া নূতন উপহার অস্ত জননী বঙ্গভাষার সেবার জন্ম সাধারণে প্রকাশিত হইল। আশা করি, প্রত্যেক বঙ্গবাসীর হৃদয়ে এ মালিকা অতুলনীয় আনন্দ-প্রদানে সমর্থ হইবে, কবি-কাননচয়িত দিব্যগন্ধামোদিত পারিজাত-মালা সাহিত্য সমাজে চিরসমাদৃত হইয়া থাকিবে।

সংগ্রাহক - শ্রীহরিপদ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ

এই চরাচরময় পরিদৃশ্যমান জগতে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের আদর। শৈল, বন, উপবন, নদ, নদী, তরু, লতা প্রভৃতি যাহা কিছু স্থাবর সম্পত্তি, সে সকলই সুষমামণ্ডিত। আবার পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বরেণ্য—মানব-জাতিও ঐ সৌন্দর্য্য লইয়াই উন্মত্ত। পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যিনি রূপ দেখিয়া আত্মহারা না হন। যিনি ত্রিলোকগুরু, পরমযোগী ভোলানাথ, তিনিও ঐ রূপ দেখিয়াই অন্ধ, বাহ্যজ্ঞানহীন। কত সিদ্ধতপস্বী ঐ উৎকট রূপের প্রবল মোহে মুগ্ধ হইয়া—আত্মবিস্মৃত হইয়া বহুজন্মার্জ্জিত, কঠোর-ক্লেশসঞ্চিত পবিত্র পুণ্যরাশি, এক মুহূর্ত্তে ক্ষণকালমধ্যে, চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া সে জন্মের মত রমণীমুখপদ্ম সার ভাবিয়া তাহারই সেবা করিয়াছেন। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত দুর্ল্লভ নহে, ভূরি ভূরি জাজ্জ্বল্যমান! এই সৌন্দর্য্যই ব্যক্তিগত শুভাশুভের কারণ। কেহ এই মোহে মুগ্ধ হইয়া চিরকালের মত,—যাহা কিছু কর্ত্তব্য—সে সবই বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত করিয়া তাহাতেই মত্ত হন। আবার কেহ বা, ঐ আপাতরমণীয়—পরিণাম-বিরস রসে—কিছুকাল আত্মবিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার স্বীয় অধোগতি চিন্তাপূর্ব্বক—নিজ কর্ত্তব্যপথের পথিক হয়, আর সে পথে চলে না। এই সৌন্দর্য্য নানারূপে প্রকটিত, পার্থিব ও অপার্থিব; পার্থিবও স্থাবর-জঙ্গমভেদে বহুবিধ। পদ্ম, চন্দ্র, জ্যোৎস্না, বিদ্যুৎ, শৈল, বনানী প্রভৃতির যাহা সম্পত্তি-শোভা, তাহা স্থাবরগত। আর নর, নারী, মৃগ, চকোর, খঞ্জন প্রভৃতির সুষমা—জঙ্গমগত।

অধিক কি, জগতের প্রাণিমাত্রেই—একটা কিছু সৌন্দর্য্য আছেই। অতি করাল কালসর্পেও কিছু সৌন্দর্য্য বিদ্যমান। তরঙ্গ-ভঙ্গ-ভীষণ জলধিজলকল্লোলে, লেলিহান জ্বালা-ভৈরব দাবানলে—নরশোণিতলোলুপ শার্দ্দূলেও একটা বিজাতীয় সৌন্দর্য্য অনুস্যূত আছে,—তাহা সকলে দেখিতে পান না,—বুঝিতে—হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। ভাবুকমাত্রেই—সকল স্থলেই তদুপযোগী শোভা উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। সুতরাং আধারভেদ, স্থানভেদ, আবার দর্শক-ভেদে, সৌন্দর্য্য ভিন্ন ভিন্ন। সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর যাহা কিছু সৃজন করিয়াছেন, তাহা সবই সুষমার উপাদান-কারণে গঠিত, সজ্জিত, মার্জ্জিত।

এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করা যাউক, আমাদের ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে সৌন্দর্য্য ও তাহার বর্ণনা নানারূপে বিদ্যমান। তন্মধ্যে প্রাকৃতিক বর্ণন, সুন্দরভাবে চিত্রিত আছে। আর সুন্দরীর পরমা শোভা, যদি দেখিতে চাও, তবে কালিদাসাদি মহাকবির মহাকাব্য প্রভৃতির আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে, তাঁহারা প্রতিচ্ছত্রে রমণীর নখ হইতে চিকুর পর্য্যন্ত প্রতি অবয়ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহারা কখনও রমণীর মুখের তুলনার জন্য সুধাধার—সুধাকরকে গগন হইতে আনিয়া আবার রমণীর বদনের সৌন্দর্য্যে তাহাকে তিরস্কৃত করিয়া গগনে পাঠাইয়াছেন, তদবধি চন্দ্র কলঙ্কী হইয়া ম্লানকান্তি হইয়াছেন। সেই লজ্জায় কখনও সমুদ্রের জল-প্রবাহে, কখনও বা সূর্য্যমণ্ডলে, কখনও সমীর-সঞ্চালিত মেঘান্তরালে লুকাইয়া নিজ মহত্ত্ব রক্ষা করেন। তাঁহারা ঐ মহনীয় কমনীয় চন্দ্রদেবকে,

রমণীর চরণাঙ্গুলির নখরসাম্যে যোজিত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। সুতরাং প্রাচীন কবিগণ—এই ত্রিভুবনে একমাত্র ললনাগণকে সুষমার ভাণ্ডার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহীয়সী রমণীজাতির বাহ্যিক সৌন্দর্য্য অতিরিক্ত হইলেও তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ মহত্ত্বই অধিকতর।

আদিকবি বাল্মীকি, পরম কারুণিক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ, ভারবি, বাণ, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস পর্য্যন্ত সকলেই নিজ মহাকাব্য ও নাটকাদিতে রমণীকে উজ্জ্বল-বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ জগতে যদি কিছু জঙ্গম পদার্থে সৌন্দর্য্য থাকে, তবে তাহার প্রথম উদাহরণ রমণী ও তাহার কমনীয়-কান্তি বদনমণ্ডল, অথবা শুধু বদন কেন? যখন তাহার যে অবয়ব আমাদের অপাঙ্গ-পথের পথিক হয়,—তখনই মনে করি,—এতদপেক্ষা সুন্দর, নয়নরঞ্জন পার্থিব বস্তু আর কিছুই নাই,—বুঝি, ঈশ্বর একাগ্রচিত্তে জগতের রমণীয়, লোভনীয় সকল বস্তুর সৌন্দর্য্যসার লইয়া এই সামগ্রী সৃজন করিয়াছেন; নতুবা উহার এরূপ চিত্তাকর্ষক নয়নরঞ্জন গুণ কোথা হইতে আসিল?—আর কবিগণ বিশ্বের সকল বস্তু ত্যাগ করিয়া কেবল উহাকেই ঈদৃশ, তাদৃশভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন কেন? নিশ্চয় উহাতে কিছু অপার্থিব, স্বর্গীয় সম্পৎ বিদ্যমান;—তাহা না হইলে, রমণীজাতির সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্যরাশি উছলিয়া জগজ্জনমনকে বিচলিত করে কেন?

প্রাচীন সাহিত্যসমূহে বাল্মীকি, মহর্ষি বেদব্যাস প্রভৃতি আদি-কবিগণ হইতে অধুনাতন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-সাহিত্যে সর্ব্বত্রই রমণীর

অঙ্গসৌষ্ঠব, হাব-ভাব, কটাক্ষ, বিলাস-বিভ্রম, হাস্ত-লাস্ত-প্রমুখ যাবতীয় আঙ্গিক ও বাচিক ভাবসমূহ সুস্পষ্টভাবে ও বহুল ভঙ্গীতে বর্ণিত আছে। —বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে আমাদের মহাকবি কালিদাসই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে ললনা-চিত্রাঙ্কনে নিপুণ চিত্রকর। তৎকৃত কাব্য, নাটক ও ত্রোটকাদির মধ্যে যখন যাহা দেখি, তখনই মনে হয়, এইখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; এতদপেক্ষা মনোরঞ্জন চিত্র বুঝি আর নাই। ইহাই বোধ হয়, রমণীয় সৌন্দর্যাপট। আদিকবি বাল্মীকি ও ব্যাসের নিকট এ জগতে কোন্ কবি ঋণী নহেন? সুতরাং তাঁহাদের চিত্র যে নিরুপম, তাহা কে না স্বীকার করিবে? এক্ষণে কালিদাস প্রভৃতির সাহিত্যে রমণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য কিরূপে বর্ণিত আছে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্য লিখিয়া রঘুবংশ রচনা করেন। তিনি জগন্মাতা হরমনোরমা শৈলসুতার পবিত্র মূর্ত্তি যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, কালিদাস ব্যতীত অপর কোন কবির সাধ্য নয়। ঐ পুণ্য, অনৈসর্গিক রূপবর্ণনে মহাকবির লেখনীই শক্তি-মতী ; আর তিনি পার্ব্বতীর মূর্ত্তি যে ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কেবল পার্ব্বতীরই যোগ্য। তিনি কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে অপর্ণার আরাধ্য চরণপদ্মকে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী
গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশলুব্ধৈ-
রাদিৎসুভির্নূপুরশিঞ্জিতানি॥"



ঘাটে

বসুমতী প্রেস

"নতাঙ্গী শৈলতনয়া তাঁহার নূপুর-নিক্বণলুব্ধ রাজহংসগণ কর্ত্তৃক প্রত্যুপদেশ-প্রত্যাশায় যেন বিলাস-বক্রগতি বিষয়ে শিক্ষিত হইয়াছিলেন।" এই:ভাবে পরস্পর শিক্ষার আদান-প্রদান-ব্যবহার দ্বারা পূর্ব্বে শিক্ষা-ব্যবস্থা চলিত।

"অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাভি-
র্নিক্ষেপনাদ্রাগমিবোদ্‌গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্॥"

"তাঁহার চরণদ্বয় উন্নত অঙ্গুষ্ঠনখপ্রভায় যেন রঞ্জনদ্রব্য বমন করিয়াই—পৃথিবীতে স্থিতিরহিত স্থলপদ্ম শোভা আহরণ করিয়াছিল; পার্ব্বতীর জঙ্ঘা-বর্ণন প্রস্তাবে মহাকবি বলিয়াছেন,—

"বৃত্তানুপূর্ব্বে চ ন চাতিদীর্ঘে
জঙ্ঘে শুভে সৃষ্টবতস্তদীয়ে।
শেষাঙ্গনির্ম্মাণবিধৌ বিধাতু-
র্লাবণ্য উৎপাদ্য ইবাস যত্নঃ॥"

"সুবৃত্ত, অনুপূর্ব্ব, নাতিদীর্ঘ, মঙ্গলময় তদীয় জঙ্ঘাদ্বয় সৃজন করিয়া, অবশিষ্ট অঙ্গ-নির্ম্মাণ বিষয়ে:যেন বিধাতার লাবণ্যের অভাব হইয়াছিল।" পার্ব্বতীর উরুদ্বয় তুলনারহিত, ইহাও মহাকবি দেখাইতে ভুলেন নাই, —তিনি লিখিয়াছেন,—

"নাগেন্দ্রহস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাৎ
একান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষঃ।

লব্ধ্বাপি লোকে পরিণাহি রূপং
জাতাস্তদূর্ব্বোরুপমানবাহ্যাঃ ॥"

"লোকে করিকর ও রামরম্ভার সহিত উরুর সাম্য কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু কর্কশ ও অতি শীতল বলিয়া বিশালতাযুক্ত হইলেও উক্ত করিকর ও কদলীস্তম্ভ পর্ব্বতনন্দিনীর উরুদ্বয়ের সহিত উপমিত হইতে পারে না।" তৎপরে কুচবর্ণনে বলিয়াছেন,—

"অন্যোন্যমুৎপীড়য়দুৎপলাক্ষ্যাঃ
স্তনদ্বয়ং পাণ্ডু তথা প্রবৃদ্ধম্।
মধ্যে যথা শ্যামমুখস্য তস্য
মৃণালসূত্রান্তরমপ্যলভ্যম্ ॥"

"শৈলসুতার পাণ্ডুবর্ণ স্তনদ্বয় পরস্পর উপমর্দ্দন করিয়া সেই ভাবে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল, যাহার মধ্যে মৃণালজাত সূক্ষ্ম সূত্রও স্থান পাইত না।"

মুখবর্ণনে মহাকবি লিখিয়াছেন,—

"চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্ ন ভুঙ্‌ক্তে
পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাম্।
উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা
দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ ॥"

"চঞ্চলা কমলা যখন চন্দ্রে থাকেন, সে সময়ে সরোজের সৌগন্ধ্যে বঞ্চিতা হন, আবার কমলগতা হইলে সুধাংশুশোভায় বঞ্চিতা হন, সেই জন্যই চন্দ্র-পদ্মগুণযুক্ত, সহাস্য পদ্মগন্ধি পার্ব্বতীর বদন আশ্রয় করিয়া উভয়নিষ্ঠ প্রীতি প্রাপ্ত হন।"

তাঁহার মৃদু হসিত-বর্ণনা প্রস্তাবে কবি লিখিয়াছেন,—

"পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যাৎ
মুক্তাফলং বা স্ফুটবিদ্রুমস্থম্।
ততোঽনুকুর্য্যাদ্বিশদস্য তস্য
তাম্রৌষ্ঠপর্যাস্তরুচঃ স্মিতস্য ॥"

"যদি প্রবালের উপর পুষ্প বিন্যস্ত হয়, অথবা বিদ্রুমের উপর মুক্তা-ফল সংরক্ষিত হয়, তবেই তাঁহার কিসলয়লোহিত অধরে আবির্ভূত, বিশদ স্মিতের অনুকরণ সম্ভবে।"

পার্ব্বতীর কণ্ঠস্বরবর্ণনে কবি লিখিয়াছেন,—

"স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব
প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা
শ্রোতুর্ব্বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা ॥"

"গিরিসুতা যখন অমৃতনিস্যন্দিনী বাণী উচ্চারণ করেন, তৎকালে কোকিলকাকলীও ছিন্নতন্ত্রী বাদ্যমানা বীণার ন্যায় শ্রোতার কর্ণকুহরে কঠোর শব্দ করিয়া বিরক্তি উৎপাদন করে।"

তাঁহার নয়নদ্বয়-সুষমাবর্ণনে কবি কি নৈপুণ্যই দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"প্রবাতনীলোৎপলনির্ব্বিশেষং
অধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যঃ
ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ ॥"

"আয়তাক্ষী গিরিবালার চঞ্চলনীলোৎপলদলতুল্য বীক্ষণ কি হরিণী-গণের নিকট হইতে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা আয়তেক্ষণা মৃগাঙ্গনাগণ তাঁহার নিকট হইতে তাদৃশ চক্ষু গ্রহণ করিয়াছিল, এ বিষয়ে কিছুই নিশ্চয়তা নাই।" সংশয়েই অবসান, ইহা কি কবিজগতের বর্ণনা বিষয়ে কম চাতুর্য্য ? না ইহা রমণীর নয়নপদ্মের কম সৌন্দর্য্য ? অবশেষে কবি লিখিয়াছেন,—

"সাধারণো ভূষণভূষ্যভাবঃ"

পার্ব্বতীর অঙ্গনিহিত রত্নভূষণ কেবল তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার হইত না, পরন্তু অলঙ্কার তদঙ্গে বিন্যস্ত হইয়া স্বয়ং অলঙ্কৃত হইত। ইহা কি কম সৌন্দর্য্য! ইহা কি কবিত্বের চরম উৎকর্ষ নহে? কালিদাসের ন্যায় কবি ও পার্ব্বতীর ন্যায় জগন্মাতা নায়িকা হইলেই এইরূপ সৌন্দর্য্য ও তাহার এরূপ বর্ণন সম্ভবে।

কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে পার্ব্বতীর অঙ্গের মার্দ্দববর্ণনে কবি একটি-মাত্র বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন,—

"অঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বালকদম্বকল্পৈঃ"

পার্ব্বতী অভিনব কদম্বকুসুমসদৃশ কোমলাঙ্গী। আবার অধরোষ্ঠের সৌকুমার্য্য বর্ণন করিয়াছেন,—

"বিম্বফলাধরোষ্ঠে"

যাঁহার অধরোষ্ঠ বিম্বতুল্য। আর কত বলিব, কত দেখাইব? কালিদাসের যে কাব্য যখন দেখি, তখনই নায়িকার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়।

তাঁহার রঘুবংশের অষ্টম সর্গে অজবিলাপে ইন্দুমতীর শোকে অধীর হইয়া অজ বলিতেছেন,—

"কলমন্যভৃতাসু ভাষিতং
কলহংসীষু মদালসং গতম্।
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং
পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ॥"

"প্রিয়ে! তুমি আমার চিত্তবিনোদনের জন্য কোকিলাঙ্গনার কণ্ঠে তোমার স্বর-লহরী, কলহংসীতে মদালস গমন-বিভ্রম, হরিণাঙ্গনায় চঞ্চল বীক্ষণ, মারুতান্দোলিত বল্লরীতে অঙ্গবিক্ষেপ নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছ।"

আবার রামচন্দ্র যখন লঙ্কা হইতে তাঁহার প্রাণসমা জানকীকে লইয়া আসিতেছেন, আর পূর্ব্ব-অবস্থা বর্ণন করিতেছেন, তখন সীতার নয়নের সৌন্দর্য্য কি অনুত্তম চিত্র! বলিতেছেন,—

"আসারসিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাৎ
মামক্ষিণোদ্‌যত্র বিভিন্নকোশৈঃ।
বিড়ম্ব্যমানা নবকন্দলৈস্তে
বিবাহধূমারুণলোচনশ্রীঃ॥

"জানকি! নব-বারিধারাসম্পৃক্ত বসুধার বাষ্পসম্পর্কে উদ্ভিন্ন-মুকুল ভূমিকন্দলীসকল বিবাহকালীন হবির্ধূমের দ্বারা অরুণবর্ণ তোমার নয়ন-শোভা অনুকরণ করিয়া আমাকে বড়ই অভিভূত, ব্যথিত করিয়াছিল।" ইহা কি রমণী নয়নের উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য নহে? এরূপ

কত দেখাইব? যখন শকুন্তলা দেখি, তখন মনে হয়, এরূপ আর কোথাও নাই। নাটকের প্রথমাঙ্কে দুষ্যন্ত বলিতেছেন,—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীস্তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

"শৈবালদলযুক্ত পদ্মও মনোহর, শশাঙ্কের মলিন চিহ্নও শোভা বৃদ্ধি করে; তদ্রূপ এই ক্ষীণাঙ্গী বল্কলধারিণী হইলেও অধিক মনোহারিণী। মধুরাকৃতির সবই ভূষণ হয়।"

আবার বলিয়াছেন,—

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥"

"অনাঘ্রাত কুসুমতুল্য, অ-নখচ্ছিন্ন নবপল্লবতুল্য, অবিদ্ধ রত্নতুল্য, অনাস্বাদিতরস নূতন মধুতুল্য, অনুপভুক্ত পুণ্যফলের ন্যায় এই অনঘ রূপভোগের জন্য বিধি কাহাকে উপস্থিত করিবেন, জানি না।"

আর একটা পদ্যের দ্বারা শকুন্তলার অনুপম সৌন্দর্য্য কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, যথা,—

"চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।

স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্ব্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ ॥"

"বোধ হয়, বিধাতা আলেখ্য স্থাপনপূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া রূপ-সংযুক্ত মনঃ-সাহায্যে শকুন্তলাকে সৃজন করিয়াছেন। শকুন্তলা স্ত্রী-জগতে অলৌকিক সৃজন। ধাতার বিভুত্ব ও শকুন্তলার কমনীয় বপুঃ চিন্তা করিয়া এইরূপই কল্পনা করিতে হয়।"

এরূপ সৌন্দর্য্যবর্ণন প্রতি ছত্রে, প্রতি বর্ণে নয়নে নিপতিত হয়, কত দেখাইব? অমর কালিদাসের অমৃতস্যন্দিনী লেখনী হইতে যে অতুল মেঘদূতের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই কাব্যের অধীশ্বরী যক্ষীর রূপ-বর্ণনা—বর্ণনা নহে, একখানি চিত্রপট, সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিমূর্ত্তি, অথবা প্রতিমূর্ত্তি নহে,—যক্ষের মানস কল্পিতা দেবী!

যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন,—

"তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥"

ইহা কি বর্ণনা? না সম্মুখস্থ একখানি তৈলচিত্র?

আবার বিলাপ-প্রসঙ্গে বলিয়া পাঠাইতেছেন,—

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহারিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি! সাদৃশ্যমস্তি ॥"

"প্রিয়ে! তোমার প্রতিকৃতিদর্শনেচ্ছায় তোমার অঙ্গশোভা দেখিবার জন্ত শ্যামালতার কাছে যাই, চকিতনয়না মৃগাঙ্গনার নিকট তোমার চঞ্চললোচনকান্তি নিরীক্ষণ করি, চন্দ্রে তোমার সহাস্য আস্তশোভা দেখি, কলাপীর পুচ্ছে তোমার কুন্তলকান্তি, তরঙ্গিণীতরঙ্গে তোমার কটাক্ষ-বিলাস দেখিতে দেখিতে চিত্তরঞ্জন করি। কিন্তু কোপনে! তোমার উপমাসাম্য উল্লেখে ক্রোধ করিও না। তোমা সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ মূর্ত্তি জগতের একটা কোনও বস্তুতে দেখিতে পাই না; কচিৎ কোন বস্তুতে অর্থাৎ চন্দ্রপদ্মাদিতে বদনাদির শোভামাত্র দেখিতে পাই।" এরূপ সৌন্দর্য্য-বর্ণন আর কোথায় আছে?

তাঁহার বিক্রমোর্ব্বশীর রূপদর্শনে পুরুরবার বিতর্ক, নায়িকার অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে।

"অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ
শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ।
বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো
নির্ম্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ॥"

"এই নায়িকার সৃজনবিষয়ে কান্তিপ্রদ চন্দ্রদেব কি প্রজাপতি হইয়াছিলেন? অথবা শৃঙ্গাররসের নায়ক স্বয়ং কামদেব প্রজাপতি হইয়াছিলেন? অথবা বসন্ত ঋতু প্রজাপতি হইয়াছিলেন? তাহা না হইলে, উদাসীন, বেদাভ্যাসবিমূঢ়ধী প্রাচীন মুনি এরূপ মানসরঞ্জন মূর্ত্তি ও লাবণ্য কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে পারেন?" আর এক কথায় রমণীর যাহা কিছু বাহ্য আভ্যন্তর সৌন্দর্য্য, সবই প্রকাশিত হইয়াছে। পুরুরবা বিদূষককে বলিতেছেন,—

"আভরণস্যাপ্যাভরণং প্রসাধনবিধৌ প্রসাধনবিশেষঃ।
উপমানস্যাপি সখে! প্রত্যুপমানং বপুস্তস্যাঃ॥"

সখে! তাঁহার বপুঃ ভূষণেরও ভূষণ, প্রসাধন-ক্রিয়ারও প্রসাধন, উপমানেরও প্রত্যুপমান। ইহা কি বড় চিত্রকরের নৈপুণ্য নহে?

মহাকবির মালবিকাও রমণীকুলরাজ্ঞী—
প্রথম দর্শনে অগ্নিমিত্র বলিতেছেন—

"দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তিবদনং বাহূ নতাবংসয়োঃ
সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রমৃষ্টে ইব।
মধ্যঃ পাণিমিতোঽমিতঞ্চ জঘনং পাদাবরালাঙ্গুলী
ছন্দো নর্ত্তয়িতুর্যথৈব মনসঃ সৃষ্টং তথাস্যা বপুঃ॥"

মালবিকার আকৃতি, নৃত্যশিক্ষকের অভিপ্রায়ানুসারেই সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার বদন বিশাল নেত্রযুক্ত ও শরচ্চন্দ্রশোভাসম্পন্ন, ভুজদ্বয় অংসদেশে বিনত, বক্ষঃস্থল, ঘনস্তনদ্বয়বিশিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত, পার্শ্বদ্বয় প্রমৃষ্ট, মধ্যপ্রদেশ মুষ্টিগ্রাহ্য, নিতম্ব বিপুল, চরণ অবক্র অঙ্গুলিদ্বারা শোভিত অর্থাৎ যাহা হইলে নর্ত্তকীর নৃত্য-কলা সজ্জনবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, সে সবই ইহাতে আছে। তাঁহার পুষ্পবাণ-বিলাসের একটি শ্লোকের দ্বারাই নায়িকার অসীম রূপরাশি ব্যক্ত করিয়াছেন, বেশী প্রয়োজন নাই; লিখিয়াছেন—

"কর্ণারুন্তুদমেব কোকিলরুতং তস্যাঃ শ্রুতে ভাষিতে
চন্দ্রে লোকরুচিস্তদাননরুচেঃ প্রাগেব সন্দর্শনাৎ।
চক্ষুর্ম্মীলনমেব তন্নয়নয়োরগ্রে মৃগীণাং বরং
হৈমী বল্ল্যপি তাবদেব ললিতা যাবন্ন সা লক্ষ্যতে॥"

তাহার স্বরলহরী কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে কোকিলকূজন কর্ণকঠোর বলিয়া বোধ হয়। তাহার বদন সৌন্দর্য্য দেখিবার পূর্ব্বেই সুধাংশুর কমনীয় কান্তি রুচিকর। তাহার নয়নসমক্ষে মৃগাঙ্গনার নয়ননিমীলনই মঙ্গলকর। যতক্ষণ তাহার চম্পকবর্ণ বপুঃ চিত্তহরণ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্ণবল্লী শোভাশালিনী! আর একটি দেখাইয়া কালিদাসের সৌন্দর্য্য-বর্ণন শেষ করিব।—তিনি শৃঙ্গারতিলকের একটি শ্লোকে রমণীর সৌন্দর্য্য কেবল কুসুমসুকুমার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই—

"ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় বেধাঃ
কান্তে! কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥"

হে কান্তে! সেই শিল্পী বিধাতা নীলপদ্মের দ্বারা তোমার নয়ন, সরোজের দ্বারা তোমার বদন, কুন্দকোরক তোমার দন্ত, নূতন কিসলয়ে তোমার ওষ্ঠাধর, চম্পকগুচ্ছের দ্বারা তোমার অঙ্গ গঠন করিয়া কেবল তোমার চিত্ত কঠিন পাষাণ দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন! এ কি আশ্চর্য্য!

এরূপ কবিতা কালিদাসের সকল গ্রন্থেই প্রতি পত্রে বিরাজমান।

আমাদের প্রিয়, ভাবুক কবি ভবভূতি সীতার রূপ যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহার লেখনীরই আয়ত্ত। এক স্থলে রাম বলিতেছেন—

"ত্রস্তৈকহায়নকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টেঃ"

কুরঙ্গ অর্থাৎ মৃগের নয়ন স্বাভাবিক চঞ্চল, কিন্তু সীতার নয়ন চকিত, একবর্ষ বয়ঃক্রম মুগ্ধ মৃগাঙ্গনা সদৃশ। ইহা কি কম সৌন্দর্য্য-বিকাশ! ইহা কি কম বাহাদুরী! এই রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, এক্ষণে তাহা নিষ্প্রয়োজন। সীতার মুখের সৌন্দর্য্য একটি শ্লোকে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কেবল স্বসংবেদ্য, অর্থাৎ ভাবুক পাঠকই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। তাঁহার উত্তর-চরিতের ষষ্ঠ অঙ্কে রাম-বিলাপ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"শ্রমাম্বুশিশিরীভবৎপ্রসৃতমন্দমন্দাকিনী
মরুত্তরলিতালকাকুলললাটচন্দ্রদ্যুতি।
অকুঙ্কুমকলঙ্কিতোজ্জ্বলকপোলমুৎপ্রেক্ষ্যতে
নিরাভরণসুন্দরশ্রবণপাশসৌম্যং মুখম্॥"

আমার প্রিয়া জানকীর শ্রমজনিত ঘর্ম্মজলকে শীতল করিয়া, মৃদুভাবে প্রসৃত মন্দাকিনীর পুণ্য পবনাকুলিত অলকদাম প্রিয়ার ললাট-চন্দ্র-শোভাকে কলঙ্কিত করিত এবং যে মুখ কপোল-কুঙ্কুমের দ্বারা কখনও কলঙ্কিত হয় নাই, তথাপি উজ্জ্বল আভরণরহিত হইলেও স্বভাবমুগ্ধ শ্রবন-পাশ মনোহর, সেই চিরপরিচিত মুখকান্তি, কত কষ্টে কল্পনা করিয়া চিত্তবিনোদন করিতেছি। আমার ন্যায় পাতকী, নির্ম্মম, স্ত্রীঘাতী ইহজগতে কে আছে?

এরূপ নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্য্য-বর্ণন ভবভূতি ভিন্ন কেহ করিতে সমর্থ নহে। এ বর্ণনে কিছু আহার্য্য বা আরোপ-শোভা নাই, আড়ম্বর নাই, রঞ্জন-দ্রব্য নাই; শুধু মসীময়ী লেখনী; যেন শিশুর স্বাভাবিক অব্যাহত সৌন্দর্য্য। এরূপ শিল্পে ভবভূতির নৈপুণ্য বিজাতীয়।

রত্নাবলী নাটিকায় রত্নাবলীর রূপবর্ণনও অসাধারণ, অনুপম। মালতী-মাধবেও সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ। শূদ্রক কবি মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনাকে "অপদ্মা শ্রীরেষা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন কাব্যের মধ্যে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের ভামিনী-বিলাসে, স্বীয় নায়িকার সৌন্দর্য্য যেরূপ অঙ্কন করিয়াছেন, বোধ হয়, তৎসদৃশ কবি জগতে দুর্লভ। তিনি নিজ প্রিয়ার বিয়োগবিধুর হইয়া বিলাপ করিতেছেন ;—

"যা তাবকীনমধুরস্মিতকান্তিকান্তে
ভূমণ্ডলে বিফলতাং কবিষু ব্যতানীৎ।
সা সাম্প্রতন্তু বিলয়ং ত্বয়ি যাতবত্যাং
রাকাধুনা বহতি বৈভবমিন্দিরায়াঃ ॥"

হে প্রিয়ে! যে পূর্ণশশী ত্বদীয় মধুরস্মিত-বিরাজিত মর্ত্ত্যলোকে কবিগণের কোন উপযোগী হইত না, সেই পরিপূর্ণ শশধর এক্ষণে তোমার বিনাশে কবিগণের শোভার সমৃদ্ধি বহন করিতেছে। তৎকৃত কাব্যের চতুর্থ স্তবকে এরূপ সুষমা-বর্ণনা বহুতর আছে।

শ্রীহর্ষকৃত মহাকাব্য নৈষধে দময়ন্তীর রূপবর্ণন সপ্তম সর্গের শতাধিক শ্লোকে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে দুইটি শ্লোকের কিয়দংশের দ্বারা সৌন্দর্য্য-বিকাশ কতদূর হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছি ; তিনি লিখিয়াছেন ;—

"ভ্রূশ্চিত্রলেখা চ তিলোত্তমা স্যাৎ
নাসা চ রম্ভা চ তদূরুসৃষ্টিঃ।

দৃষ্টা ততঃ পূরয়তীয়মেকা-
নেকাপ্সরঃপ্রেক্ষণকৌতুকানি ॥"

অর্থাৎ দময়ন্তীর ভ্রূ চিত্রলেখাযুক্ত বলিয়া "চিত্রলেখা"; নাসিকা উত্তম তিলযুক্ত বলিয়া "তিলোত্তমা"; উরুদেশ রম্ভার ন্যায় বলিয়া রম্ভা। সুতরাং ইহাকে দেখিলেই অনেক সুরাঙ্গনা-দর্শন-ফল-লাভ হয়। তাহার পরে আছে,—"অস্যাং মুনীনামপি মোহমূহে" অর্থাৎ দময়ন্তী মুনিগণেরও মতিভ্রমকারিণী।

এইরূপ মাঘের শিশুপালে, অমরুশতকে, বিহ্লনের চোরপঞ্চাশতেও অপরূপ রূপ বর্ণিত আছে। আমরা যে সংস্কৃত কাব্য দেখি, তাহাই রমণীসৌন্দর্য্যে পূর্ণ। আবার বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া দেখিলে সৌন্দর্য্যের আভায় চক্ষুঃ ঝলসিয়া যায়, মনে হয়, তাহা আরও তীব্রজ্যোতিঃ, মার্জ্জিত। আমাদের বৈষ্ণব কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, নরোত্তমদাস, বলদেব, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সকলেই শক্তি-স্বরূপিণী, প্রেমাহ্লাদিনী রাধার দিব্যকান্তি বর্ণনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। জয়দেবও—

"বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ"

এই অধর বাঁধুলি-কুসুম সদৃশ অরুণবর্ণ। ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা সৌন্দর্য্য ও স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি—

"অপরূপ পেখলু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল;
হরিণীহীন হিমধামা ॥"

আবার—"কবরীভয়ে চামরী গিরিকন্দরে
মুখভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়নভয়ে স্বরভয়ে কোকিল
গতিভয়ে গজ বনবাসে॥"

ইত্যাদি পদাংশের দ্বারা শ্রীরাধার অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গভাষার প্রাচীনতর কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপবর্ণন বঙ্গভাষার অক্ষয় কীর্ত্তি। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, কিরূপ তাঁহার নৈপুণ্য।

"কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা॥
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন-হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
জিনিয়া হরিদ্রা, চাঁপা, সোনার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তার দরশন॥" *

একটা প্রাচীন প্রবচন আছে,—

"কবিশ্রীর্মাথুরীণাং জনকজনপদস্থায়িনীনাং কটাক্ষে
দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং স্তনলিহজঘনে চোৎকলপ্রেয়সীনাম্।

* সেইরূপ কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি ভারতীয় বঙ্গকবি সরল ভাষার সাহায্যে রমণীর অনুপম অঙ্গ-সৌন্দর্য্য দেখাইয়া জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তিপতাকা প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন।

তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজলঘনরুচৌ কেরলীকেশপাশে
কার্ণাটীনাং কটৌ চ স্ফুরতি রতিপতির্গুর্জ্জরীণাং স্তনেষু ॥"

মথুরাবাসিনীর বচনে সৌন্দর্য্য, মৈথিলীগণের কটাক্ষে সৌন্দর্য্য, গৌড়মহিলাবর্গের দন্তে সৌন্দর্য্য, উৎকল নারীগণের জঘনে সৌন্দর্য্য, তৈলঙ্গীগণের নিতম্বে সৌন্দর্য্য, কেরল-মহিলাগণের মেঘকৃষ্ণ কুন্তলে সৌন্দর্য্য, কর্ণাটনারীগণের কটিদেশে সৌন্দর্য্য, গুর্জ্জরীগণের স্তনের সৌন্দর্য্য অদ্বিতীয়।

যাহা হউক, এই যাহা দেখাইলাম, ইহা ত বাহ্য সৌন্দর্য্য। ইহার দ্বারা জগতের কি এমন উপকার হইতে পারে? সুষমামণ্ডিত বদন, আয়ত নেত্র, সুবর্ণবরণ, বিপুল নিতম্ব, আগুল্ফলম্বিত কেশপাশ প্রভৃতি কেবলমাত্র মানবের—দর্শকমাত্রেরই চিত্তহরণ করিতে পারে। কিন্তু সে ত কেবল জগতের হানি। সেই রূপদর্শনে তুমি না হয় ক্ষণ-কালের জন্য শোক-তাপ ভুলিয়া তন্ময় হইয়া শান্তিলাভ করিলে, তাহাতে এই বিশ্ববাসীর কি উপকার সাধিত হইল? তাহাদের যে দুঃখ আজন্মসিদ্ধ, তাহা তোমার আমার সুখে কি কোটি মানবের—সমগ্র জাতির সুখ জন্মে? তাহা যদি হয়, তবে পরসুখে তুমি সুখী হও না কেন? আর এক হিসাবে রূপে দুঃখ নিবারণ না হইয়া দুঃখই জন্মে। লালসা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর অশান্তির করাল ছায়া হৃদয়ে নিপতিত হইয়া প্রণয়ীর চিত্তকে বিচলিত করে। সুতরাং ঐ রূপই অশান্তির আশ্রয়; কারণ, বেশী কি, উহাই জনমনোমোহকারী। ঐ সকল প্রাচীন কাব্যে যে সকল রমণীর চরিত্রগত সৌন্দর্য্য আছে, তাহাই যথার্থ সৌন্দর্য্য; তাহাই মানবের মনের অন্ধকার বিদূরিত

করিয়া চিত্তকে উজ্জ্বল করে, প্রাণের ভিতর নব-প্রাণের সঞ্চার করিয়া সঞ্জীবিত করে ; মর্ত্ত্যে স্বর্গীয় সুষমা আনয়ন করিয়া যাবতীয় মানবের সুখ সমাধানের একমাত্র সম্বল হয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, দ্রৌপদী প্রভৃতি চিরস্মরণীয়া পূতচরিতা রমণীগণের স্বার্থত্যাগ জগতে সমগ্র জাতির প্রাণে চিরশান্তি সংস্থাপন করিয়া স্বীয় মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে রমণী জগতে বরেণ্যা— মহীয়সী। যখন রঘুবংশের চতুর্দ্দশ সর্গে বননির্ব্বাসিতা সীতার সোচ্ছ্বাস বচন শ্রবণ করি,—

"ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ ॥"

আমি এই ভাবে সূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টি হইয়া এই ভাবে তপস্যা করিব যে, পুনর্জ্জন্মে তুমিই আমার স্বামী, আরাধ্য দেবতা হইও, আর যেন এরূপ বিপ্রয়োগ না হয়।

আবার বলিয়াছেন—

"নির্ব্বাসিতাপ্যেবমতস্ত্বয়াহং
তপস্বিসামান্যমবেক্ষণীয়া ॥"

আপনি রাজা, সুতরাং আমি নির্ব্বাসিতা হইলেও সাধারণ তপস্বীর ন্যায় আমাকে একবার অনুগ্রহ-চক্ষে দেখিবেন।

এরূপ চরিত্র রমণী-জগতে দুর্ল্লভ। পতির তাদৃশ হৃদয়বিদারক মর্ম্মন্তুদ ব্যবহারে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন না হইয়া স্বীয় দৌর্ভাগ্য আলোচনা পূর্ব্বক এরূপ বিজ্ঞাপন কোন্ রমণীর স্বার্থত্যাগ, অলৌকিক সৌন্দর্য্য প্রকটিত না করে ?

পার্ব্বতীর তপশ্চর্য্যা ও::তাঁহার অধ্যবসায় চিত্রকর কালিদাসকে অতুল করিয়া গিয়াছে। কুমারের পঞ্চমে আছে—

"নিনায়সাত্যন্তহিমোৎকিরানিলাঃ
সহাস্য রাত্রীরুদবাস তৎপরা।
পরস্পরাক্রন্দিনিচক্রবাকয়োঃ
পুরো বিযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী॥"

গিরিসুতা সেই তুহিনকণবাহী বায়ুযুক্ত পৌষরজনী, তুষার শীতল জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া যাপন করিতেন। সে সময় পরস্পর বিযুক্ত চক্রবাক-মিথুন বিলাপ করিলে তাঁহার করুণার্দ্র চিত্ত বিগলিত হইত, তপোনিমগ্না হইলেও তিনি বিচলিতা হইতেন।

এরূপ মহত্ত্ব, স্বার্থবিসর্জ্জন, পরের জন্য নিজ মুণ্ড বলি আমাদের ভারতীয়-সাহিত্য ছাড়া আর কোথায় দেখিতে পাই? ইহাই তো রমণীজাতির মহিমার উচ্চগীতি, গৌরব পতাকা; অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ। আর কত দেখাইব?

উপসংহারে বক্তব্য, আমাদের রমণীজাতি যে দিন এই সকল উচ্চ নিদর্শন সম্মুখে রাখিয়া স্বীয় হৃদয়-দর্পণে ঐ সকল প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন, সেই দিনই আমাদের চিরদুঃখান্ধকার বিদূরিত হইয়া উজ্জ্বল-সুখ-প্রভায় হৃদয়-কন্দর আলোকিত—উৎফুল্ল হইবে। বাহ্য চাকচিক্য-ময় সুষমা-মণ্ডিত হইয়া হৃদয়ে হলাহল ধারণ করিলে কি জগতের দুঃখ দূর হয়? বাহ্য সৌন্দর্য্য থাক বা না থাক্, যে রমণীর মন, হৃদয় পরদুঃখে কাতর, বিশ্বহিতে উৎসুক, সর্ব্বদা তিনিই চিরসুষমাময়ী দেবী। তিনিই আত্মপরনির্ব্বিশেষে জাগতিক প্রাণিমাত্রেরই সুখের

কারণ হইয়া, মহীমণ্ডল অনন্ত কীর্ত্তিমালায় শোভিত করিয়া স্বীয় মূর্ত্তি প্রতি হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া যান। তিনিই জগতে মহীয়সী, রমণী-কুলরাজ্ঞী, স্বর্গের দেবী। শুধু চর্ম্ম-সৌন্দর্য্যে জগতের অভ্যুদয় হয় না। গুণ চাই, হৃদয় চাই, স্বার্থত্যাগ চাই; তাহাই রমণীজাতির সৌন্দর্য্য সেই সৌন্দর্য্যই রমণীকে রমণীয় করিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

লেখক—শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

সেই মুখখানি

সেই মুখখানি—কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি। মনে বুক ফাটিয়া যায়, মাথা ঘুরে, চক্ষু-কর্ণ দিয়া তাড়িত-প্রবাহ বাহির হয়, শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে তাড়িত-প্রবাহ ছুটিতে থাকে—তবে, কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি। অপ্সরা-কণ্ঠগীতিবৎ, দূরাগত বীণাশব্দবৎ, নদীহৃদয়ে অস্ফুটচন্দ্রালোকে বিরহ-সংগীতবৎ, সদ্যপ্রস্ফুটিতকুসুমপরিমলবাহী নিদাঘসায়াহ্নসমীরণবৎ;—ভাষায় তেমন কথা নাই, মনুষ্যের তেমন চিন্তা-শক্তি নাই, আমার এ স্বপ্নময়ী কল্পনায় তেমন কবিত্ব নাই, শ্রোতার তেমন সহৃদয়তা নাই, জগতে তাহার উপমাস্থল নাই—তেমন সুখশান্তিসৌন্দর্য্যপবিত্রতাপরিপূর্ণ কিছু দেখিতে পাই না—হরি! হরি! কেমন করিয়া বুঝাইব, কেমন সেই মুখখানি। সেই মুখখানি—আর একবার দেখিতে পাই না?

আর কিছু নয়, কেবল দেখা—একবার চক্ষের দেখা দেখিব মাত্র, আর দেখিতে দেখিতে একবার কাঁদিব—ইহার মূল্য কত? যাহা লাগে তাহাই দিব। একবার দেখা—জন্মের শোধ একবার দেখা, আর একবার কাঁদা; কাহারও ক্ষতি নাই, কাহারও অনিষ্ট নাই, কেহ কোন সুখে বঞ্চিত হবে না, কেহ মনে ব্যথা পাবে না, কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না—তবে, আর একবার দেখিতে পাই না?

ভাল জিনিষের মূল্য অধিক, তাহা জানি। গরজ বুঝিয়া দাম হয়, তাহা জানি। এ বিশ্বকার্য্যের যদি কেহ কর্ত্তা থাকে, তবে জিজ্ঞাসা করি, কি চাও?—সেই মুখ আর একবার দেখাইবার জন্য, কি চাও? জীবন লও, অথবা তাহার অপেক্ষা যাহা ক্লেশকর—জীবন লইও না। জীবন লইও না, জীবনের সর্ব্বস্ব লও। আমার জীবনের সর্ব্বস্ব লইবে? শাপেই বর। লও না—আশীর্ব্বাদ করিব—ধন্যবাদ দিব। আমার জীবনের সর্ব্বস্ব কি? মর্ম্মান্তক যাতনা, স্মৃতির বৃশ্চিকদংশন সকল কার্য্যের ঔদাসীন্য, সকল বিষয়ে তাচ্ছিল্য, ঈশ্বরে অবিশ্বাস—ইহাই আমার সর্ব্বস্ব—ইহা লইবে? এ কি সুখের জীবন? ঈশ্বরে অবিশ্বাস,—সে কি সুখের জীবন? তোমরা আশা ভরসা রাখ,—আমার আশা নাই। তোমরা, স্বর্গে হোক, নরকে হোক, এক স্থানে থাকিবে, আমি একেবারে চিরদিনের মতন বিলুপ্ত হইব। তোমরা হয় ত বৈকুণ্ঠবাসী হইবে, আমি মাটী হইব। তোমরা, এ সংসারে যাহা হারাইয়াছ, তাহা হয় ত আবার ফিরিয়া পাইবে, আমার যাহা গিয়াছে, তাহা চিরদিনের শোধ গিয়াছে। তোমরা সুখী হও, দুঃখী হও, জগৎ-ব্যাপারের মধ্যে এক এক জন, আমি আগন্তুক

মাত্র—আজ আসিয়াছি, কাল চলিয়া যাইব। তোমরা অনন্তকালের সাক্ষী, আমি জলবুদ্‌বুদ্‌ মাত্র—এই উঠিয়াছি, এই মিলাইব। এক ধন ছিল, তাহা কেবল দিতে পারিতাম না। স্বর্গের জন্য তাহা দিতে পারিতাম না, নির্ব্বাণ-মুক্তির জন্য তাহা দিতে পারিতাম না, স্মৃতি-লোপের জন্য তাহা দিতে পারিতাম না, মনের কথা প্রকাশ করিবার ক্ষমতার বিনিময়ে তাহা দিতে পারিতাম না, ইচ্ছামৃত্যুর পরিবর্ত্তে তাহা দিতে পারিতাম না—সে বিনিময়ের ধন নয়, সে বিলাইবার সামগ্রী নয়—তাহা হইলে, দিতাম। তাহা ছিল—এখন নাই—কি জানি কোথায় গিয়াছে। হৃদয়পিঞ্জরে একটি পাখী পুষিয়া ছিলাম—কত যত্ন করিতাম, কত ভালবাসিতাম, কত মধুর বুলি বলিত, সেই সর্ব্বার্থসার পাখীটী, অকস্মাৎ এক দিন, থাকিতে থাকিতে,শিকল কাটিয়া, কোথায় উড়িয়া গেল। তাহার জন্য সংসার খুঁজিয়া দেখিয়াছি—কোথাও মিলে না। যে দিকে তাকাই, তাহার অভাব মাত্র দেখিতে পাই। তাহার সন্ধানে কত ধর্ম্মপুস্তক,কত দর্শনবিজ্ঞান খুঁজিলাম—কেহ তাহার সন্ধান বলিতে পারে না। কত ভালবাসিতাম, কত আদর করিতাম—মিথ্যা কথা! ভালবাসিতাম—এখন ভালবাসি—যত দিন থাকিব, তত দিন বাসিব—কিন্তু যত্ন আদর কখন করিতে পারি নাই। চিরকাল বলিব বলিব মনে করিয়া, মনের কথা কখন ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। আমি তাহাকে দেববালা বলিয়া জানিতাম, কখনও ভাল করিয়া আদর করিতে পারি নাই—না জানি কি মনে করিবে, এই ভয়ে ভাল করিয়া সোহাগ করা হইল না। বুকে রাখিলে পাছে ব্যথা পায়, এই ভয়ে, সেই বিরহিণীর বিরহশ্বাস-নির্ম্মিত দেহখানি, সেই শরতের জ্যোৎস্নারচিত

দেহখানি কখন বুকে করিতে সাহস পাই নাই। যখনই চাহিয়া দেখিয়াছি, তখনই বোধ হইয়াছে, সে মুখখানি যেন এ জগতের নয়—যেখানে শোকতাপদুঃখ আছে, যেখানে স্বার্থপরতা আছে, অপবিত্রতা আছে, পাপ আছে, ও মুখখানি যেন সেখানকার নয়—যেন অন্ত লোক হইতে কোন নষ্টধনের অন্বেষণ করিতে করিতে পথ ভুলিয়া এ পাপতাপপূর্ণ সংসারে আসিয়া পড়িয়াছে। তাই কখন আদর করা হইল না—মনের সাধ মনে রহিল, কখন আদর করা হইল না—মনে বড় খেদ রহিল, যে আদরের ধন,তাহাকে আদর করিতে পারিলাম না। আমার জীবনাবলম্বন, আমার জীবন-মরুভূমের একমাত্র সরসী, আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র শুকতারা, আমার সর্ব্বস্বধন কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় গেল? কি হইল? মানুষ মরিয়া কি হয়? মাটী? সেই মুখ, সেই জগতে তেমন-কিছুই-নাই মুখ—হরি! হরি! কোন্ বিধাতা গড়িয়াছিল? সেই মুখ, জগৎসৌন্দর্য্যের প্রতিমাস্বরূপ সেই মুখ মাটী হইবে? তাহাতেই বলি এ জগতে সুনিয়ম নাই, নিয়ন্তা নাই, বিধান নাই, ভাল মন্দের বিচার নাই, পবিত্রাপবিত্রতার তারতম্য নাই,দয়ামায়া নাই, স্নেহমমতা নাই—কেবল নিষ্ঠুরতা—কেবল নৃশংসতা—কেবল পরদুঃখপ্রিয়তা, কেবল পরসুখকাতরতা। কিন্তু কি বলিতেছিলাম, বলিতে বলিতে ভুলিয়া গেলাম—

সেই মুখখানি। বুকে আসিয়া বুক চাপিয়া ধরে, হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়ের মুখে কাপড় দিয়া ধরে, মর্ম্ম কথা বলিতে দেয় না—কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি। বিদ্যাপতির কবিতার ন্যায়, প্রণয়ের প্রথমোচ্ছ্বাসের ন্যায়, সমাধিগত প্রণয়ের স্মৃতির ন্যায়,

নিভৃতকুঞ্জে সায়াহ্ন সমীরণের নিশ্বাসের ন্যায়, বাল্যকালের সুখ-স্মৃতির ন্যায়, অকস্মাদুদ্ভূত বহুদিনবিস্মৃত সুখস্বপ্নের ন্যায়, মৃদুনিনাদিনী ক্ষুদ্রবীচিমালিনী জাহ্নবীর বিশাল বক্ষে পৌর্ণমাসী রজনীতে মৃদু-পবন-বিকম্পিত শারদ-জ্যোৎস্নার ন্যায়, আমার ভূতপূর্ব্বের ন্যায়, সেই মুখখানি। সেই মুখে, প্রেমভিক্ষাপরিপূর্ণ সেই হাস্যময় দৃষ্টি, সেই ভীত অথচ পীযূষনিষ্যন্দিনী' দৃষ্টি, যে দৃষ্টি, পলকে পলকে বলিত আমি এ সংসার ভাল করিয়া চিনি না, তোমা বই আর কাহাকেও চিনি না—আমি এ জগতের নই, আমাকে পায়ে ঠেলিও না; আর সেই হাসি—সেই হাসিমাখা হাসি– হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ সেই হাসি—সেই ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু, তাহাতে সেই অতলস্পর্শ প্রেম—আ মরি মরি!

* * * * *

সেই মুখখানি! আমার বুকভরা ধন, বুক খালি করিয়া কে লইল রে! সংসারে এমন কি আছে যে,তাহাই দিয়া, এ শূন্যহৃদয় পূর্ণ করিব। সে শূন্য হৃদয়ে অখিল সংসার পুরিয়া দেখিয়াছি, সমগ্র মানবজাতিকে স্থান দিয়া দেখিয়াছি, যেন অনেক স্থান খালি পড়িয়া থাকে—আমার তবু যেন বোধ হয়, কি যেন নাই। জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য চক্ষের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি যেন নাই। সেই ঘর বাড়ী, সেই বাল্যকালের ক্রীড়াভূমি, সেই বাল্যকালের বন্ধুগণ; লীলাময়ী জাহ্নবী তেমনই হেলিয়া দুলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া চলিতেছে—সৌন্দর্য্যা-ভিমানিনী কামিনীর ন্যায় মাটীতে পা পড়িতেছে না; আকাশে চাঁদ তেমনই হাসিয়া হাসিয়া পৃথিবীময় সোহাগ ঢালিতেছে; তাহার তলে অতি ক্ষুদ্রপাখী তেমনই উড়িতেছে; বৌ-কথা-কও তেমনি আকাশভরা

কণ্ঠমধু ছড়াইতেছে—সেই সব, কিন্তু আমি আর সেই নই—আমার তবু যেন বোধ হয়, কি যেন নাই! দুই চক্ষে যাহা দেখি, তাহাতেই যেন বোধ হয়, কি যেন নাই। যে দিকে তাকাই, দেখি, কি যেন নাই। অন্তরে চাহিয়া দেখি, কি যেন নাই। কার্য্যে সে উৎসাহ নাই সংসারধর্ম্মে সে অনুরাগ নাই, ধর্ম্মে সে বন্ধন নাই, মনে সে স্থিতি স্থাপকতা নাই, সৌন্দর্য্যে সে রমণীয়তা নাই, গন্ধে সে মধুরতা নাই, সংগীতে সে মুগ্ধকারিতা নাই, জগতে সে বৈচিত্র্য নাই, মনুষ্যমুখে সে দেবভাব নাই; আর অন্তরে, কি জানি কি যেন নাই। কি নাই? আমার কি নাই?

সেই মুখখানি! এখন নাই—একদিন ছিল, এখন নাই। সেই প্রেমে মাখা মুখখানি, সেই রমণীয়তা, কমনীয়তা, মধুরতা, পবিত্রতাময় মুখখানি, সেই অমরাবতী সৌন্দর্য্যময় স্বর্গীয় মুখখানি, সেই কি-জানি-কেমন মুখখানি—যাহার সঙ্গে সঙ্গে সব ফুরায়, সে মুখখানি কোথায় গেল? কে হরিল? এ বিধানের কি বিধাতা নাই? এ নিয়মের কি নিয়ন্তা নাই? যদি থাকে ত সে অনন্ত শক্তিমান্ বটে, কিন্তু বড় নিষ্ঠুর, বড় পাষাণহৃদয়, বড় কঠিন প্রাণ। এ জড়জগৎশরীরে আত্মা আছে কি না, চিন্তাশক্তি আছে কি না, তাহা জানি না, কিন্তু আমার দৃঢ় প্রতীতি, আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আমি ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই। নাই কেন বলি, শুনিবে? জগৎ কারণকে নিষ্ঠুর কেন বলি, শুনিবে?

জগৎ সংসারে যে এমন কিছু আছে, এমন কিছু থাকিতে পারে, তাহা ত আমি জানিতাম না। কে জানাইবার জন্য বিধাতাকে মাথার



হস্তিনী

দিবা দিয়াছিল—কে জানিতে চাহিয়াছিল? তবে, কেন জানাইলে? আমি যাহা চিনিতাম না, তাহা আমাকে কেন চিনাইলে? চিনাইলে ত রাখিতে দিলে না কেন? তুমিই দিলে, আবার তুমিই লইলে কেন? কাড়িয়া লইবে মনে ছিল ত দিলে কেন? দিলে ত আবার লইলে কেন? লইলে ত ভুলিতে দাও না কেন? যাহা কখন পাইব না, তাহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু যাবে, এই কি তোমার ইচ্ছা? সে গিয়াছে, তার ভালবাসা গিয়াছে—আমার ভালবাসা যায় না কেন? চিরদিনের মত যাহাকে চক্ষের বাহির করিলে, তাহাকে অন্তরের বাহির কর না কেন? আমি ভুলিব ভুলিব মনে করি, ভুলিতে পারি না। সংসারের নিয়ম? সংসারের নিয়ম আবার কি আকাশ না পাতাল? তোমার ইচ্ছা বৈ ত নয়। মনে করিলেই সব করিতে পার; তবে সংসারে—শুধু আমি বলিয়া নয়, এ জগৎ-সংসারে এত দুঃখ কেন—কুসুমে কীট কেন—চন্দ্রে কলঙ্ক কেন—পুণ্য কর্কশমূর্ত্তি কেন—নরকের পথ কুসুমাস্তৃত কেন—সৌন্দর্য্য বিকৃত হয় কেন—মনুষ্যহৃদয়ে নৈরাশ্য কেন—মনুষ্য ললাটে রোগ-শোক কেন—প্রণয়ে বিরহ কেন—আশায় অবিশ্বাস কেন—মনুষ্য স্বার্থপর কেন—পরের দুঃখ-পর বুঝে না কেন—দুঃখপ্রকাশের ভাষা নাই কেন—যাহা বুকের ভিতর হু হু করে, তাহা মুখে ফুটিতে পারি না কেন—স্নেহ আশঙ্কা-পরায়ণ কেন—যে যাকে চায়, সে তাকে পায় না কেন—যে যাকে ভাল-বাসে, সে তাহাকে হারায় কেন? হারায় যদি, তবে যে দিন হারায়, সেই দিন মরে না কেন? এ জড়জগৎ কেন? মাটীর দেহের ভিতর এ সুখদুঃখ-সমাকুল, এ স্নেহবাৎসল্যপরায়ণ, এ শান্তিসৌন্দর্য্যপবিত্রতাপ্রিয় হৃদয়

কেন? সেই হৃদয়, যাহা কথন পাইবে না, তাহার জন্য কাঁদে কেন? তাহাতেই বলি, যদি কেহ বিধাতা থাকে ত সে বড় নিষ্ঠুর। সে শুভকামনা করে না, জীবের ভাল দেখিতে পারে না; সে পরের দুঃখ বুঝে না, সে কাহারও মুখ তাকায় না, সে পায়ে ধরিয়া কাঁদিলে শুনে না—সে বড় নির্দ্দয়। সে জোর করিয়া খেলিতে বসাইয়া, আমোদ দেখিবার জন্য, কিস্তির মুখে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়—মাত্ স্বীকার করিলে নিরস্ত হয় না—খেলিব না বলিলে ছাড়ে না। সে, কি জানি কেমন করিয়া পাকা ঘুঁটি কাঁচাইয়া দেয়। সে, কি জানি কেন, সাত তুরুপে খেলায়। রঙের একখানি সাতা মাত্র লইয়া খেলা হয় না—গত সুখের স্মৃতিমাত্র লইয়া আর সংসার-খেলা খেলিতে পারি না। দুঃখের দিনে, সকল সুখ গত হইলে, গত সুখের কথা মনে পড়া বিড়ম্বনামাত্র। তাহাতেই বলি, এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই! তুমি ইচ্ছাময়—ইচ্ছা করিলেই সুখের সংসার সৃজিতে পারিতে—তাহা কর নাই, তাহাতেই বলি, এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই! সংসারে কি সুখ নাই? তাহা কে বলিতেছে? সুখ আছে বলিয়াই ত বলি, এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই। সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় হইলে, তাহাতে কাহার আপত্তি ছিল? তাহা হয় নাই, না হইয়া সুখদুঃখময় সংসার হইয়াছে বলিয়াই ত বলি, এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই। এ সংসার অশ্রুজল দিয়া না গঠিয়া, হাসি দিয়া না গঠিয়া যে, হাসি কান্নায় রচিয়াছে, তাহার জন্যই ত বলি, এ জগৎশরীরে হৃদয় নাই। কিন্তু কেমন ভোলা মন, আবার ভুলিয়া গেলাম, কি বলিতেছিলাম—

সৌন্দর্য্য

সেই মুখখানি ! সন্ধ্যাসমীরণ-হিল্লোলে বাসন্তী লতার দোলানির স্থায় সেই মুখখানি—অপরিস্ফুটবাক্, সংসার-শিক্ষা-শূন্য নিদ্রিত শিশুর পবিত্র অধরে সুখস্বপ্নজাত হাসির খেলার স্থায় সেই মুখখানি—সেই কি-জানি-কি-ময় মুখখানি—সেই বলিব-বলিব-মনে-করি-বলিতে-পারি-না মুখখানি—সেই এই-আছে-এই-নাই, পলকে-পাই-পলকে-হারাই মুখখানি—সেই থাকিয়া-থাকিয়া জাগিয়া-উঠে মুখখানি—সেই হৃদয়ে-আসে-মনে-আসে-না মুখখানি—সেই ধরি-ধরি-ধরিতে-পারি-না মুখখানি—হরি ! হরি ! কোন্ বিধাতা সে জন্মান্তরীণ সুখস্বপ্নময় মুখখানি—গড়িয়াছিল ? কি দিয়া গড়িয়াছিল ? কেমন করিয়া গড়িয়াছিল ? মনের কথা বলিতে পাই না কেন ? বুকের ভিতর, কি কুল্-কুল্ করে, তাহা মুখে ফুটিয়া বলিতে পাই না কেন ? মনের কথা শুনাইবার জন্য, মনের মতন লোক পাই না কেন ? কাহাকে বলিব ? কে এ দুঃখের কাহিনী দুই দণ্ডকাল স্থির হইয়া শুনিবে ? মানুষে কি আমার দুঃখ বুঝিবে ? তাই অগ্রে বলিয়াছি ত মনে বড় খেদ রহিল।

দ্বিতীয় লহরী

লক্ষণ



লেখক—শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী

নারীর লক্ষণ

প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনেই জগৎ। রমণীগণ প্রকৃতির অংশসম্ভূতা এবং পুরুষ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; সুতরাং প্রকৃতির অবমাননা করা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নয়।

মনু বলিতেছেন,—

যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥

সৌন্দর্য্য

যে পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের সমাদর আছে,—দেবতাগণ সেখানে সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করেন, আর যেখানে স্ত্রীজাতির আদর-সম্মান নাই—সেই পরিবারের সমস্ত কার্য্যকলাপ নষ্ট হইয়া থাকে। যে বংশে কুলরমণী সর্ব্বদা দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করে, শীঘ্রই সেই বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং যেখানে তাঁহারা মনের সুখে দিনাতিপাত করেন, সেই বংশের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে। প্রাচীন গ্রন্থ সকল অনুসন্ধানে আমরা নানাস্থানে স্ত্রীজাতির প্রতি বহুল আদর-সম্মানের কথা দেখিতে পাই। সংসারে যদি যথার্থ কোন সুখ-শান্তি থাকে, তবে তাহা রমণীর মধুর স্নেহ, ভক্তি ও অপার্থিব প্রণয়।

রমণী নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। বিভিন্ন প্রকৃতির নারী বিভিন্ন গুণসম্পন্ন, সুতরাং বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপা, কেহ রমণীগুণসম্পন্না, কেহ পিশাচী-সদৃশী, কেহ বা মানবী-বেশে রাক্ষসী-গুণসম্পন্না; সুতরাং ঐ সকল রমণীকে চিনিবার উপায় জানা আবশ্যক। স্ত্রীজাতির শুভাশুভ লক্ষণ শাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত আছে—ঐ সকল লক্ষণ জানা থাকিলে চন্দনতরু-জ্ঞানে কাল-ভুজঙ্গীকে আশ্রয় করিতে হয় না। সেই জন্যই নানা শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর রমণীর বিভিন্ন লক্ষণসমূহ এ স্থলে প্রকাশ করিব।

রমণীর জাতি-ভেদ।

রমণীগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত;—প্রথম পদ্মিনী, দ্বিতীয় চিত্রাণী, তৃতীয় শঙ্খিনী, চতুর্থ হস্তিনী। পদ্মিনীজাতীয়া রমণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং রমণীকুলের আদর্শ বলিয়া পরিগণিতা।



১। পদ্মিনী-লক্ষণ।

পদ্মিনী রমণীর নেত্রদ্বয় কমলদলসদৃশ আয়ত, নাসারন্ধ্র ছোট, দেহ ক্ষীণ, বাক্য মৃদু, কেশদাম দীর্ঘ, অঙ্গ মনোহর, বেশ সুন্দর এবং কুচদ্বয় ঘনসন্নিবিষ্ট। সেই রমণী পরের মঙ্গলে মতিযুক্তা এবং তাহার গাত্র পদ্মের ন্যায় সৌগন্ধবিশিষ্ট। পদ্মিনীজাতীয় রমণী জগতে দুর্ল্লভ। যে গৃহে পদ্মিনী রমণী বাস করেন, সেই গৃহে লক্ষ্মী বিরাজ করেন, গমনকালে উক্ত রমণীর দৃষ্টি পৃথিবীতে সংলগ্ন থাকে এবং পদ-সঞ্চালনে শব্দ হয় না।

২। চিত্রাণী-লক্ষণ।

চিত্রাণী রমণীগণ অত্যন্ত মনোহর-দৃষ্টিবিশিষ্টা, নাতিদীর্ঘ-নাতিখর্ব্ব-দেহযুক্তা, রসিকা, নীল পদ্মের ন্যায় চক্ষুযুক্তা, লোভহীনা, সুশীলা, তিল-ফুলের ন্যায় নাসাযুক্তা, সত্য ও প্রিয়বাদিনী, দয়া ও ক্ষমাগুণযুক্তা, দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তিপরায়ণা, পতিব্রতা, স্বল্পমৈথুন-সন্তুষ্টা এবং চিত্রিত-বদন-বিশিষ্টা হইয়া থাকে এবং কখনও পরপুরুষের দিকে পাপদৃষ্টি করে না।

৩। শঙ্খিনী-লক্ষণ।

যে রমণীর নাসিকা উচ্চ, দেহ দীর্ঘ, নেত্র পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুট, কুচদ্বয় কঠিন ও পরস্পর স্বল্প ব্যবধানযুক্ত, শারীরিক গন্ধ ক্ষারসদৃশ, বচন সুমিষ্ট, কণ্ঠদেশ তিনটি রেখাযুক্ত, রসালাপে দক্ষা, কামাতুরা, পতি ও অন্য গুরু-জনদিগকে ভয় করে না, সর্ব্বদা কামবিহ্বলা, উচ্চ হাস্যযুক্তা ও ক্ষুৎপিপাসা-তুরা, এইরূপ রমণীকে শঙ্খিনী বলে।



৪। হস্তিনী-লক্ষণ।

হস্তিনীজাতীয়া রমণী সর্ব্বদা কামানলে দগ্ধা থাকে, দেহ স্থূল, চক্ষুদ্বয় অগ্নিসদৃশ লালবর্ণ, কেশ অল্প ও ক্ষুদ্র, স্তনদ্বয় কঠিন ও ঘনসন্নিবিষ্ট নাসারন্ধ্র স্থূল, অধর ও নিতম্বপ্রদেশ অত্যন্ত স্থূল হইয়া থাকে এবং গাত্রে মদ্যগন্ধ অনুভূত হয়। এই জাতীয়া রমণী বিশেষ ভোজনদক্ষা, কুকার্য্যরতা ও পরপুরুষের সঙ্গমাভিলাষিণী হয়।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দারাসংপ্রাপ্তিহেতবঃ।
পরীক্ষান্তে প্রযত্নেন পূর্ব্বমেব করগ্রহাৎ॥ স্মৃতিঃ।

গৃহস্থধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেক লোকের পক্ষে স্ত্রী, ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষের প্রধান উপায়স্বরূপ; এজন্য বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী পত্নীর শুভাশুভ লক্ষণ যত্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

কুমারীদিগকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা,—উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা।

(ক) উত্তমা কুমারী-লক্ষণ।

শ্যামাঙ্গী, গৌরবর্ণা, উজ্জ্বল-শ্যামাঙ্গী এবং যাহার শরীর অতি দীর্ঘ বা অতি খর্ব্ব নহে অর্থাৎ মধ্যমাকৃতি, যাহার গমন গজেন্দ্রসদৃশ বা মরালসদৃশ মন্থর, দন্তপংক্তি ছোট, করতল রক্তপদ্মের ন্যায় কোমল এবং লালবর্ণ আভাযুক্ত, চক্ষু দুইটি পদ্মপত্রসদৃশ আয়ত, ধর্ম্মানুষ্ঠানে রতা এরূপ কুমারীকে উত্তমা কুমারী বলা যায়।



(খ) মধ্যমা কুমারী-লক্ষণ।

যে কুমারী ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী, পরিমিতাহারিণী, নাতিস্থূলা, নাতিকৃশাঙ্গী, নাতিদীর্ঘা, নাতিখর্ব্বা, সুনাসিকাযুক্তা, সদা প্রফুল্লমুখী, সর্ব্বদা আলস্য-শূন্যা, সুগভীর নাভিযুক্তা, সর্ব্বলোকে মিষ্টভাষিণী, সদা গুরুজনে ও দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তিমতী এবং সর্ব্বপ্রাণীতে সমান [দৃষ্টিসম্পন্না, তাদৃশী কুমারীতে মধ্যমার লক্ষণ দেখা যায়।

(গ) অধমা কুমারী-লক্ষণ।

যে কুমারী বহুরোমাবৃতা, পিঙ্গলাক্ষী, দীর্ঘদন্তবিশিষ্ট, বহুভাষিণী, লজ্জাহীনা, অতি উচ্চ হাস্যযুক্তা, কর্কশাঙ্গী, স্থূলোদরা, কঠিন হস্ত-পদযুক্তা, অল্প ও ছোট কেশবিশিষ্টা, সর্ব্বদা বহুভাষিণী, সে কুমারীকে শাস্ত্রকারগণ অধমা কুমারী বলেন।

পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার কুমারী বয়োবৃদ্ধি সহকারে তিন শ্রেণীর রমণী হইয়া থাকেন। যথা—উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা রমণী।

সুলক্ষণা রমণী।

সীমন্ত ও মস্তক।—রমণীদিগের সীমন্ত সোজা ও মস্তক উন্নত হইলে শুভ লক্ষণ, মস্তক হস্তিকুম্ভের ন্যায় সুগোল হইলে সৌভাগ্যবতী ও ঐশ্বর্য্যশালিনী হয়।

মুখ।—মুখমণ্ডল সমভাবে পূর্ণ অর্থাৎ চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি কোন অঙ্গের খুঁৎ না থাকিলে, সদগন্ধযুক্তা, সুগোল এবং জনকের বদনের মতন হইলে সেই রমণী ধন্যা হয়।



কেশ।—কেশকলাপ ভ্রমরপুঞ্জের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, সূক্ষ্ম ও সুকোমল এবং অগ্রভাগ কিছু কুঞ্চিত ও কুটিল হইলে সেই ললনা সুখ-ভাগিনী হয়।

চক্ষু।—নয়ন দুইটি নীলপদ্মের ন্যায় ও আকর্ণবিস্তৃত, প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, তারা কৃষ্ণবর্ণ ও চারিদিক্ দুগ্ধের মত শ্বেতবর্ণ এবং পক্ষ্মলোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইলে সুলক্ষণ প্রকাশ পায়।

কপোল।—মাংসযুক্ত, কোমল, বর্ত্তুলাকৃতি এবং সমুন্নত কপোল হইলে বিশেষ শুভদায়ক।

ভ্রূ।—ভ্রূ দুইটি সুগোল, কৃষ্ণবর্ণ, পরস্পর অসংলগ্ন, কোমল লোম-বিশিষ্ট এব ধনুকের মত বক্র হইলে সুলক্ষণ।

কর্ণ।—কর্ণ দুইটি বেশী মাংসযুক্তা না হইলে গঠন সমভাবাপন্ন, কোমল হইলে শুভ।

নাসিকা।—যে ললনার নাসিকা সমান অর্থাৎ উচ্চ-নীচ নহে এবং নাসিকারন্ধ্র দুইটি সমান, সুশ্রী ও ছোট তাহা শুভ।

রসনা—স্ত্রীলোকের জিহ্বা কোমল, সরল,শ্বেতবর্ণ বা রক্তবর্ণ শুভপ্রদ।

দন্ত।—দুগ্ধের ন্যায় শাদা, স্নিগ্ধ, সংখ্যায় বত্রিশ এবং উভয় পংক্তি সমান ও কিছু উন্নত হইলে শুভ লক্ষণ।

গ্রীবা।—যে রমণীর গ্রীবাদেশে ও উদরে তিনটি রেখা দেখা যায়, সে রমণী সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে। রোমযুক্ত, শঙ্খাভ ও কঠিন গোলাকার ক্রমসূক্ষ্ম, রক্তাবর্ণাভাযুক্ত হইলে সুলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কণ্ঠ।—মাংসযুক্ত বর্ত্তুল কণ্ঠদেশ সুলক্ষণ।

স্কন্ধ।—হ্রস্ব, স্থূল ও নত হইলে শুভ।

বাহু।—বাহু দুইটি সরল, মাংসযুক্ত, কোমল, গ্রন্থিযুক্ত এবং শিরা ও লোমবিহীন হইলে সুলক্ষণ।

হৃদয়।—যাহার বক্ষঃস্থল সমতল ও রোম নাই, সে প্রচুর ধনশালিনী, চিরসধবা ও পতির প্রণয়ভাগিনী হয়।

স্তন।—স্তনদ্বয় রোমহীন, স্থূল, ঘন ও সমান হইলে সুলক্ষণ। যে ললনার দক্ষিণ-স্তন বাম-স্তন অপেক্ষা উন্নত, তিনি রমণীকুলের শ্রেষ্ঠা ও তিনি পুত্রবতী হন। আর যাঁহার বাম-স্তন দক্ষিণ-স্তনাপেক্ষা উচ্চ, তিনি সুন্দরী কন্যা প্রসব করেন। নারীগণের স্তনদ্বয় পরস্পর অবিরল, গোলাকার, স্থূল, কঠিন ও উচ্চ হইলে শুভ। স্থূলাগ্র, বিরল ও সূক্ষ্ম হইলে অশুভ। যে নারীর স্তনদ্বয় বক্ষোপরি প্রথমে স্থূল এবং ক্রমশঃ অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হয়, তিনি প্রথম বয়সে সুখভোগ করিয়া পরে দুঃখ পান। যে নারীর স্তনাগ্রভাগ মনোহর, শ্যামবর্ণ ও সুগোল, তিনি সুলক্ষণা আর যাঁহার স্তনাগ্রভাগ অন্তর্ম্মগ্ন অর্থাৎ কুঁকড়িয়া ভিতর দিকে ঢুকিয়া থাকে, দীর্ঘ ও কৃশ, সে রমণী কুলক্ষণা।

পৃষ্ঠ।—পৃষ্ঠদেশ রোমশূন্য, মাংসযুক্ত এবং যাঁহার শিরদাঁড়া দৃষ্ট হয় না, এরূপ রমণী সুলক্ষণা।

নাভি।—প্রশস্ত, গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্তযুক্ত নাভি হইলে শুভ।

কটি।—সিংহের ন্যায় কটিবিশিষ্ট রমণী সুখভাগিনী হইয়া থাকে।

নিতম্ব।—চতুরস্র, কোমল, মাংসযুক্ত নিতম্ব হইলে সৌভাগ্যবতী হয়।

ঊরু।—যাঁহার ঊরু দুইটি হস্তিশুণ্ডের মত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, রোমহীন ও শিরাশূন্য এবং হস্তিশাবকের শুণ্ডের ন্যায় সুদৃশ্য, মসৃণ, ঘন এবং সুগোল, তিনি রাজপত্নী হইয়া থাকেন।

চরণ।—যাহার চরণাঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংলগ্নপ্রায়, তাম্রবর্ণ-নখযুক্ত, পদদ্বয় উচ্চ শিরাযুক্ত ও কচ্ছপপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত এবং গোড়ালী গূঢ়-ভারাপন্ন, সে স্ত্রী সৌভাগ্যবতী।

করতল ও পদতল।—হস্ত ও পদতলে ঊর্দ্ধরেখা থাকিলে হীনবংশোদ্ভবা হইলেও রাজপত্নী হইয়া থাকে। যে রমণীর করতলে ও পদতলে রথ, বজ্র, ধ্বজ এবং চক্রচিহ্ন থাকে, সে স্ত্রীলোক অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া থাকে। যে নারীর করতল মৃদু, মধ্যভাগ উন্নত, রক্তবর্ণাভাযুক্ত, ছেদ-রহিত অর্থাৎ কাটাকুটি দৃষ্ট হয় না, প্রশস্ত রেখাযুক্ত এবং অল্প রেখাযুক্ত, সেই রমণী ভাগ্যবতী।

রমণীর হস্তে মৎস্য-রেখা থাকিলে সুভগা, স্বস্তিক-চিহ্ন থাকিলে সুপুত্র-বতী এবং পদ্মচিহ্ন থাকিলে রাজমহিষী এবং রাজমাতা হইয়া থাকে। যে স্ত্রীলোকের করতলে তোরণ ও প্রাচীরাকৃতিবিশিষ্ট রেখা দেখা যায়, সে অতিশয় নীচবংশে জন্মিলেও রাণী হইবে। করতলে ত্রিশূল, খড়্গ, গদা ও দুন্দুভি-চিহ্ন থাকিলে সে ধরণীতলে কীর্ত্তিমতী হইয়া থাকে। যে ভামিনীর করতলে শকট বা যুগচিহ্ন থাকে, সে কৃষকের পত্নী এবং যাহার হস্তে চামর, অঙ্কুশ বা ধনু-চিহ্ন থাকে, সে রাজরাণী হয়। যে হরিণনয়না রমণীর করতলে তুলাদণ্ডাকৃতি চিহ্ন থাকে, সে দীর্ঘজীবী পতি প্রাপ্ত হয় এবং বহু সন্তানের জননী হয়। যে রমণীর কর ও পদতলে তাম্রবর্ণ রেখা ও তাম্রবর্ণ নখ থাকে, সে স্ত্রী জীববৎসা, দীর্ঘজীবিনী ও পুত্র-পৌত্রসম্পন্না হয়।

যে নারীর পদতলে চক্র, স্বস্তিক, শঙ্খ, পদ্ম, ধ্বজ, মৎস্য এবং ছত্রচিহ্ন থাকে, সে নারী রাজমহিষী হয়।



যে যুবতী রমণীর পদতলে পদ্ম, শঙ্খ, রথ, ধ্বজ, চক্র, সিংহাসন কিংবা চন্দ্রাতপ (চাঁদোয়া) সদৃশ চিহ্ন থাকে, সে রমণী রাজমহিষী বা ঐশ্বর্য্যশালিনী হয়।

কুলক্ষণা নারী।

মস্তক।—যে রমণীর মস্তক অতিশয় স্থূল, সে আপনার মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া দুষ্ট জন সহ অনুরক্তা হয়। আর যাহার মস্তক লম্বা, সে সর্ব্বনাশিনী বন্ধ্যা এবং নিজ বংশের ধ্বংসকারিণী হইয়া থাকে। মস্তক দীর্ঘাকার হইলে দেবর-ঘাতিনী, রোমশ ও উন্নত শিরাবিশিষ্টা হইলে রুগ্না, স্থূল হইলে বিধবা, দীর্ঘ হইলে বন্ধ্যা এবং বিশাল হইলে দুর্ভগা হইয়া থাকে।

কেশ।—রমণীর মস্তকের কেশ বিরল, পিঙ্গলবর্ণ, স্থূল, রুক্ষ এবং অতিশয় ক্ষুদ্র হইলে বন্ধ্যাত্ব এবং বৈধব্যব্যঞ্জক বলিয়া বিবেচিত হয়।

চক্ষু।—চক্ষুর্দ্বয় উন্নত হইলে অল্পায়ু, গোল হইলে কুলটা, মেষ-মহিষের ন্যায় অথবা ট্যারা চক্ষু হইলে অশুভ, গাভীর চক্ষুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইলে গর্ব্বিতা, পারাবতের চক্ষুর ন্যায় হইলে দুঃশীলা, রক্তবর্ণা হইলে পতিঘাতিনী, কোটরচক্ষু হইলে দুশ্চরিত্রা, গজচক্ষুর ন্যায় হইলে কুলক্ষণা, বামচক্ষু কাণা হইলে বেশ্যা, দক্ষিণ-চক্ষু কাণা হইলে বন্ধ্যা; ট্যারা, পিঙ্গলবর্ণ বা শ্যামবর্ণ ও চঞ্চল হইলে অসতী এবং মণি লম্বমান হইলে দেবরঘাতিনী হইয়া থাকে।

পক্ষ।—যে রমণীর চক্ষুর পাতা অল্প ও স্থূল, সে অমঙ্গলদায়িনী হয়।



ভ্রূ।—কামিনীর ভ্রূ দুইটি রেখাবিশিষ্ট, সরল, উভয় ভ্রূ মিলিত ও দীর্ঘ রেখাযুক্ত ও পিঙ্গলবর্ণ হইলে তাহাকে কুলক্ষণা জানিবে।

নাসিকা।—নাসিকাগ্রভাগ কুঞ্চিত ও রক্তবর্ণ হইলে বিধবা, চিপিটাকার হইলে দাসী, হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইলে সেই স্ত্রীলোক কলহপ্রিয়া হয়।

হনু।—হনু লোমযুক্ত, কুটিল ও অত্যন্ত স্থূল হওয়া শুভদায়ক নয়।

কপোল।—যে ললনার গণ্ডস্থল শ্বেতবর্ণ ও কূপবৎ দাগ থাকে, সতী-সাধ্বীর মত দেখাইলেও তাহাকে কুলটা বলিয়া জানিবে। যাহার গণ্ডস্থল রোমযুক্ত,কর্কশ, নিম্ন ও মাংসহীন,তাহাকে কুলক্ষণা বলিয়া ত্যাগ করিবে।

দন্ত।—যাহার দন্তগুলি ছোট ও বড়, সে কষ্টভাগিনী, যাহার দন্ত বিষমাকার, সে ক্লেশ ও ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। যাহার নিম্নপংক্তিতে বেশী দাঁত, সে তাহার মাতার মৃত্যুর কারণ এবং যাহার দন্ত বিকট, সে বিধবা হয়। যাহার দন্ত বিরল, সে বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা দিন যাপন করে।

অধর ও ওষ্ঠ।—যাহার ওষ্ঠ অধরাপেক্ষা উচ্চ, সে কর্কশ বাক্য দ্বারা লোকের সঙ্গে সদা কলহ করে এবং যাহার ওষ্ঠপ্রান্তে রোম দৃষ্ট হয়, সে কখনও স্বামীর মঙ্গলদায়িনী হয় না। যাহার অধর লম্বিত, কৃশ ও রুক্ষ, সে হতভাগিনী। অধর ও ওষ্ঠ ধূসরবর্ণ ও স্থূল হইলে সে নারী বিধবা ও বিবাদপ্রিয়া হইয়া থাকে।

জিহ্বা।—যে রমণীর জিহ্বা শুক্লবর্ণা, সে জলমগ্না হইয়া প্রাণত্যাগ করে। যাহার রসনা শ্যামবর্ণা, সে অতিশয় কলহপ্রিয়া। যাহার জিহ্বা অতি স্থূল, সে দরিদ্রা। যাহার জিহ্বা অতি লম্বমান, সে অভক্ষ্য-ভক্ষণে অনুরক্তা এবং যাহার রসনা অতিশয় বিস্তৃত, সেই নারী বহু দুঃখ পায়।



বিরহিণী



পদ্মিনী



হাস্য।—যাহার হাস্যকালে গণ্ডপ্রদেশে কূপবৎ দৃষ্ট হয়, সে কুলটা হয়। হাস্যকালে যাহার মুখমণ্ডল রক্তিমাকার ধারণ করে, সেই স্ত্রী বয়সের তৃতীয় ভাগে পতিকে বধ করিয়া চতুর্থ ভাগে সুখ-সম্ভোগে রত হয়।

ঘাড়।—যে রমণীর ঘাড় রোমযুক্ত, শুষ্ক, বিস্তীর্ণ এবং বক্র, সে অনেক কষ্ট ভোগ করে।

স্কন্ধ।—যে কামিনীর স্কন্ধ স্থূল রোমযুক্ত, সে বিধবা হইয়া অপর ব্যক্তির আলয়ে দাসী হইয়া থাকে।

গাত্র।—যাহার গাত্র রুক্ষ অর্থাৎ কোমল ও মসৃণ নহে, শিরাযুক্ত ও মাংসহীন, তাহাকে অশুভলক্ষণা জানিবে।

বাহু।—বাহুদ্বয় স্থূল, রোমবিশিষ্ট ও খর্ব্ব হইলে চিরকাল দুঃখ পায়।

বক্ষঃস্থল।—যাহার বক্ষঃস্থল রোমযুক্ত, সে পতিঘাতিনী, এবং যাহার হৃদয় বিস্তীর্ণ, সে বেশ্যা ও নির্দ্দয়া হয়।

স্তন।—যাহার স্তনযুগল কূপ হইতে জলতোলা যন্ত্রের মত, সে নারী কুলটা হইয়া থাকে। যাহার স্তন দুইটির উপরিভাগ স্থূল, বিরল ও বিস্তৃত, তাহাকে অশুভ-লক্ষণা জানিবে। যাহার স্তনযুগল উদরোপরি পতিত হয়, সে নিশ্চয় বিধবা হইয়া থাকে।

পার্শ্বদেশ।—যে রমণীর পার্শ্বদেশ দৃশ্যমান শিরাযুক্ত ও রোমাঞ্চিত, সে দুশ্চরিত্রা, দুঃখভাগিনী ও সন্তানহীনা হয়।

পৃষ্ঠ।—যে রমণীর পৃষ্ঠদেশ রোমযুক্ত, সে নিশ্চয় বিধবা আর যাহার পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন, অবনত ও শিরাযুক্ত, সে দুঃখভাগিনী হয়।



জঠর।—যে নারীর জঠর বৃহৎ, সে সন্তানহীনা, যাহার জঠরদেশ লম্বিত, সে পতিঘাতিনী, যাহার জঠরদেশ উন্নত, সে জন্মসন্ধ্যা এবং যাহার উদরের ঊর্দ্ধভাগে গোলাকার ও কপিলবর্ণ রোমরাজি দেখা যায়, সেই নারী রাজবংশে জন্মিলেও তাহাকে দাসীবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়।

কটি।—যাহার কটিদেশ অবনত,দীর্ঘ,সংকীর্ণ ও মাংসহীন ও অতি কষ্টাকৃতি ও রোমযুক্ত, সে বিধবা হয় ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

উরু।—কামিনীর উরুদেশ অতিশয় রোমযুক্ত হইলে বিধবা, চেপ্টা হইলে দুর্ভাগা, মধ্যস্থলে ছিদ্রযুক্ত হইলে মহাদুঃখভাগিনী এবং মধ্যস্থলে কঠিনত্ব হইলে দরিদ্রা হয়।

জানু।—স্ত্রীলোকের জানু মাংসহীন হইলে স্বেচ্ছাচারিণী এবং শিথিল হইলে দরিদ্র হর।

গুল্‌ফ।—স্ত্রীলোকের গোড়ালি মাংসহীন, অপুষ্ট ও শিথিল হইলে সে নারী দুর্ভগা হয়।

চরণ।—পদতল কর্কশ, বিবর্ণ, কঠিন, :বিভক্ত, অঙ্গুলিযুক্ত, কুলাসদৃশ বিস্তৃত এবং শুষ্ক, সে অশুভলক্ষণা হয়।

চরণাঙ্গুলি।—যে নারীর গমনকালে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও অনামিকা অঙ্গুলি স্থান স্পর্শ করে না—সে বিধবা হইয়া আপন ইচ্ছানুসারে জীবন কাটায়। চরণাঙ্গুলি দীর্ঘ হইলে বেশ্যা, কৃশ হইলে ধনহীনা, খর্ব্ব হইলে অল্পায়ুঃ বক্র হইলে দুর্দ্দশাগ্রস্তা হয়।

গমন।—যে নারীর গমনকালে পৃথিবী কম্পমান বলিয়া বোধ হয়,

সে বিবাহের পর শীঘ্রই বিধবা হইয়া থাকে। যাহার গমনকালে সম্মুখের অঙ্গুলি উৎক্ষিপ্ত হয়, সে কলঙ্কিনী হয়।

নখ।—যাহার নখ কুলার ন্যায় প্রশস্ত, সে দুঃখভাগিনী হয়।

করতল ও পদতল।—রমণীর পদতল কুলার ন্যায় বিবর্ণ, খসখসে, কর্কশ এবং রুক্ষ হইলে দুর্ভাগা হইয়া থাকে। যাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির মূল হইতে একটি রেখা উঠিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত গমন করে, সে স্বামিঘাতিনী হয়।

যাহার করতলে কাক-পক্ষী, শৃগাল, ভেক, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, সর্প, গর্দ্দভ, বিড়াল, উষ্ট্রের চিহ্ন থাকে, সেই অলক্ষণা স্ত্রী স্বামীর দুঃখপ্রদায়িনী হয়। বামাবর্ত্ত রেখা থাকিলে ভাগ্যহীনা ও অলক্ষণা হয়। করতলে বহুরেখা থাকিলে বিধবা, অত্যন্ত অল্প রেখা থাকিলে দরিদ্রা এবং শিরাযুক্ত থাকিলে ভিক্ষুকী হয়।

মস্তক ও তিল চিহ্ন।

যে রমণীর হৃদয়ে তিল বা অন্য কোন চিহ্ন থাকে, সে সৌভাগ্যবতী হয়। ললাট ও ভ্রূর শেষ ভাগে আঁচিল থাকিলে, সে রাজ্যভোগ করে। যাহার ললাটের মধ্যস্থানে বা ভ্রূর নিকট মশক চিহ্ন থাকে, সে ধনবতী, ভোগিনী পতিপুত্র ও দাসদাসীযুক্ত হয়। যাহার দক্ষিণ স্তনে লোহিত বর্ণের চিহ্ন থাকে, সে চারি কন্যা ও তিন পুত্র প্রসব করে। আর যাহার বাম স্তনে লোহিতবর্ণ তিল চিহ্ন থাকে, সে রমণী একটিমাত্র পুত্র প্রসব করিয়া বিধবা হয়। যে রমণীর নাসাগ্রে তিল বা মশক চিহ্ন থাকে এবং যাহার দন্ত ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, তিনি বিবাহের পর দশ দিনের মধ্যে



বিধবা হন। যাহার নাসিকার অগ্রভাগে লালবর্ণ আঁচিল থাকে, সে রাণী হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ আঁচিল কৃষ্ণবর্ণ হইলে বিধবা ও ভ্রষ্টা হয়। রমণীর হস্তে দক্ষিণাবর্ত্তরেখা শুভসূচক। বামাবর্ত্ত রেখা অমঙ্গলদায়ক। কটিদেশে আবর্ত্ত রেখা থাকিলে কুলটা, নাভিতে থাকিলে পতিব্রতা এবং পৃষ্ঠদেশে থাকিলে পতিঘাতিনী ও বেশ্যা হয়। নারীর কপালে বা সীমন্তপ্রদেশে দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা থাকিলে পতিপুত্র-ঘাতিনী এবং উদর হইতে পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত উক্ত রেখা থাকিলে, ব্যভিচারিণী হয়।

তৃতীয় লহরী

শোভন



লেখক—শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রী-চরিত্র।

পুরুষের ভাগ্য এবং নারীর চরিত্র দেবতারাও বুঝিতে পারেন না;—মনুষ্য কোন্ ছার! কোন্ তরলমতি নবীনা, পিতামহের যোগ্য বৃদ্ধ স্বামীর চরণারবিন্দে মতি স্থির না রাখিয়া, প্রতিবেশী যুবককে দেখিবার জন্য দিনে দশবার কলসী-কক্ষে ঘাটের পথে যাতায়াত করে,—আমরা পাড়ার পাঁচজন এই প্রবাদ স্মরণ করিয়া তাহার কদাচারের ব্যাখ্যা করি। কিন্তু পুরুষের ভাগ্য যেমন হউক, নারীচরিত্র কি সত্যই বুঝা যায় না?

কেবল কতকটা বুঝা যায়; সবটা বুঝিবার পথ আমরা আপনারাই অনেক দিন হইল রুদ্ধ করিয়াছি। এ সংসারে পুরুষ প্রতিপালক স্ত্রীলোক প্রতিপালিত; এই সম্বন্ধ এতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে যে পুরুষের দ্বারা নারীচরিত্র সম্যক্ জ্ঞাত হওয়ার আর বোধ হয় উপায় নাই। এত কাল হইতে স্ত্রীজাতি পরমুখাপেক্ষিণী, পরপ্রত্যাশিনী, পরান্নভোগিনী, পরাবসথশায়িনী, যে তাহাদের সকল কথা পরের কাছে প্রকাশ হওয়া



একরূপ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। প্রতিপালকের কাছে প্রতিপালিতকে অনেক কথা লুকাইতে হয়, অনেক ভাবের ভাণ করিতে হয়,—চিরপ্রতিপালক পুরুষের কাছে চিরপ্রতিপালিত স্ত্রীজাতির অনেক কথা গোপন থাকিবেই থাকিবে। যে চরিত্রগত স্বাধীনতা চরিত্রবিকাশের একমাত্র পথ, তাহা তাহাদেরই নাই। সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীচরিত্র বুঝিবার পথ, অনেক দিন হইল বন্ধ হইয়াছে। তবু যেটুকু বুঝা যায়, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত।

এক্ষণে ধরাতলে যে সকল জাতি বিদ্যমান,যে সকল জাতি সভ্যতাপ্রাপ্ত, তাহারা আদিযুগের সেই বিজয়ী জাতিসকল হইতে উৎপন্ন। সেই আদিম অসভ্য, উচ্ছৃঙ্খল, বিজয়ী বীরগণ যে কেবল সাহসী ও বলবান্ ছিল, এরূপ নহে—তাহারা কলহপরায়ণ, কোপনস্বভাব, ন্যায়জ্ঞানবিরহিত, প্রতিহিংসারত, আত্মসর্ব্বস্ব, শোণিতপিপাসু এবং শত্রুর প্রতি প্রস্তরবৎ কঠিনহৃদয়। তাহাদের শত্রু অনেক, এই পাঁচজনে বসিয়া পানভোজন, নৃত্যগীত করিতেছে, আবার পরক্ষণেই সেই পাঁচ জনে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে। সভ্যতা তাহারা জানে না—তেমন চিত্তসংযম তাহাদের নাই। তাহারা আহ্লাদ হইলে নাচে, দুঃখ হইলে কাঁদে, রাগ হইলে মারে, ভয় পাইলে পলায় এবং নাচিতে, কাঁদিতে, মারিতে, পলাইতে তাহারা সমান তৎপর।

মনুষ্য-জন্মের প্রথম অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে এই সকল লোকের সাহচর্য্য করিতে হইয়াছে, এই সকল স্বার্থপর, কলহরত, আত্মসর্ব্বস্ব, উচ্ছৃঙ্খল, নিষ্ঠুর, পশুবৎ লোকের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছে—এই সকল

লোকের মন রাখিয়া জীবনধারণ করিতে হইয়াছে। মনুষ্যই কি, আর অন্য জীবই কি, যে অবস্থায় পতিত হয়, ক্রমে তদুপযোগিতা লাভ করে। সেই অবস্থানুসারে প্রকৃতি গঠিত হয়, না হইলে রক্ষা নাই।

এই সকল লোকের কাছে স্ত্রীলোকদের অনেক সময়ে মনের ভাব গোপন করিয়া চলিতে হইয়াছে। যাহাকে পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, বিশেষতঃ যাহাকে নির্দ্দয় দুরন্ত লোকের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়, তাহাকে মনের অনেক কথা, হৃদয়ের অনেক ব্যথা, চিত্তের অনেক বেগ, অন্তরের অনেক সাধ গোপন করিতে হয়। যদি কখন কোন প্রতিযোগিনী প্রতিবেশিনীর কর্ণছিদ্রে বিচিত্র প্রস্তর, কবরীতে নূতন পালক, পরণে রঞ্জিত বল্কল দেখিয়া আপনার জীর্ণ বল্কল, মলিন পালক, পুরাতন কর্ণভূষার সহিত তুলনা করিয়াছে, তাহা হইলে আপন মনেই মর্ম্মপীড়িতা হইয়াছে—দুঃখ, ঈর্ষা, অভিমান কখন সাহস করিয়া মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত করিতে পারে নাই—কখন আপনার হীনাবস্থার জন্য জোর করিয়া দুটো কথা স্বামীর কাছে বলিতে পারে নাই। বালিকা বিদ্যালয়ে আউট্, বিধুমুখী ন্যায়ালঙ্কার, রাইকিশোরী বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার পতাকাধারিণীগণের ন্যায় যদি তাহারা যার তার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া স্বামীর কাছে হাতনাড়া দাঁতঝাড়া দিতে যাইত, তাহা হইলে হাত নাড়িয়া দাঁত ঝাড়িয়া আর তাহাদিগকে জীবলোকে থাকিতে হইত না—মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে শূলবিদ্ধ হইতে হইত এবং ইহা তাহারা বিলক্ষণ জানিত। জানিত বলিয়া চিত্তবৃত্তিনিচয়ের উপর চিরকাল শাসন রাখিয়া আসিয়াছে। সেই আদিম অসভ্যাবস্থায়

যদি কখন কাহারও রূপ দেখিয়া তাহার দাসী হইতে সাধ গিয়াছে —মনের সাধ মনেই থাকিয়া গিয়াছে—সে সাধ বাহিরে প্রকাশ হইলে তন্মুহূর্ত্তেই তাহাকে ভবের হাট হইতে দোকানপাট উঠাইতে হইত। সে যে দৃষ্টিপথে চিত্তহারা হইয়াছে, এ কথা যদি কখন স্বামী ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিয়াছে, বুঝিতে পারিয়া সন্দেহ করিয়াছে, তবে স্বামিহৃদয় হইতে সেই সন্দেহ দুর করিবার জন্য শত যত্ন করিতে হইয়াছে; এবং সেই যত্নে কৃত-কার্য্য হওয়ার উপর তাহার জীবন নির্ভর করিয়াছে। কাজেই ইহার যে সকল তন্ত্রমন্ত্র আছে, তাহাতে স্ত্রীজাতি ক্রমে এক প্রকার সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মনের আগুন মনে ঢাকিয়া রাখিয়া বাহিরে তাহারা এমন ভালবাসা জানাইতে পারে যে, স্বয়ং 'মেকিয়াভেলিকেও, সাক্ষাৎ 'রশেফু-কলকেও তাহাতে প্রতারিত হইতে হইবে। চক্ষের জল তাহারা ইচ্ছা করিলেই ফেলিতে পারে। হলাহল, মিথ্যা কথা তাহারা এমন ভঙ্গী করিয়া, এমন করিয়া সাজাইয়া বলিতে পারে, যে মূর্ত্তিমান্ সত্যও তাহার কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। এইরূপে তাহারা মনের কথা লুকাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে অভ্যাসের ফল এ কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতিতে বিদ্যমান— তাহার চিত্তের গতি তুমি কখন বুঝিতে পারিবে না—অবলীলাক্রমে তোমার চক্ষে ধূলা দিবে। তাহার কথা তুমি কখন বাহির করিয়া লইতে পারিবে না—বুক ফাটিয়া যাইবে, কিন্তু মুখ ফুটিবে না।

আবার সেই সকল উচ্ছৃঙ্খল, নিষ্ঠুর, দুর্ব্বিনীত, স্বার্থপর, অসভ্য-হস্তে তাহাদিগকে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। ক্ষুধার ক্লেশ, অপ-মানের যাতনা, নির্য্যাতনের মর্ম্মপীড়া তাহাদিগকে অনেক সহিতে



হইয়াছে। অনেক দিন আপনি অনাহারে বা অল্পাহারে থাকিয়া স্বামি পুত্রের সেবা করিতে হইয়াছে। অনেক সময়ে, যখন স্বামী যুদ্ধে বা বন্য জন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বামীর রুগ্নশয্যার পার্শ্বে বসিয়া ধাত্রী এবং চিকিৎসকের কার্য্য প্রাণপণে করিতে হইয়াছে। নিজের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য, সাংসারিক সুবিধা, অসুবিধা, সকল ভুলিয়া সেই রোগীর সঙ্গে রোগী হইতে হইয়াছে। আবার সেই সকল উদ্ধত, নির্দ্দয়, ক্রোধপরবশ আদিম অসভ্যদিগের হস্তে অনেক সময়ে অপমানিত, তিরস্কৃত, প্রহারিত হইতে হইয়াছে, অথচ কোন কথা কহিতে সাহস হয় নাই, প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করিতে পারে নাই—বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় নীরবে, নিভৃতে মর্ম্ম-পীড়ায় আপনি পীড়িত হইয়াছে। রাগ, দ্বেষ, অভিমান সকলে জলাঞ্জলি দিয়া সেই অত্যাচারী স্বামীর সঙ্গে আবার সাহচর্য্য করিতে হইয়াছে। গৃহপালিতা হরিণীর ন্যায়, যে হস্ত বধার্থে শূল উত্তোলন করিয়াছে, সেই হস্তই আবার আদরে লেহন করিয়াছে। বর্ষাসম্ভূত কর্দ্দমরাশির ন্যায়, যে পদে মর্দ্দিত হইয়াছে, সেই পদই আবার জড়াইয়া ধরিয়াছে, যে মুখের বাক্যবিষে মর্ম্মে-মর্ম্মে বৃশ্চিক দংশন হইয়াছে—সেই মুখে হাসি দেখিবার জন্যই আবার সহস্র উদ্যোগ করিতে হইয়াছে—হৃদয়ের গরল হৃদয়ে লুকাইয়া মুখে মধুবর্ষণ করিতে হইয়াছে। এ সকলই তাহাদিগকে নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে; কাহারও কাছে আপনার মনের কথা, মর্ম্মের ব্যথা প্রকাশ করিতে সাহস হয় নাই, কেন না, যদি তাহা কোন প্রকারে স্বামীর কর্ণে উঠে, তাহা হইলে বিভ্রাট পড়িয়া যাইবে—অধিকতর

অপমানিত, তিরস্কৃত, প্রহারিত হইতে হইবে—হয় ত গৃহবহিষ্কৃত, সুতরাং আশ্রয়শূন্য হইতে হইবে—হয় ত প্রস্তর-কুঠারাঘাতে মরিতে হইবে—হয় ত অনাহারে মরিতে হইবে। সেই জন্য তাহারা সবই মনে মনে সহ্য করিয়াছে। যদি চক্ষে জল আসিয়াছে, তাহা চক্ষেই শুকাইয়াছে। যদি অন্তর বিদীর্ণ করিয়া বিষাদ-নিশ্বাস উঠিয়াছে, তাহা অন্তরের অন্তরেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। স্ফীত হৃদয়ের ব্যথা, সেই স্ফীত হৃদয় ব্যতীত আর কেহ জানে নাই; কাতর প্রাণের কথা, সেই কাতর প্রাণ ব্যতীত আর কেহ শুনে নাই। যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন হয় ত নিকটবর্ত্তিনী তরঙ্গিণীর তরঙ্গে আপনার নয়নের তরঙ্গ মিশাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—হয় ত কুটীরপার্শ্বস্থ বনভূমি সঞ্চারী আলস্যমন্থর বায়ুতে আপনার নৈরাশ্যকাতর, যাতনাপীড়িত, ঔদাস্যবিবশ অন্তরের শ্বাস লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—জীবলোকের সহানুভূতি আহ্বান করিতে বা মনের কথা প্রকাশ করিতে কখন সাহস হয় নাই। এইরূপ সহ্য করিয়া স্ত্রী-চরিত্রে সহিষ্ণুতা এবং চিত্ত-সংযম গুণ বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। উত্তরাধিকার নিয়মে তাহা স্ত্রী-চরিত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। এখনও আমরা দেখিতে পাই, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সহিষ্ণুতা অধিক। প্রাচীনকালে যে তাহারা রোগে, শোকে, অনাদরে, নির্য্যাতনে, অপমানে, পীড়নে, মর্ম্মপীড়ায়, ক্লিষ্ট, আর্ত্ত, ক্ষুণ্ণ, পীড়িত, ব্যথিত, মর্ম্মাহত হইয়াও গৃহধর্ম্মে উদাসীন বা স্বামিসেবায় বিরত হইতে পায় নাই—গৃহধর্ম্মে উদাসীন হইলে বিলি-ব্যবস্থার অভাবে পরিবার উৎসন্ন গিয়াছে—স্বামি-সেবায়

বিরত হইলে জীবনোপায়ে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে—সে কঠোর শিক্ষার ফল এ পর্য্যন্ত স্ত্রীচরিত্রে জাজ্বল্যমান। যে পীড়া হইলে পুরুষ শয্যাত্যাগ করিতে পারে না, স্ত্রীলোক তদপেক্ষা উগ্রতর পীড়া লইয়াও গৃহকার্য্যে সাধ্যানুসারে সাহায্য করে। যে ব্যাধিতে পুরুষ ইহলোক পরলোক ভুলিয়া যায়, তদপেক্ষা শত গুণ তীব্রতর ব্যাধির যাতনার মধ্যেও স্ত্রীলোকে সামান্য গৃহকার্য্যটিও ভুলে না—ছোট ছেলেটি দুধ পায় নাই, বড় মেয়েটির স্নান হয় নাই, স্বামীর তাম্বূল প্রস্তুত হয় নাই, চৌকাঠে জল পড়ে নাই, ঠাকুরঘরে ঝাঁইট দিলে কে, যাতনার মোহেও এই সকল তাহার জপমালা হইয়া থাকে। কুলীনকুমারী চিরকৌমার্য্যভার বহন করিতে অপারগ নহে। বালবিধবা চিরবৈধব্য-যন্ত্রণারূপ নিয়ত প্রজ্বলিত রাবণের চিতা বুকে করিয়া বহিতে অসমর্থা নহে। তুমি তাহার উপর সহস্র অত্যাচার কর, তবু সে তোমা বৈ জানে না। তুমি তাহাকে পদাঘাত কর, তবু সে তোমার পদারবিন্দ ব্যতীত আর কিছু ভাবে না। তুমি প্রমোদগৃহ হইতে নিশীথে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর, সে তোমার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকে—তোমার আহার্য্য কাছে করিয়া তোমার জন্য জাগিয়া বসিয়া থাকে—পল যায়, দণ্ড যায়, প্রহর যায়, সমান বসিয়া আছে। চন্দ্র উদয় হইয়া তাহাকে যেখানে দেখে, অস্ত যাইবার সময়েও তাহাকে সেইখানে দেখিয়া যায়। শেষ চন্দ্র অস্ত যায়, নক্ষত্র সকল একে একে নিবিয়া যায়, রাত পোহাইয়া যায়, দিগঙ্গনারা উপরের নীলসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে সুবর্ণ বালুকা একবার স্তূপীকৃত করিয়া, আবার ছড়াইয়া ফেলিয়া দেবখেলা আরম্ভ করে,

তখন হয় ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, একবার অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, আবার গৃহকার্য্যে লিপ্ত হইতে যায়। পুরুষকে এতটা সহ্য করিতে হইলে সে হয় ত আত্মঘাতী হয়—বিষ খায়, জলে ঝাঁপ দেয়, গলায় ফাঁস লাগাইয়া মরে। সহিয়া সহিয়া এতটা সহ্য হইয়া গিয়াছিল যে, অবশেষে হিন্দুর মেয়েদের জ্বলন্ত চিতায় জীয়ন্তে পুড়িয়া মরাও সহ্য হইত।

স্ত্রী-চরিত্রের আর এক ভঙ্গী দেখ। শেক্ষপিয়রের দেস্‌দিমোনা সুন্দরী, যুবতী, উচ্চবংশসম্ভূত—কত উচ্চবংশসম্ভূত, ধনবান্, কুঞ্চিত-কেশ, সুন্দর যুবা তাহার প্রণয়ের জন্য লালায়িত ছিল—দেস্‌দিমোনার কাহাকেও মনে ধরে নাই। আর ওথেলো—মূরবংশীয়, কৃষ্ণকায়, বয়সে প্রৌঢ়—দেস্‌দিমোনার চিত্ত ওথেলোতে পড়িল। তাঁহার গৌরব ও বীর্য্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল।

পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের উপরই দ্রৌপদীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসা ছিল। আবার মহেন্দ্র তুল্য পাঁচ পাঁচ স্বামী থাকিতেও সেই পাঞ্চালী কর্ণের প্রতি আসক্ত ছিলেন। নেপোলিয়ান যখন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরী অবরোধ করেন, তখন অস্ট্রিয়ার কোন উচ্চকুলোদ্ভবা নবীনা সুন্দরী তাঁহার শৌর্য্যগৌরবে আত্মবিক্রীতা হইয়া তাঁহার জন্য অভিসারিণী হয়। কেন এমন হয়? কেন সর্ব্ব-জনকামনীয়া দেস্‌দিমোনা ওথেলোর জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইল? কেন সতীকুলের আদর্শস্থানীয়া দ্রৌপদী কর্ণকে স্বামিরূপে প্রার্থনা করেন? চিন্তাশীল পাঠক বলিবেন, নারী-হৃদয়ের উপর বীর্য্যের মোহ বড় প্রবল।

সামাজিক বৈষম্য এবং সাংসারিক কৃতকার্য্যতার একমাত্র মূল বীর্য্য,

সে অবস্থায় পরপ্রত্যাশী এবং পরপ্রতিপাল্যদিগের সর্ব্বপ্রধান এবং অবশ্য-স্থাতব্য গুণ—বীর্য্য-পক্ষপাতিতা ; কেন না, উহা জীবন-সংরক্ষণের এবং বংশ-প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।

একাল পর্য্যন্ত স্ত্রী-জাতিতে সেই আদিম বীর্য্যানুরাগিতা দেদীপ্যমান—এখনও স্ত্রী-হৃদয়ে বীর্য্যের মোহ অত্যন্ত প্রবল ; সৌন্দর্য্যের মোহ অনেক সময়েই তাহার নিকট পরাস্ত হয়।

চিরকাল স্ত্রীজাতি সবল ও ক্ষমতাবানের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। সংস্কারবশতঃ এখনও ক্ষমতা দেখিলেই স্ত্রীহৃদয় আকৃষ্ট হয়। যেখানেই ক্ষমতার বিকাশ দেখে, সেইখানেই স্ত্রী-হৃদয় অবনত, অনুগত, পদানত হইয়া পড়ে। বেকন একস্থলে বলিয়াছেন যে, দুর্ব্বিনীত লোকের পত্নী প্রায় সাধুশীলা হয়। হার্ব্বাট স্পেন্‌সর লিখিয়াছেন যে, তেজস্বী, ক্ষমতাশালী অথচ নিষ্ঠুর লোকের প্রতি স্ত্রীলোকের আসক্তি যত দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয়, দুর্ব্বল, নিস্তেজ, অথচ সদ্ব্যবহারী লোকের প্রতি তত হয় না। ইহার কারণ, এই বীর্য্যানুরাগ, এই ক্ষমতা-পক্ষপাতিতা বহুযুগের এই সবল—নির্ভরের অভ্যাস-লব্ধ সংস্কার।

মূলে এইরূপ ক্ষমতা—জীবনোপায় সংগ্রহের সহিত যে ক্ষমতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে—মূলে এইরূপ ক্ষমতা-পক্ষপাতিতা হইতে ক্রমে স্ত্রী-চরিত্রে সকল প্রকার শক্তির উপাসনা-প্রবণতা স্থানলাভ করিয়াছে, বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে। কি ধর্ম্ম, কি রাজবিধি, কি সমাজ, যে দিকে চাহিয়া দেখিবে, সেই দিকেই শত সহস্র দৃষ্টান্ত, শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে।

সৌন্দর্য্য

গঙ্গাস্নানে যখন যাত্রী আসে, তখন হাটে, ঘাটে, পথে মেয়ে ধরে না—তাহার মধ্যে পুরুষ, সমুদ্রে জলবিন্দুর ন্যায়, কোথায় পড়িয়া থাকে। সাগরসঙ্গমে স্ত্রীলোকের ছেলে ফেলিয়া দেওয়ার অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—পুরুষে ফেলিয়াছে, এরূপ কথা কখন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই পাশ্চাত্যভাবপ্লাবিত বঙ্গদেশে আজিও যে দোলদুর্গোৎসব হয়, আজিও যে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে, হোমাগ্নি জ্বলে, দেবতা-ব্রাহ্মণের পূজা হয়, অতিথি-অভ্যাগতে একমুষ্টি অন্ন পায়, সে কেবল স্ত্রী-জাতির প্রসাদাৎ। বাবু নিজে দেবতা-ব্রাহ্মণের বড় একটা ধার ধারেন না, কিন্তু কি করেন—গৃহিণীর অনুরোধ—মহাগুরুর আজ্ঞা, না রাখিলে রক্ষা নাই।

রাজশক্তি সম্বন্ধে দেখ। পুরুষ যেমন সহজে রাজনিয়ম ভঙ্গ করে, স্ত্রীলোকে তাহা পারে না—তাহা করে না। যখন কোন দেশে রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন স্ত্রীলোকেরা প্রায় প্রতিষ্ঠিত রাজশাসনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী থাকে।

সমাজে দেখ। যত প্রকার সামাজিক শক্তি আছে, স্ত্রী-জাতি সকলের ভক্ত। ধন একটা সামাজিক শক্তি; এক্ষণে বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান শক্তি। স্ত্রী-চরিত্রে দেখিবে, ঐশ্বর্য্যোপাসনার ভাব অত্যন্ত প্রবল। প্রবল বলিয়া লক্ষ্মীপূজায় স্ত্রীলোকের এত ভক্তি, অনন্তব্রতে এত আসক্তি। কন্যার বিবাহ দিতে, পিতা দেখেন, বর কেমন—মাতা দেখেন, ঘর কেমন—পিতার ইচ্ছা পাত্রটি সুপাত্র হয়, সদ্বংশজাত হয়, সচ্চরিত্র হয়, লেখাপড়া জানে, মাতার কামনা—বিলক্ষণ বিষয়-আশয় থাকে, মেয়েটিকে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সোনা-রূপায় ঢাকিয়া দেয়। স্ত্রী-জাতি প্রচলিত যে সকল ব্রত



চিত্রাণী



পদ্মিনী

অনুষ্ঠানে 'কথা' শুনিবার রীতি আছে, তাহার সকল 'কথাতেই' শুনিবে, ঐশ্বর্য্যলাভই চরম ফল। জীমূতবাহন, ইথু, ষষ্ঠী—সকল অনুষ্ঠানেরই ইতিবৃত্ত বা কথায় শুনিবে, ব্রতধারিণী হয় রাজা হইল, নয় অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিল, নয় ঘরে লক্ষ্মী অচলা হইলেন। রবর্ট বর্টন একস্থলে লিখিয়াছেন—অনেক যৌবনশালিনী রূপসী বৃদ্ধ, বুদ্ধিহীন, বিকলাঙ্গ, অকর্ম্মণ্যের হাতে আপনাকে বিসর্জ্জন করে—হয় ত সে বাতে পঙ্গু, বিংশতি প্রকার পীড়ার আধার, এক চোখ কাণা, এক পা খোঁড়া, নাসিকার চিহ্নমাত্রাবশিষ্ট, মস্তকে চুল নাই, মস্তিষ্কে রস নাই, সততা নাই; কিন্তু জমীদারী আছে, টাকা আছে, সুতরাং তাহার সব আছে, সুতরাং সে সকলের অগ্রে প্রার্থনীয়। রূপ, যৌবন, সুখ্যাতি, যশ—যে রমণী কিছুতেই ভুলে না, সেও অনেক সময়ে অর্থে বশ হয়।

স্ত্রী-চরিত্রে দেখিবে, নীচের প্রতি ঘৃণা দৃঢ়সংবদ্ধ। তোমার প্রণয়িনী তোমার সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু তোমার নীচতা মার্জ্জনা করিবেন না। যে দিন তিনি তোমার নীচতা দেখিতে পাইবেন, সেই দিন নিশ্চয় জানিও, তাঁহার ভালবাসায় ভাঁটা ধরিয়াছে। তুমি যদি তাঁহাকে সহস্র অযত্ন কর, যদি তাঁহার প্রাণপণ প্রণয়ের বিনিময়ে তিনি তোমাকে একবার চক্ষের দেখাও দেখিতে না পান, একটু মুখের হাসির সংবর্দ্ধনাও না পান, যদি তাঁহার উদ্বেগপূর্ণ দিবস, নিদ্রাশূন্য রাত্রি অনুক্ষণ মর্ম্মদাহের বিনিময়ে 'কেমন আছ' বলিয়া একটা কথার কথাও না সুধাও, তবু তিনি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী দাসী হইয়া থাকিবেন; কিন্তু তুমি যদি তাঁহার অনাদৃত প্রণয়ের কথা লইয়া গর্ব্ব বা উপহাস কর, তাহা হইলে



নিশ্চয় জানিও, সেই দিন হইতে তিনি তোমার শত্রু। লেডী লিউসিনে আপনার অঙ্গের অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া প্রণয়ীর অমিতব্যয়িতার পোষকতা করিতে পারেন—লোকলাজ, কুলভয় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সহস্র অপকর্ম্ম করিতে পারেন, কিন্তু প্রণয়ীকে জালিয়াৎ জানিয়া আর তাঁহার চিত্তে চিত্ত বাঁধিয়া রাখিতে পারেন না। পশুপতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু মনোরমা তাঁহার হইতে চাহে না—বঙ্গের রাজ্ঞী হইবার জন্যও বিশ্বাসঘাতকের বামে বসিতে চাহে না। যে দিন কলঙ্কী জয়চন্দ্র যবনের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া ভারতের অধঃপতনের পথ পরিষ্কৃত করিতেছিল, সে দিন তাঁহার মহিষী বলিয়াছিলেন—

যবন আশ্রয় যদি প্রতিজ্ঞা তোমার,
তস্করের, পামরের, নীচের আশ্রয়—
কেশাগ্র দেখিতে মোর পাইবে না আর,
জনমের মত নাথ হইনু বিদায়।
বিধবা হইয়াছি যবে করিব শ্রবণ,
সেই দিন পুনর্ব্বার জনমের তরে,
একত্রে চিতার বক্ষে করিব শয়ন,
বক্ষে করি দেহ তব ডাকিব ঈশ্বরে—
এ জনমে এই শেষ, যেন জন্মান্তরে
বীরপতি করি তোমা সমর্পেন মোরে।

হিন্দুর মেয়ে, ইহার অধিক আর কি বলিবে?

সৌন্দর্য্য

যে হৃদয় চিরকাল শক্তি ও ক্ষমতার অনুরাগী, ভীরুতা এবং দৌর্ব্বল্য অবশ্যই তাহার বিরাগভাজন ও ঘৃণাস্পদ হইবে। সেই জন্য মুখচোরা, মেয়েমুখো পুরুষ স্ত্রীলোকেরও উপহাসের পাত্র। স্ত্রীলোকে যে বৃদ্ধ স্বামীকে ঘৃণা করে, তাহাও এই কারণে। বার্দ্ধক্য দৌর্ব্বল্যের আধার, বার্দ্ধক্য দ্বিতীয় শৈশব—অলস, অবশ, অসহায়, পরমুখাপেক্ষী, পরাধীন —শুতে পেলে বস্‌তে চাহে না, বসিলে উঠিতে চাহে না, উঠিলে চলিতে চাহে না। আহার করিয়া উঠিয়া এক প্রহর কাল হাঁপাইয়া মরে; আবার তামাক খাইয়া যেরূপ মারাত্মক কাসি কাসে, যে রকম সাংঘাতিক দম্ টানে, মনে হয় বুঝি বৈধব্য ঘটালে। বীর্য্যপক্ষপাতী রমণীহৃদয় কেন তাহাতে মজিবে? যুগে যুগে যে হৃদয় ক্ষমতা ও শক্তির পূজা করিয়া আসিয়াছে, সে হৃদয় অকস্মাৎ চিরন্তন সংস্কার ভুলিয়া জরা ও দৌর্ব্বল্যের উপাসনা কেন করিবে? নির্ব্বাণদীপের দশালগ্ন আলোক-বিন্দুতে ঘর আলো হইবে কি? কিন্তু তাই বলিয়া আমরা, যাঁহারা বৃদ্ধ-বয়সে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করি না; যাঁহারা করিবার ইচ্ছা রাখেন, তাঁহাদিগকেও ভগ্নোদ্যম করিতে চাহি না, কেন না, যাঁহারা বৃদ্ধ-বয়সে বিবাহ করেন, তাঁহারা প্রায় ভালবাসার কামনায় করেন না—অসময়ে কে করিবে, এই বলিয়া করেন। আর হিন্দুর মেয়ে, প্রাণের দায়ে না হউক, অন্ততঃ ধর্ম্মের দায়েও অসময়ে করিবে, অসময়ে দেখিবে। তবে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, বৃদ্ধ যদি ঠিক যুবা হইতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয়, যুবতী ভার্য্যার তত বিরাগ-ভাজন হইতে হয় না। বৃদ্ধের শরীরে যদি যৌবনের সজীবতা, চপলতা,

তেজস্বিতা, প্রফুল্লতা, ব্যগ্রতা, উদারতা, উদ্যমশীলতা, উৎসাহ-পূর্ণতা, আশা, পিপাসা, আসঙ্গলিপ্সা থাকে, তাহা হইলে রমণীহৃদয়ও বোধ হয় বার্দ্ধক্য ভুলিয়া বৃদ্ধের বশ হয়। তা, না বার মণ তৈলই পুড়িবে, না রাধাই নাচিবে।

এতক্ষণ আমরা যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, তাহা যদি সত্য হয়, যদি সত্যই নারীহৃদয় তেজস্বিতা ও শক্তির পক্ষপাতী হয়, যদি বাস্তবিকই নারীপ্রকৃতিতে সকল প্রকার দৌর্ব্বল্যের প্রতি অশ্রদ্ধা বদ্ধমূল থাকে, তাহা হইলে স্ত্রৈণ পুরুষদিগকে আমরা একটু সাবধান হইতে বলি। স্ত্রৈণতা মানসিক দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে নিজে অক্ষম, সেই অন্যের উপর নির্ভর করে; যে আপনার পথ আপনি দেখিতে পায় না, সেই পরপ্রদর্শিত পথে চলে। তাহার উপর আবার যে ব্যক্তি বর্ণজ্ঞানশূন্যা, সংসারবোধ-বিবর্জ্জিতা, অন্তঃপুরবদ্ধা, দূরদর্শনবঞ্চিতা স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহার ন্যায় দুর্ব্বলচেতা আর কে? পুরুষের দ্বারা স্ত্রীলোক পরিচালিতা, ইহাই স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক অবস্থা। পুরুষের উপর নির্ভর করিবার দিকে স্ত্রীপ্রকৃতির নৈসর্গিক টান। সুতরাং পুরুষকে স্ত্রীলোকের আঁচলধরা হইতে দেখিলে স্ত্রীলোকে অবশ্যই তাহাকে মনে মনে অবজ্ঞা করিবে। যাঁহারা মনে করেন যে, স্ত্রীর কাছে 'রামবল্লভ' হইয়া থাকিলে এবং স্ত্রীর সকল কথায় মোসাহেবের মতন 'আজ্ঞা হাঁ' করিলেই বড় ভালবাসিবে, তাঁহারা বড় ভ্রান্ত। রামবল্লভ শ্রেণীর পুরুষকে কস্মিন্‌কালে কোন স্ত্রীলোক ভালবাসিতে পারে না—তাহা তাহাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তবে, আপনার প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য হয়

ত বেশ খাতির-যত্ন করিবে, ধর্ম্ম ভাবিয়া হয় ত বাহিরে শ্রদ্ধা করিবে; কিন্তু যাহার নাম ভালবাসা, যে মর্ম্মান্তিক নেশায় অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত বিভোর হইয়া থাকে, তাহা কস্মিন্‌কালে কোন রামবল্লভ কোন স্ত্রীলোকের নিকট পায় নাই, পাইবে না।

সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি বাহ্য-লক্ষণ দেখিয়া অন্তরের ভাব অতি সুন্দর অনুভব করিতে পারে। অসভ্যাবস্থায় এই শক্তির অনুশীলন এবং বিকাশ তাহাদের জীবনরক্ষার জন্য আবশ্যক হইয়াছিল। সে সময়ে যে স্ত্রীলোক স্বামীর বা আশ্রয়ীভূত পুরুষের ক্ষুদ্র একটু অঙ্গ-সঞ্চালন, ক্ষুদ্র একটু কণ্ঠস্বর, অতি সামান্য একটু মুখের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের উদীয়মান বেগ তৎপরতার সহিত বুঝিতে পারিয়াছে, সে অনেক বিপদ্ এড়াইতে পারিয়াছে। দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন,—"স্ত্রীলোকের সহজ জ্ঞান অধিক এবং পুরুষের বিচারশক্তি অধিক। যে সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের সহজাত সংস্কার আছে, সে বিষয়ে যদি আমরা স্ত্রীলোকের পরামর্শ লইয়া চলি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ সংসার সুখের হয়। যে সকল স্থলে স্ত্রীলোকের অনুগমন পুরুষের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে, সেই সকল স্থলেই আমরা তাহা করি বলিয়াই দৈনন্দিন জীবনে এত উৎপাত, সংসারে এত বিভ্রাট।

স্ত্রীলোক পুরুষের অপেক্ষা অনেক অগ্রে পরিপক্কতা বা যৌবন প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত বিকাশ পুরুষের অনেক অগ্রে সংরুদ্ধ হয়—স্ত্রীলোক পঞ্চদশ বৎসরেই যুবতী, পুরুষ বিংশতি বৎসরেও বালক। কেন এরূপ হয়? ইহার কারণ এই যে, স্ত্রীলোককে গর্ভধারণ করিতে

হয় বলিয়া কতকটা জীবনী-শক্তি সঞ্চয় করা তাহাদের পক্ষে আবশ্যক. যে জীবনী-শক্তি দ্বারা পুরুষের শারীরিক বিকাশ অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্য্যন্ত চলিতে থাকে এবং যাহা সেই বিকাশে ব্যয়িত হয়, স্ত্রীলোককে গর্ভধারণের জন্য সেই জীবনী-শক্তি সঞ্চয় করিতে হয় এবং সেই জন্য তাহাদের শারীরিক বিকাশ অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়সে বন্ধ হইয়া যায়, এরূপ না হইলে গর্ভধারণ সম্ভব হয় না। ইহার অব্যবহিত ফল এই যে, কর্ম্ম-শীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কর্ম্মপরিচালক মস্তিষ্ক, উভয়ই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কতক পরিমাণে ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল। এতন্নিবন্ধন স্ত্রীলোকের মানসিক বৃত্তিনিচয় পুরুষের ন্যায় বিপুলতাসম্পন্ন নহে, অর্থাৎ ঐ সকলের সাধারণ সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার আধ্যাত্মিক ফল এই যে, বস্তু-বিশেষের সম্বন্ধাতীত বিচারশক্তি স্ত্রীলোকের বড়ই দুর্ব্বল; দূরবর্ত্তী ফলাফলে লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা কার্য্য করিতে পারে না। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, সন্তানের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী জননীও পীড়িত শিশু পুত্রটির রোদন বন্ধ করিবার জন্য অনায়াসে আপন হাতে করিয়া কুপথ্য দিয়া থাকেন—চিকিৎসকের নিষেধ রক্ষা করিতে পারেন না। ন্যায়পরতার ভাব স্ত্রীচরিত্রে অত্যন্ত হীন—স্ত্রীলোকে আপন ব্যবহারকে আপন আপন অনুরাগ-বিরাগ হইতে বিমুক্ত করিতে পারে না—যে প্রীতিভাজন, তাহার কোন দোষ দেখে না; যে অপ্রীতিভাজন, তাহাতে কোন গুণ দেখিতে পায় না।

চিরকাল স্ত্রীজাতিকে পুরুষের মন রাখিয়া চলিতে হইয়াছে, মন পাইবার জন্য যত্ন করিতে হইয়াছে—শরীর সাজাইয়া নয়ন ভুলাইতে,

বাক্যবিন্যাসে কর্ণ জুড়াইতে, হাসি-চাহনিতে মন মজাইতে, সেবা দ্বারা চিত্ত বশীভূত করিতে হইয়াছে। এখন দেখিতে পাই, স্ত্রীচরিত্রে এই সকল ভাবের বড়ই আধিপত্য—সংস্কারবশতঃ যাহা বদ্ধমূল হইয়াছে, উত্তরাধিকার-নিয়মে তাহা এখনও বিদ্যমান এবং প্রয়োজনবশতঃ আজিও দেদীপ্যমান। সেই জন্য আজিও স্ত্রীচরিত্রে পুরুষ ভুলাইবার, পুরুষ মজাইবার উপযোগী চেষ্টা অত্যন্ত বলবতী—নানাবিধ বিলাস-বিভ্রমের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ। সেই জন্য স্ত্রীলোকের চরণে অলক্তক, কটিতে কিঙ্কিণী, অধরে মিসি, নয়নে কজ্জল, খোঁপায় ফুল, কানে দুল, অপাঙ্গে কটাক্ষ, বচনে সুধা। সেই জন্যই আজকালকার পটের বিবিরা পাউডার মাখিতে ব্যস্ত, গৃহ-কর্ম্মে ত্রস্ত, সংসারধর্ম্মে উদাসীন—কেবল ইচ্ছা, এই সংসার-উদ্যানে গোলাপ হইয়া ফুটিয়া থাকেন, আর লোকে যেন তাঁহাদের রূপ দেখিয়া পাগল হয় এবং হায় হায় করিয়া মরে। সেই জন্যই ইউরোপীয় সুন্দরীর ক্ষীণমধ্যা হইবার জন্য কটিপীড়ন, মুখে কৃত্রিম রঞ্জন, মাথায় পরচুলা। সেই জন্য অসভ্যাবস্থায় রমণীদিগের সর্ব্বাঙ্গে উল্কি এবং চীন-দেশীয় সুন্দরীদিগের সুকোমল পদে লৌহপাদুকা। সেই জন্যই স্ত্রীলোকে প্রতিবেশিনীর রূপের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না এবং সেই জন্যই আপনার বয়স লুকাইবার অভিপ্রায়ে শত মিথ্যা কথা বলে। সেই জন্যই স্ত্রীলোকের অলঙ্কারের জন্য এত লালসা—কর্ণভূষার দায়ে কান ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, তবু তাহা না পরিলেই নয়—সহজে পরা অসাধ্য হইলে চুলের সঙ্গে বাঁধিয়াও পরিবে। যে সুন্দরী কাকের ডাক শুনিলে মূর্চ্ছা যান, তিনিও অলঙ্কার বলিয়া আধ মণ সোনার ভার বহন করিতে অতিমাত্র ব্যগ্র।



বহু যুগব্যাপী এই চেষ্টা ও শিক্ষার ফলে প্রীতি আকর্ষণের উপযোগী গুণসকলও স্ত্রীজাতি উপার্জ্জন করিয়াছে। স্ত্রীলোকের কথাবার্ত্তা, ভাব-ভঙ্গী, ব্যবহার, মানসিক প্রকৃতি, সকলই প্রীতি আকর্ষণের উপযোগী ;—কণ্ঠস্বর মধুর, অঙ্গবিন্যাস ললিত, কথাবার্ত্তা কোমল, ব্যবহার আনুগত্য-আপ্যায়িততা-পরিপূর্ণ। পিতা-মাতার পীড়া হইলে, শিশু পুত্রটি একবারও তাহার খেলাধূলা ভুলে না, হয় ত একবারও কাছে আসিয়া বসে না, কাছে আসিয়া দেখে না; কিন্তু শিশু কন্যাটি রুগ্নশয্যাতলে বসিয়া তাহার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সেবা করিতে ত্রুটি করে না। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, কন্যার কর্ত্তব্যজ্ঞান অধিক অথবা খেলাধূলায় আসক্তি অল্প ;—ইহা স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিগত বিভিন্নতার নিদর্শন। বয়সের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পার হইলে পুরুষে আর নূতন বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিতে পারে না; স্ত্রীলোকে সমস্ত জীবন ভরিয়া তাহা পারে। কেন না, পরানুগত্যের ভাব তাহাদের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল। এই কারণেই বোধ হয়, স্ত্রীলোক অনভ্যস্ত নূতন অবস্থায় পড়িলে তাহারই সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে—যে কোন সংসর্গে পড়ুক না কেন, ইচ্ছা থাকিলে বনিবনাও করিয়া চলিতে পারে। এক বয়সের স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে দেখিবে, স্ত্রীলোক অধিকতর সুস্পষ্ট, পরিষ্কার ও ধারাবাহিকরূপে কথা কহিতে পারে। ইতর-জাতীয় কোন পুরুষ এবং তাহার পত্নী যদি একত্র তোমার কাছে কোন জিনিস বিক্রয় করিতে, পরামর্শ লইতে বা অভিযোগ করিতে আইসে, তাহা হইলে দেখিবে যে, স্ত্রীটিই দরদাম করে বা বক্তব্য কথা-গুলি বলে, তাহার স্বামী নীরবে পার্শ্বে বা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকে,—

ঢাকের বামার মত, সঙ্গে থাকিতে হয়, তাই থাকে, কিন্তু কোন কাজে লাগে না।

স্ত্রীজাতি ভাবপ্রধান, পুরুষ জ্ঞানপ্রধান—পুরুষের হৃদয় তাহাদের জ্ঞানের দ্বারা শাসিত, স্ত্রীলোকের জ্ঞান তাহাদের হৃদয়ের কাছে নগণ্য। বিচারশক্তির হীনতা এবং হৃদয়ের প্রবলতা স্ত্রীচরিত্রে নানারূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ত্রীলোক কোন বস্তুলাভের জন্য বা কোন কার্য্য করিবার জন্য লালসা-বতী হইলে, তুমি কোন প্রকারে তাহাকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। তুমি হাজার বুঝাও, হাজার তর্ক-যুক্তি প্রদর্শন কর, হাজার বিঘ্ন-বাধা নির্দ্দেশ কর, কিছুতেই বুঝিবে না, কিছুতেই মানিবে না। তোমার গৃহিণীর যদি একখানি নূতন অলঙ্কার লইবার সাধ হয়, তাহা হইলে যতক্ষণ তাহা না পাইবেন, ততক্ষণ তোমায় ছাড়িবেন না—তোমার অর্থাভাব এবং ঋণদায়ের কথা মনে করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না; দশ দিন পরে দিব বলিলেও শুনিবেন না। সহজে না পাইলে কাঁদিবেন-কাটিবেন, চুল ছিঁড়িবেন, মাথা ভাঙ্গিবেন। দিবা-রাত্রি কানের গোড়ায় ঘ্যান-ঘ্যান করিয়া হাড় জ্বালাতন করিয়া তুলিবেন। স্ত্রীলোক শ্রীক্ষেত্রে যাইতে উদ্যত হইলে কে কবে তাহাকে পথক্লেশের কথা বলিয়া নিরস্ত করিতে পারিয়াছে? ইহার অর্থ এই যে, স্ত্রী-হৃদয় এমনই বেগশালী যে, অভিলাষের গতি তাহারা ইচ্ছা করিলেও রোধ করিতে পারে না। এই জন্যই মহাকবি কালিদাস উমার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।"

সৌন্দর্য্য

বাস্তবিকই স্ত্রী-চরিত্রে স্ত্রীহৃদয়ের এমনই একাধিপত্য যে, সে হৃদয় আবেগসংক্ষুব্ধ বা আকাঙ্ক্ষান্বিত হইলে তাহা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে—উচ্ছ্বসিত তরঙ্গিণীর ন্যায় যাহা সম্মুখে পড়ে, তাহাই ভাসাইয়া লইয়া যায়—বিঘ্ন-বাধা কিছুই মানে না, কিছুতেই সে রোধ হয় না। জনক-নন্দিনী সীতা আদর্শ হিন্দু-ললনা। তিনি রাজার দুহিতা, রাজার বধূ, রাজার মহিষী; আশৈশব রাজভোগে অভ্যস্তা, রাজসুখে লালিতা—ছার সোনা রূপা তাঁহার চক্ষে আবর্জ্জনার ন্যায়, পথের ধূলির ন্যায় অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবারই কথা। সেই সীতা কি না একটা সামান্য সোনার মৃগের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না; প্রকৃত মৃগ যে কখন সোনার হয় না, ইহাও বুঝিলেন না। না পারিয়া না বুঝিয়া, কি দারুণ ঘটনাই ঘটাইলেন, কি বিষম কাণ্ডই না বাধাইলেন! এইরূপ সর্ব্বত্র। আজ এই বাঙ্গালা দেশে দেখিতেছি, ঘরে ঘরে বন্ধুবিচ্ছেদ হইতেছে, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হইতেছে, উপযুক্ত পুত্র মাতাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে, পরস্পর কলহ করিয়া কত সোনার সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে, কত সমৃদ্ধ গৃহস্থ এক মুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল হইয়া পড়িতেছে, এ সকল অনর্থের মূলই স্ত্রীলোক। আমরা তিন চার পাতা ইংরেজী পড়িয়া স্ত্রীকে ইষ্টদেবতার অধিক করিয়া তুলিয়াছি, স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছি বলিয়াই ত এত বিভ্রাট। এই জন্যই ত দূরদর্শী পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন,—"স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী।"

স্ত্রী-চরিত্রে দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকের হৃদয় অতিমাত্র বেগশালী এবং তাহাদের বিচার-শক্তি অতিমাত্র দুর্ব্বল। স্ত্রীহৃদয় এইরূপ প্রবল, বেগশালী

ও দুর্দ্দমনীয়, স্ত্রীলোকের বিচারশক্তিও এইরূপ দুর্ব্বলা এবং মানসিক বলও সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর। দূরদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, তত্ত্বদর্শী শাস্ত্রকারেরা ইহা বুঝিতেন বলিয়াই হিন্দুসমাজে স্ত্রীলোকের জন্য এত সাবধানতা। সেই জন্যই তাঁহারা বিধান করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক চিরদিনই কাহারও না কাহারও বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে। তাহাদিগকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে দেওয়া অবিধেয়। আপন বুদ্ধিতে চলিতে দিলেই তাহারা একটা-না-একটা অনিষ্ট ঘটাইয়া বসিবে। এই জন্যই শাস্ত্রের বিধান,—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাশ্চ স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥"

স্ত্রীলোক পুণ্যপথাবলম্বিনী হইলে স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত না গিয়া নিবৃত্ত হয় না। পক্ষান্তরে, পাপের পথে একবার পদার্পণ করিলে, তাহার চরম সীমায় না গিয়া ছাড়ে না।

মাদাম দে স্তেল বলিয়াছেন,—ভালবাসা পুরুষের জীবনে একটা প্রসঙ্গাতীত উপকথা (episode); স্ত্রীজীবনের ইহা সম্পূর্ণ ইতিহাস। প্রেমের পাত্র পুরুষের অনেকটা আনন্দ বা সুখসংবর্দ্ধন মাত্র; কিন্তু স্ত্রীলোকের জীবনাবলম্বন। বিরহে পুরুষ একটা সুখে বঞ্চিত হয়; কিন্তু স্ত্রীলোক একবারে অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়ে। তাই বিরহে পুরুষ অস্থির হয় মাত্র; স্ত্রীলোক একবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে—সংশ্রয়-তরু-চ্যুত ব্রততীর ন্যায় মাটীতে পড়িয়া মাটী হইয়া যায়। কালে পুরুষ বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করিয়া, সংসারের সহস্র কর্ত্তব্য, সহস্র আকর্ষণের মধ্যে, প্রিয়জনের

বিরহ প্রায় ভুলিয়া যায় ; কিন্তু স্ত্রীলোক এক সেই ধ্যান ধরিয়া, শুকাইয়া শুকাইয়া, অবশেষে মরিয়া যায়। এই মহাবহ্নিতে পুরুষ দগ্ধ হয় বটে, কিন্তু সেই স্ত্রীলোক একেবারে ভস্ম হইয়া যায়। সেই জন্য বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই সুব্যবস্থা,—পতির অভাব জগৎপতিকে দিয়া পূর্ণ করিতে হয়। তাঁহার ন্যায় পতি আর কে?—তাঁহার ন্যায় অবলম্বন আর কি আছে?

চিরকাল পুরুষের কার্য্য—সমাজসেবা ; স্ত্রীলোকের কার্য্য—গৃহসেবা। বহুযুগ ধরিয়া পুরুষ দূরস্থ ও অপ্রত্যক্ষাবলম্বী ; স্ত্রীজাতি বিদ্যমান ও প্রত্যক্ষ-পরায়ণা ! ইহার ফল, যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। পুরুষের হৃদয়ের বিস্তার বা প্রশস্ততা অধিক ; স্ত্রীহৃদয় সংকীর্ণ। স্ত্রীলোক পাপকে ঘৃণা করিয়া পাপীকে অনুকম্পা করিতে পারে না। সঙ্কীর্ণ বলিয়া, সে হৃদয়ের গভীরতা পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক। তাই স্ত্রীলোক যাহাকে ভালবাসে, তাহার কাছে বিনা মূল্যে বিকাইয়া যায়। পুরুষও ভালবাসে, কিন্তু বিকায় না। তাই প্রণয়ে স্ত্রীলোক মজে ; পুরুষ মজে না—কেবল ভজে মাত্র। তাই পুরুষের ভালবাসা ব্যক্তিবিশেষের উপর অধিক থাকিলেও, অন্যে তাহাতে একেবারে বঞ্চিত হয় না ; স্ত্রীলোকে ভালবাসিলে সমস্ত জগৎ তাহার কাছে লোপ হইয়া যায়—পুরুষ আত্মবিস্মৃত হয় না ; কিন্তু স্ত্রীলোক আত্মহারা হয়—আপনাতে আর আপনি থাকে না। তাই প্রেমের জন্য স্ত্রীলোক সর্ব্বত্যাগিনী হইতে পারে ; পুরুষ তাহা পারে না। তাই পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বহুজনবল্লভ ; কিন্তু রমণী রাধিকা কৃষ্ণৈকশরণা, কৃষ্ণৈকপ্রাণা। তাই হিন্দুসমাজে পুরুষের দেবতার সংখ্যা নাই ;



স্ত্রীলোকের একমাত্র দেবতা—স্বামী; কেন না, স্ত্রীহৃদয় এক সময়ে একের অধিক দেবতার সেবা করিতে পারে না। সেই জন্যই প্রেমে পুরুষ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয় না, স্ত্রীলোক কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়, কেন না, তখন তাহার কাছে অন্য কর্ত্তব্যের আর অস্তিত্বই থাকে না।

ভিক্টর হিউগো তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাসে এই মূর্ত্তিটির উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রেমের প্রথম সঞ্চারে পুরুষ কথঞ্চিৎ ভীরুতার অধীন হয়, কিন্তু স্ত্রীলোক একটু সাহসী হইয়া উঠে, একটু অগ্রগামিনীত্ব প্রাপ্ত হয়।

স্ত্রীলোকের বিবেচনা-শক্তি দুর্ব্বলা বলিয়া গভীর হৃদয়ের সে উচ্ছ্বাসে তাহার সমস্ত সত্তা ভরিয়া বা ডুবিয়া যায়—পুরুষ বিবেচনার শাসনে ইতস্ততঃ করে; স্ত্রীলোক হৃদয়ের আবেগে ছুটিয়া ধরিতে চায়। একজন যে বেগে সাবধানচারী, আর একজন সেই বেগেই বিবশা, আত্মহারা।

স্ত্রী-হৃদয় দুর্দ্দমনীয় বেগবান্ এবং অন্তর্লীন বলিয়া স্ত্রীলোকের প্রতিহিংসা অতি ভয়ঙ্কর পদার্থ। স্বভাবকোমলা স্ত্রীজাতি প্রতিহিংসা-প্রণোদিতা হইলে ব্যাঘ্রীর অপেক্ষাও ভীষণা ও ভয়ঙ্করী হইয়া উঠে—সে নবনীতসুকুমার স্নেহপরিপ্লুত হৃদয় প্রস্তরবৎ কঠিন ও নির্ম্মম হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া বৈর-নির্য্যাতনের জন্য স্ত্রীলোকে না করিতে পারে, হেন কর্ম্মই নাই; তখন তাহার অসাধ্য আর কিছুই থাকে না। উপরন্তু, স্ত্রীলোকের ন্যায়বুদ্ধি স্বভাবতই দুর্ব্বলা বলিয়া তখন স্ত্রীলোক পাত্রাপাত্র ভেদ করিতে পারে না, অপরাধী

নিরপরাধী তারতম্য করিতে সমর্থ হয় না—সেই ভীষণ প্রবৃত্তিস্রোতে আপনি ভাসিয়া যায় এবং যাহা সম্মুখে পায়, তাহাই ভাসাইয়া লইয়া যায়। মহাভারত-বর্ণিত অম্বার প্রতিহিংসা ইহার একটি অতি সুন্দর, মনোহর, গভীরার্থপূর্ণ অথচ লোমহর্ষণকর দৃষ্টান্ত।

সপত্নীর উপর বিদ্বিষ্টা হইয়া স্ত্রীলোকে স্বামীর সর্ব্বনাশ করিল, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অবৈধ প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় নিরাশ হইয়া ব্যভিচারিণী আপন প্রণয়পাত্রকে বধ করিল, এরূপ সচরাচরই ঘটিয়া থাকে। এই জন্য অবিশ্বাসিনী স্ত্রীলোককে কখনই গৃহে স্থান দেওয়া বিহিত নহে। সে তাহার পাপলালসায় বাধা পাইলে না করিতে পারে, হেন কর্ম্মই নাই।

সচরাচরই দেখিবে যে, স্ত্রীলোকে কর্ত্তব্যের অবহেলা করিয়া দয়াব সেবা করিতেছে। উত্তমর্ণের প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করিতেছে না, অথচ দয়াপরবশ হইয়া দান করিতেছে। যাহা সর্ব্বাগ্রে এবং অবশ্য দেয়, তাহা না দিয়া, অনুগ্রহের বিতরণে মুক্তহস্তা হইতেছে। ইহাও বোধ হয়, সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মাতার স্নেহ পুত্র অপেক্ষা কন্যার উপর অধিক হয়। পুত্রের জিনিস, পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া গোপনে কন্যাকে দিয়া থাকেন অথচ তজ্জন্য কোন প্রকার কুণ্ঠা অনুভব করেন না—এটা যে অন্যায় হইতেছে, ইহা তাঁহার মনে উদয়ই হয় না। বধূর সহিত কন্যার কলহ হইলে, দোষ যাহারই হউক, মাতা কিন্তু কন্যার পক্ষই অবলম্বন করেন—বধূ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, কন্যারই যত দোষ, ইহা জানিয়াও তাহার পক্ষ হইয়া বধূকে অন্যায় তিরস্কার করিবেন। শুদ্ধ ইহাই নহে, ইহাও দেখিবে যে, কৃতী পুত্র অপেক্ষা অক্ষম পুত্রের উপর জননীর স্নেহ অধিক।



স্ত্রীলোক দয়াবতী বটে; কিন্তু দয়াপ্রকাশে তাহারা পুরুষের ন্যায় উদার ও দূরদর্শী নহে। আডাম স্মিথ্ এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক পুরুষের অপেক্ষা সাধারণতঃ করুণহৃদয় হইলেও পুরুষের ন্যায় বদান্য হইতে পারে না। বিপুল দান করিতে স্ত্রীলোককে কদাচিৎ দেখা যায়।

পুরুষে পুরুষে একত্র হইলে আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের সকল বক্তব্য কথা ফুরাইয়া যায়। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে একত্র হইলে দিন-রাত অবিরাম চলিতে থাকে, বাক্যস্রোতঃ অনর্গল বহিতে থাকে। স্ত্রীলোকের রসনাকণ্ডূয়ন বলিয়া যে একটা অপবাদ আছে, সেটা মিথ্যাও নহে, অমূলকও নহে। স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় তত্টা সত্যশাসিতা ও সত্যানুরাগিণী নহে।

স্ত্রীজাতির আর একটা কলঙ্ক এই যে, তাহাদের পেটে কথা থাকে না; গোপনীয় কথা তাহারা গোপন রাখিতে পারে না। ইহার কারণ স্ত্রীলোকের অদূরদর্শিতা।

সংসারের সাধারণ ভার লইয়াছে পুরুষ, বিশেষ ভার লইয়াছে স্ত্রীলোক। একে অপরের ভার লইতে গেলে কাহারও কার্য্য ভাল হইত না—অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত, সমাজের দারুণ অনিষ্ট সংসাধিত হইত।

গৃহস্থালী পরিচালনায় স্ত্রীলোকদিগের আর একটা বিশেষ উপযোগিতা এই যে, তাহারা মনুষ্যচরিত্র বুঝিতে পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর তৎপরা এবং বাহ্যলক্ষণ দেখিয়া সত্বর ও সুন্দররূপে চিত্তভাব বুঝিতে পারে। এই জন্য দেখা যায় যে, পরিবার যত কেন বৃহৎ হউক না, সে পরিবারের

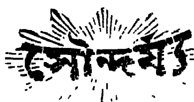
মধ্যে যদি একজন পাকা গৃহিণী থাকে, তাহা হইলে কলহ-বিরোধ শীঘ্র উপস্থিত হয় না, এবং গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়া যায় না। গৃহস্থালীর ভার পুরুষে লইলে তাহার অব্যবহিত ফল—পারিবারিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা; দূরবর্ত্তী ফল—গৃহস্থালীর ধ্বংস।

বহির্জ্জগতের ধারাবাহিক সংগ্রাম যেমন স্ত্রীলোকের দ্বারা সুসম্পাদিত হইতে পারে না, গৃহাভ্যন্তরস্থ বিশেষ সংগ্রামেও তেমনি পুরুষ কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার ভার যাঁহাদিগের হাতে, তাঁহাদিগের বুঝা উচিত যে, স্ত্রী এবং পুং-প্রকৃতি ঠিক এক নহে, স্ত্রী-পুরুষের কার্য্যক্ষেত্রও এক নহে; সুতরাং স্ত্রী এবং পুরুষকে যে একই প্রণালীতে, একই বিষয়ে, একই পরিমাণে শিক্ষিত করিতে হইবে, ইহা অসঙ্গত। তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, স্ত্রী-পুরুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির মধ্যে প্রভেদ বিস্তর; মনে রাখিতে হইবে যে—পুরুষ সামর্থ্য, স্ত্রীলোক সৌন্দর্য্য; পুরুষ জ্ঞান, স্ত্রীলোক ভক্তি; পুরুষ সন্দেহ, স্ত্রীলোক বিশ্বাস; পুরুষ উৎসাহ, স্ত্রীলোক সহিষ্ণুতা; পুরুষ বুদ্ধি, স্ত্রীলোক হৃদয়; পুরুষ ভোগ, স্ত্রীলোক যোগ; পুরুষ লীলা, স্ত্রীলোক সন্ন্যাস; পুরুষ অহঙ্কার, স্ত্রীলোক বিনয়; পুরুষ আত্মগত, স্ত্রীলোক আত্মবিস্মৃত; পুরুষ কর্ম্ম, স্ত্রীলোক ধর্ম্ম; পুরুষ অমরাবতী, স্ত্রীলোক বৈকুণ্ঠ। একজনের বীজমন্ত্র আত্মসমর্থন, আর একজনের বীজমন্ত্র আত্মনিমজ্জন। স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিতে নৈসর্গিক প্রভেদ যখন একটা আছে, তখন উভয়ের শিক্ষা যে একরূপ হওয়া উচিত নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

পরিতাপের কথা এই যে, আমাদের উন্নতিশীলেরা এবং সংস্কারকেরা স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিগত বিভিন্নতার কথাটা আদৌ বিবেচনা করেন না। বিলাতী জড় সভ্যতার বাহ্য চাক্‌চিক্যে জানি না, কি কুহক আছে, কিন্তু তাহারই মোহে পড়িয়া তাঁহারা প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, ঈশ্বরের বিধান ব্যর্থ করিবার জন্ত দুরাকাঙ্ক্ষী, স্ত্রীলোককে পুরুষ করিবার জন্ত বড় ব্যগ্র। ঈশ্বর যাহাকে ভাবপ্রধান করিয়াছেন, তাহাকে তাঁহারা জ্ঞান-প্রধান করিতে চাহেন; ঈশ্বর যাহা দয়া দিয়া গড়িয়াছেন, তাহাতে ন্যায়ের খাদ্ মিশাইতে চাহেন; ঈশ্বর যাহাকে উত্তরসাধক করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাকে শবসাধক করিতে চাহেন। ভাবিতে গেলে আতঙ্ক উপ-স্থিত হয়। প্রকৃতির কুসুম আর ভাল লাগিতেছে না, তাহাকে হামিল্‌-টনের বাড়ীর গিল্‌টি-করা যেন চাই। প্রকৃতির রুদ্রাক্ষমালাকে মানুষের স্বুবর্ণ-কেয়ূরে পরিণত করিয়া যে কি লাভ, আমরা তাহা ত বুঝিতে পারি না। নিসর্গ-তপস্বীর ধ্যানভঙ্গ করা ব্যতীত আমাদের কি আর কোন কার্য্য নাই? অথচ প্রতিনিয়ত আমরা সেই চেষ্টাই করিতেছি। আমাদের কি দারুণ দুর্ম্মতি বল দেখি?

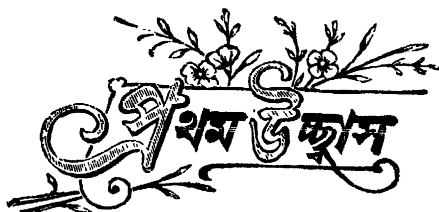
স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা ত কিছু নাই। সংসারের এ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে একজন আর একজনের সহায়, প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। বিশ্বকার্য্য, দেব কার্য্য,—উভয়ের সহযোগিতা ব্যতীত প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। একের অভাব অন্যের দ্বারা পূর্ণ করিয়া, একের জ্ঞানে অন্যের অনুরাগ মিশাইয়া, একের উৎসাহে অন্যের সহিষ্ণুতা সংযোগ করিয়া কার্য্য করিলেই দেবকার্য্য সুসম্পাদিত হয়। উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা



হইলেই বিশ্বকার্য্যের ব্যাঘাত। এই প্রতিযোগিতার আমরা প্রশ্রয় দিতেছি বলিয়াই আমাদের দেশে আজকাল এত সজল নয়ন, এত মলিন বদন, এত হতাশ প্রাণ, এত নিষ্ফল জীবন। প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিলে আমাদিগকে এত বিষাদনিশ্বাস, এত হাহাকার শুনিতে হইত না। প্রতি-যোগিতার প্রয়োজন নাই, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়, আইস, সকলে মিলিয়া সেই চেষ্টা করি। তাহা হইলেই প্রকৃতির লক্ষ্য আয়ত্তীকৃত হইবে, নতুবা হইবে না। সেই লক্ষ্যকে বিশ্বপতির মহিমা-ঘোষণাই বল, আর প্রাকৃতিক বিবর্ত্তই বল, তাহার অর্থ—সৌন্দর্য্য, শক্তি, পবিত্রতা, প্রফুল্লতা। তাহার অর্থ—সুখ, শান্তি, জ্ঞান, প্রেম। তাহার অর্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, স্বর্গ, অপবর্গ। তাহার অর্থ—মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব। স্ত্রী-পুরুষের সহযোগিতাতেই এই মহান্ লক্ষ্য আয়ত্ত হইবে।

চতুর্থ লহরী

বর্ণন



লেখক—শ্রীঅমৃতলাল বসু

সৌন্দর্য্য

সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য; বিশ্বরাজ্যে সৌন্দর্য্যই বিধাতার প্রথম ও প্রধান দান; এই সংসার-সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়াই জগদীশ্বর জীবের জীবনভার মধুময় করিয়াছেন। ঊষার সীমন্তে সুন্দর সিন্দূর-তিলক দেখিয়াই সদ্যোজাত শিশুর শুদ্ধ অধরে হর্ষের হাসি প্রথম বিকসিত হয়; শশধরকরোজ্জ্বল, তারাদলে ঝমমল নিশার আকাশ তাহার জীবনপ্রবাহিনীর ক্ষীণধারায় আনন্দের লহরমালার সৃষ্টি করে। মমতামণ্ডিত মাতৃ-মুখ-মণ্ডলের অতুল সৌন্দর্য্য শিশুর সদ্যস্ফুট প্রাণকে প্রথম মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে।



জগৎ জুড়িয়া, জগৎ ব্যাপিয়া, জগৎ ছাইয়া সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া রহিয়াছে সৌন্দর্য্য সকলেই ভালবাসে। ধারা-ধৌত শরতের ধরণী যখন সন্ধ্যা-সমাগমে ফুল-ভূষায় ভূষিত হইয়া সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে থাকেন, বিচিত্র রঞ্জিত মেঘাম্বর-পরিহিত সুন্দর অন্তরীক্ষ তখন সেই শোভা নিরীক্ষণ করিতে থাকে; গভীর নিশীথে সুনীল সলিলরাশি যখন শুভ্র ফেনহার-রাজিতে সাজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া নাচিতে থাকে, তারাগণ তখন ছায়ারূপে সেই রূপ সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কুসুমের সুষমায় বিমোহিত হইয়া পতঙ্গ ফুলের অঙ্গে ঢলিয়া পড়ে, আর পতঙ্গের রূপতরঙ্গে প্রাণ ভাসাইয়া ফুল আপনার সর্ব্বস্ব উপহার তাহাকে দেয়। তরুর রূপে লতা মুগ্ধ, আবার লতার রূপজালে তরু আপনাকে আবৃত করিয়া ফেলে। এইরূপ কি জড়জগতে, কি জীবরাজ্যে, কি উদ্ভিদ-উদ্যানে, কি সলিলসম্ভারে, কি নক্ষত্রনিকরে যে দিকে ফিরাই আঁখি সে দিকেই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের ছটা—অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের ঘটা। সৌন্দর্য্যই মানবকে কবি করিয়াছে, প্রেমিক করিয়াছে, পাগল করিয়া রাখিয়াছে। মানুষ আরাধনা করিতে শিখিল, পূজা করিতে শিখিল, সৌন্দর্য্য দেখিয়া, সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া। যখন কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তখন সেই জাতি সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে, সুন্দরের আদর, সুন্দরের উপাসনা করিতে শিক্ষা করে। একদিন —আহা সে বহুদিনের কথা—একদিন ভারতবাসী আর্য্যগণ সেই উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়া কবিতার স্বর্গীয় সুধারসে বসুমতী প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। সৃষ্ট দৃষ্ট জগতে সৌন্দর্য্যের বিচিত্র বৃষ্টি দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে

সৌন্দর্য্য

সুন্দরের সুন্দর পরম-সুন্দররূপে অনুভব করিতে শিখিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বুঝিয়া, সেই সৌন্দর্য্যের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে শিখিয়াই, সূর্য্যসোম, বহ্নিবৃক্ষ, গিরিনদী প্রভৃতিকে দেবসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া, কুসুমচন্দনে কবিতাময় স্তুতিগানে ইহাদের পূজা করিতেন। সুন্দরকে সুন্দরতর করিয়া সাজাইয়া আরাধনা করিতে ভালবাসিতেন বলিয়াই প্রাণে অনুভূত, বচনে ব্যক্ত কবিতাকে প্রত্যক্ষ করিবার পিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছিল; তাই আলেখ্যপটে পাষাণ ও মৃন্ময় প্রতিমায় বনমালা-বিভূষিত শিরে শিখি-পাখা-শোভিত শ্যামসুন্দর মূর্ত্তির আবির্ভাব! তাই শ্মশানবিহারী রজত-বরণ নীলকণ্ঠও ফণিফণাভূষিত ভালে শশিশোভিত বক্ষে অক্ষমালা বিরাজিত অপূর্ব্ব সুন্দর যোগী! সেই জন্যই জগজ্জননীর কাঞ্চনকমল-লাঞ্ছিত অঙ্গে এত অলঙ্কার, শ্রীচরণে এত জবাচন্দন, মন্দিরে এত ধূপদীপ।

সেই মহিমময় আর্য্যজাতি চলিয়া গিয়াছেন, সেই মনোরম-কান্তি হিরন্ময়-হৃদয় পূর্ব্বপুরুষগণ পরমসুন্দর পুরুষোত্তমের চরণে মিলিত হইয়াছেন, কর্ত্তিত-শস্য ভারতক্ষেত্রে আমরা কতকগুলা আবর্জ্জনামাত্র পড়িয়া রহিয়াছি।

সৌন্দর্য্যের আদর আমাদিগের নিকট হইতে লোপ পাইয়াছে। সুন্দরের অর্থই আমরা বিকৃত করিয়া লইয়াছি। প্রেমের পবিত্র পদ্মাসনে পাশব কামকে প্রতিষ্ঠা করিয়া রূপকে ঐ মনুষ্যত্ব-ধ্বংসকারী অপদেবতার সুরাপাত্র-বাহিনী সেবিকার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি।

*   *   *   *   *   *



সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান স্বাস্থ্য ; স্বাস্থ্য-রক্ষা নির্ভর করে সংযমের উপর। সংযম কথাটা শুনিয়াই কেহ শিহরিয়া উঠিবেন না ; সকল পুরুষ ঋষি-তপস্বী হইবেন, এমন আশা আমি করিতেছি না এবং সমস্ত নারীকেই বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য করিতেও বলিতেছি না। আহার-নিদ্রা, বেশ-ভূষা, শ্রম-বিরাম, বিলাস-বিহার প্রভৃতি সকল বিষয়ে নিয়ম রক্ষা করিয়া চলার নামই সংযম। প্রত্যহ প্রত্যূষে স্বভাব-শীতল জলে স্নান করিলে দেহ-মন প্রফুল্ল হয়, বর্ণে ঔজ্জ্বল্য আসে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জড়তা দূর হয় ; নয়ন প্রদীপ্ত ও কেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। অতিভোজন স্বাস্থ্যভঙ্গকারী ও সৌন্দর্য্যের বিষম শত্রু। অতিভোজনের বহুবিধ দোষের মধ্যে দুটি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি ; কি পুরুষ, কি স্ত্রী অপরিমিত ভোজ্যে জঠর ভারাক্রান্ত করিলে উভয়েই লম্বোদর হইয়া পড়েন, আর সুন্দরীর দৃঢ় উন্নতবক্ষও পূর্ণযৌবনে শিথিল ও অবনত হইয়া পড়ে। সর্ব্বদা নিজের দেহকে বিমল পরিচ্ছন্ন রাখিবে, পরিষ্কার দেহে বিমল বসন পরিতে স্বতঃই ইচ্ছা হইবে, আবার বসনখানি পরিচ্ছন্ন হইলে কখনই অপরিষ্কার স্থানে বসিতে বা মলিনশয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা হইবে না। সুতরাং এক দেহকে পরিষ্কার রাখিলে তোমার মন তোমাকে পরিচ্ছন্ন আসনে বসাইবে, পরিষ্কার সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গ কামনা জাগাইয়া দিবে। আর এক বিষম বৈরী স্বাস্থ্যের ও সৌন্দর্য্যের আছেন—আলস্য। বর্ত্তমান বঙ্গদেশে অধিকাংশ ভদ্র নর-নারী বাবুগিরির অর্থ আলস্যে পরিণত করিয়াছেন ; এই আলস্যকে আবার সালঙ্কৃত করিবার জন্য কোমলতার আভিমানিক ভাণে নিজ দেহকে বিবিধ কল্পিতরোগের আবাসভূমি বলিয়া পরিচিত করেন। আশ্চর্য্য !



লোকে আপনার পরিহিত বসনের ছিন্নাংশ সযতনে গোপনে রাখে, কাহা-কেও যদি বলা যায় যে, তাহার উড়ানীখানি ছিন্ন, বা জুতাজোড়াটি জীর্ণ, তবে সে চটিয়া লাল হয়; কোন সুন্দরীর "তাগা জোড়াটি একটু টোল খাইয়াছে" বলিলে তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, 'তাগা কখনও দেখেছিস্?' বলিয়া সমালোচিকাকে মধুসূদনের সাহায্যে নিমতলা মোকামে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করেন; অথচ সেই বাবু এবং সেই সুন্দরী 'আমার অম্বল আছে, আমার শিরঃপীড়া আছে; আমি উঠ্‌তে পারি নি, বস্‌তে পারি নি, শুতে পারি নি' বলিয়া নিজদেহের জীর্ণ দীর্ণ ছিন্ন অব্যবহার্য্য অবস্থা বর্ণনা করিয়া বড়াই করেন। যখন কুলবালাকুল সকালে বৈকালে কলসী-কক্ষে নদী বা সরোবর হইতে জল আনিতেন, ঢেঁকিতে পা দিয়া ধান ভাঙ্গিতেন, দুই করে কুলা ধরিয়া ডাল-চাল ঝাড়িতেন, বড় বড় ভাতের হাঁড়ি স্বহস্তে উনান হইতে নামাইতেন, থালা ধরিয়া অন্ন পরিবেশন করিতেন, শিলাবতীর বক্ষ পেষণ করিয়া বাটনা বাটিতেন, তখন তাঁহাদের দেহের কি সৌষ্ঠব ছিল,—সর্ব্বাঙ্গের গঠনে গুরুলঘুর বিচিত্র চিত্রোপম ভেদবিন্যাসে কি পূর্ণতা, কি গরিমা, কি মাধুর্য্য বিরাজ করিত, বর্ণে কি দীপ্তি ছিল, একবার নয়ন মুদিয়া দেখ দেখি সেই চিত্রখানি;—সংযতমনা শ্রমশীলা সদ্যঃস্নাতা শ্যামাঙ্গী সুন্দরী দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার কাকপক্ষোজ্জ্বল কেশ-কুসুম প্রতিমার চালের ন্যায় পৃষ্ঠে ঝাঁপাইয়া বিপুল কাঞ্চীমঞ্চ ছাইয়া জানুমূল চুম্বন করিয়াছে, উষার আকাশে নবোদিত অরুণের ন্যায়, সুন্দর সীমন্ত আলো করিয়া সিন্দূরবিন্দু শোভা পাইতেছে। সেই চন্দনচর্চ্চিত ললাট,

সৌন্দর্য্য

আসনে পরিণত করিতে দেবতাও প্রলোভন হয়। সে স্নেহ-তরল নয়ন-যুগলে প্রেমের সলাজ-সফরী নীরদবরণ হরণ করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে; আর সেই চক্ষের দৃষ্টি কি মিষ্টি; সে দৃষ্টি কপট-কটাক্ষবিহীন, বিলাসের আবেশের লেশ তাহাতে নাই, অহঙ্কারের কুটিল কুঞ্চন সে দৃষ্টি শিখে নাই; সে দৃষ্টি মমতার অমৃত বৃষ্টি করিতেছে, করুণার প্রবাহিণী বহাইতেছে, ভক্তি-প্রেমের লহর তুলিতেছে, পুণ্যের প্রদীপ সেই দৃষ্টিতে প্রজ্বালিত রহিয়াছে! তিলক-আশ্রয় নাসার কি সে সুন্দর শোভা, কি সে উৎফুল্ল কমল-কপোলযুগল, কিশলয় অধরটুকুতে বিম্বের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, কমলের মধুভরে ঢলঢল করিতেছে, সুগঠিত বাহুযুগল-বেষ্টিত বক্ষঃস্থিত শিশুর আদরের চুম্বন আকৃষ্ট করিতেছে; হৃদয়ের বেদিতে পতিপূজার নৈবেদ্য দুখানি সাজাইয়া পুণ্যবতী তন্বী দাঁড়াইয়া আছেন; গজবধূসম নীরব-গমনপটু-চরণ-প্রান্ত অলক্ত-রাগে রঞ্জিত; কি সুন্দর—দেখ দেখ দেখ, কি সুন্দর! দেখ, ঐ সৌন্দর্য্যে দুহিতার স্নেহের মাধুর্য্য, বনিতার প্রেমের প্রাচুর্য্য, মাতার মমতার ঐশ্বর্য্য! ঐ অঙ্গন আলোকরা রূপে সেবিকার নমনীয়তা ও শাসনকর্ত্রীর মহিমার কি সুমধুর সংমিশ্রণ!

সৌভাগ্যের বিষয়, এখনও এমন সুন্দরী বঙ্গ হইতে একেবারে বিদায় লন নাই। এখনও এমন দুটি চারটি সুন্দরী তেতালায় দেখা যায়, দুতালায় দেখা যায়, একতালায় দেখা যায়, তবে বেশী দেখা যায়, পল্লীগ্রামের পর্ণশালায়,—কৃষকের ঘরে, জালজীবী প্রভৃতির ঘরে। নহিলে মুকুরে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব অনেকেরই চাটুবাদী অভিমানকে বলিয়া দিবে, হয় তিনি আকাশ-প্রদীপের বাঁশ, নয় তাসের বিবি—মুণ্ড আর চার চৌকা গতর!

সৌন্দর্য্য

দেশভেদেও সৌন্দর্য্য উপলব্ধির·তারতম্য আছে। যে কাঞ্চন-কান্তি কেশঝারা পাশ্চাত্য প্রেমিককে মুগ্ধ করে—আমাদের এই ভারতবর্ষে তাহা চুলের একটা বিকৃত বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হয়; আষাঢ়ের প্রথম নীরদোদয়ের মসীবরণ কুন্তলদল আমাদের দৃষ্টিতে রূপের ছটা বৃষ্টি করে। প্রফুল্ল চক্ষের ভ্রমর-কৃষ্ণ তারকা-যুগল বাঙ্গালীর প্রাণ পাগল করে। বর্ত্তমান বঙ্গের কোন কোন কবি বিলাতী কাব্যের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে লেখনীচালনে তাঁহার কল্পিতা বঙ্গনায়িকাকে তুষার-শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত করিলেও শ্যামাঙ্গীর শান্ত-ক্লান্ত ছবি আমাদের চক্ষে যেমন স্নিগ্ধকর বোধ হয়, তেমন আর কিছুই নয়। এ দেশের গৌরবরণ হয় কাঞ্চনের ন্যায়—নয় দুধে-আলতার ন্যায়।

আবার কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপের রসগ্রহণের রুচিরও পরিবর্ত্তন হয়; পিতামহের যৌবনকালে—যে 'দাঁতে-মিশি দেখন-হাসি' ছিল, এখন সে হাসির কাশীপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে; যে সুদর্শন-চক্রোপম নথের ফাঁদ চাঁদমুখে প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া দুলিত, এখন তাহা স্বর্ণকারের মুচিতে গলিয়া নাকছাবির লবঙ্গ অঙ্গ ধারণ করিয়াছে। বাউটীর মণিবন্ধ এখন ব্রেসলেটের অধিকারে। খাড়ু গড়িতে ভুলিয়া গিয়া সেকরা এখন নানা রকম চুড়ি গড়ে। বুকের ধুকধুকের সঙ্গে সাতনরের ধুকধুকি আর লহর তোলে না, এখন হৃদয়দেশ আলো করিয়া দোলে নেক্‌লেস্।

আর বোম্বেয়ে বাই ঢাকাই গুলবাহারকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। অঙ্গে রূপের তরঙ্গ খেলিলেও দেশকালের রুচি অনুসারে সেই রূপকে সাজাইতে শিখিতে হয়। বনে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু বনকে বাগান



করিয়া তুলিলে তাহার আর এক মধুর রমণীয়তা হয়। ফুল গাছে গাছে ফুটিয়া, ডালে ডালে দুলিয়া রূপ ছড়ায় বটে, কিন্তু সেও জানে যে, সাজিলে তাহাকে আরও মানায়, তাই সে পাঁচটি অফোটা, দুইটি আধফোটা কলির মাঝে গিয়া ফুটিয়া ওঠে; কচি কচি সবুজ পাতা-ভরা নবীন শাখাটি বাছিয়া লইয়া তার উপর ঘোমটা খুলিয়া নাচিতে থাকে; কোথাও বা ঘনপত্রদলমাঝে স্তবক বাঁধিয়া মালাকরকে তোড়া গড়িতে শিখায়। আবার কখনও কলা-বিলাসী কামিনীর চম্পক-কলি অঙ্গুলি-হেলনে হাররূপ ধারণ করিয়া তাঁহার কবরী-কুণ্ডলী ঘিরিয়া বিহার করে; যুবতীকে সাজায়, আপনি সাজে।

* * * * * *

জগদীশ্বর মানবকে আপনার অংশ দিয়া সৃজন করিয়াছেন. সেই পরম সুন্দরের সুন্দর সৃষ্টিকে সুন্দরতর করিবার ভার মানবের উপর। যেমন কোন মহাকবির মহাকাব্যের অংশ হইতে অংশান্তর বাছিয়া লইয়া মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থিগণ নব নব কাব্যের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, তেমনি সেই প্রেমময় নটবর জগৎকবির এই ভাবময় সুষমাপূর্ণ বিশ্ব-কাব্যের প্রতি চরণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া মানব সংখ্যাতীত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে। সৃষ্টপদার্থবিশেষকে সৃষ্ট পদার্থান্তরের সুচারু সহযোগে অলঙ্কৃত করিতে পারে।

দেহমনসম্পন্ন মানবকে সমগ্র সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের সারভূত বলিয়া মানব গর্ব্ব করিয়া থাকে। সুতরাং সেই দেহ-মনকে মাজিয়া ঘষিয়া রূপ তুলিয়া বসন-ভূষণ দিয়া অলঙ্কৃত করা প্রত্যেক নর-নারীর অবশ্য পালনীয় প্রথম কর্ত্তব্য। মনকে মলিনতা মাখাইয়া উলঙ্গ নিরলঙ্কৃত রাখিলে মানব যেমন

সৌন্দর্য্য

মনুষ্যত্বের উচ্চ পদবী হইতে বিচ্যুত হইয়া ইতর পশুত্ব—পূতিময় প্রেতত্বের সুদূর নিম্নস্তরে পতিত হয়, তেমনি পরমাত্মার লীলাক্ষেত্র হরিমন্দিরস্বরূপ এই দেহকেও অবহেলা করিয়া মলামাটী-মাখা ব্যাধি-বিকারের আধার করিয়া রাখিলে, ইহার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের শ্রীবর্দ্ধন না করিলে, মানবত্বের উন্নতি ও স্ফূর্ত্তি হয় না। দেহের সহিত মনের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আর্য্য-ঋষিগণ তাহা বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, একের অবনতিতে অপরের অধোগতি, একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, একের সৌন্দর্য্যে অপরের সৌন্দর্য্য এবং উভয়ের সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-স্ফূর্ত্তিতে আত্মার ঐশ্বর্য্য-বিকাশ। সেই জন্যই এত স্নানাহ্নিকের ধুম, এত সংযম উপবাসের নিয়ম, এত খাদ্যাখাদ্যের বিচার—বেশ-ভূষারও এত বাঁধা-ধরা বন্দোবস্ত। সনাতন শাস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিলে দেখা যায়, প্রতি গ্রন্থ, প্রতি অনুশাসন, প্রতি শ্লোকের সারার্থ, মুখ্য উদ্দেশ্য—দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন।"

* *

মনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের কথা বলিলাম, কথাটি বড় কথার কথা নয়। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় মানবের মুখাকৃতি যেরূপ থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়; অস্থিপেশী-মাংসাদির পরিপুষ্টিজনিত যে পরিবর্ত্তন, আমি তাহার কথা বলিতেছি না, মুখভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। শৈশব মনের নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবৃত্তিও জাগরিত হইয়া উঠে, প্রবৃত্তি চিন্তাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া, মনের মধ্যে তাহাকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে দেয়,

শিক্ষা-সাহচর্য্যাদি অবস্থাও প্রবৃত্তির উপর বিশেষ আধিপত্য করে। এই শিক্ষাচালিত, চিন্তাবিজড়িত প্রবৃত্তি মানব-মনকে সচৈতন্য বা জড়, শান্ত বা অশান্ত, সরল বা কুটিল, কোমল বা কঠিন যেরূপ ভাবেই গঠিত করুক না, সেই ভাবই মুখ-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া আজীবন অঙ্কিত থাকে। মৃত্যুর পর অনেক সময় সেই সূতিকা-গৃহের শিশু-মুখের ভাব প্রাচীন শবের মুখে লক্ষিত হয়। এই জন্য অনেক সুগঠিত সুবর্ণ-বর্ণ বদনেও মাধুরী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; অনেক বিম্বোপম অধরের হাস্যে কালসর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে। সুতরাং কেবল মুখ মাজিলে ঘষিলে হইবে না —মনও মাজিতে ঘষিতে হইবে। মন মধুর না হইলে মুখে কখনই মাধুরী থাকিবে না। হিংসা-দ্বেষ-ঈর্ষা প্রভৃতিতে মনকে কঙ্করিত কণ্টকিত করিলে মুখ সে কথা কলঙ্কিত অক্ষরে বিজ্ঞাপিত করিবে। মনকে সৌন্দর্য্য-বিভূষিত কর, মুখে সৌন্দর্য্যের কিরণ ঝরিতে থাকিবে। গোলাপের সৌরভে মনকে প্রফুল্ল কর, মুখে বসরাই গোলাপ ফুটিয়া উঠিবে—দৃষ্টির সুধাবৃষ্টি ভুবন বিজয় করিবে।

* * * * * *

একণে অঙ্গ-সংস্কারসম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিবার চেষ্টা করিব। বর্ণ-প্রসাধানের জন্য এদেশে পূর্ব্বে হরিদ্রাই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। এখনও দূর-পল্লী-গ্রামাঞ্চলে, উৎকল-খণ্ডের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত আছে। আর বিবাহের পূর্ব্বে হিন্দুর গৃহে বরবধূর প্রথম অঙ্গরাগের উপকরণ হরিদ্রা, গাত্র-হরিদ্রার এ মর্য্যাদা কোটীপতি হইতে কাঙ্গালের ঘরেও রক্ষিত

হইয়া থাকে। অভিধানকারেরা হরিদ্রাকে বর্ণদাত্রী, বর্ণবতী নামে সম্মানিত করিয়াছেন, আর আমরা ত ঝাল-ঝোল-ডাল-অম্বলের সাহচর্য্যে এই হরিদ্রাকে দু'বেলা উদরস্থ করিতেছি, অথচ গাত্রে হরিদ্রা-লেপন ঘৃণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করি; চমৎকার ব্যাপার! শিক্ষা, বলি-হারি তোর মহিমা! একটু সুগন্ধমিশ্রিত ভাগাড়ের চর্ব্বি চারি আনা কৌটার পমেটমরূপে মাখিয়া বাবু সাজিতে প্রস্তুত, কিন্তু যে হরিদ্রা আমাদের প্রায় সমস্ত ব্যঞ্জনকে সুস্বাদু করে—যে হরিদ্রা দুর্গন্ধহর, রোগ-বীজাণুনাশক, সেই হরিদ্রা অঙ্গে লেপন করিতে নাসিকা কুঞ্চিত করি! 'কেমন হলুদ-হলুদ গন্ধ কয়'—না? এইখানে ইংরাজে আর আমাতে বড়ই তফাত! স্বাধীন ইংরাজ—উদ্যমশীল ইংরাজ—আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন আত্ম-গরিমা-গর্ব্বিত ইংরাজ ইংলণ্ডের মৃত্তিকাও সুবর্ণ জ্ঞান করে, আপনার নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করিয়া তোলে, আপনার গ্রামকে নগর করে, আপনার ঘৃণ্যকে আদরণীয় করে; আপনার মরা সোনাকে পোড়াইয়া খাঁটী করে, তবু পরের ঘরে কর্জ্জ বা ভিক্ষা করে না!

ইংরাজ কি জানে না, মৃত পশুর বসা একটা অস্পৃশ্য জঘন্য পদার্থ? কিন্তু সে তাহাকে ধৌত, পরিষ্কৃত, পরিশুদ্ধ, সৌরভিত করিয়া কেবল প্রসাধনে ব্যবহার্য্য নহে, আহার্য্য করিয়া তোলে। কিন্তু আমরা তাহা করিব কেন? তেল-হলুদকে 'গো টু হেল' করিয়া ভেল মিশান সাবান মাখিব! চেষ্টা কর—অতি সামান্যমাত্র চেষ্টা কর, দেখ দেখি, হরিদ্রাচূর্ণকে মনোমত সুরভি-পূর্ণ করিতে পার কি না; তেল-হরিদ্রা মাখিয়া স্নানের সময় বেসন দিয়া বেশ ধৌত করিয়া পরে শুষ্ক গাত্রে

চন্দন লেপন করিয়া দেখ দেখি, তোমার অঙ্গ-সৌরভের গর্ব্ব কত বর্দ্ধিত হয়। সাহেব-মেমেরা সাধারণতঃ আমাদের ন্যায় গাত্রে তৈল-সংস্কার করেন না—কিন্তু আমি প্রসাধনসম্বন্ধীয় অনেক ইংরাজী গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে অল্প তৈল দ্বারা কেশ-সংস্কারের সুপরামর্শ পড়িয়াছি; নির্ম্মল উৎকৃষ্ট তৈল (সরিষা, নারিকেল বা তিলজ) কেবলমাত্র কেশের কোমলতা, ঔজ্জ্বল্য ও প্রাচুর্য্যসাধন করে না—সঙ্গে সঙ্গে কেশ-কাননে উৎকুননামা জঘন্য জীবেরও প্রবেশ নিষেধ করে। এই সে দিন এক-খানি ইংরাজী গ্রন্থে পড়িতেছিলাম যে, তৈল ব্যবহার করিলে কপোল, কণ্ঠ প্রভৃতির চর্ম্ম শীঘ্র লোল ও কুঞ্চিত হয় না। প্রমাণস্বরূপ চারিদিক্ চাহিয়া একবার দেখিবেন, স্বাস্থ্যসম্পন্ন অতি বলিষ্ঠকায় সত্ত্বেও ইংরা-জের মুখ যেমন অকালে পাকিয়া যায়, তেল-মাখা কালা বাঙ্গালীর মুখ তত শীঘ্র পাকে না। সাবান ক্ষার পদার্থে প্রস্তুত, ক্ষার জীর্ণতা-জনক, ক্ষারে ধোয়া কাপড় অল্পদিনেই দুর্ব্বলসূত্র ও জীর্ণ হইয়া যায়। মেমেরাও চুলে সাবান দেন না। একটু অঙ্গুলি-সঞ্চালনের পরিশ্রম-লাঘবের জন্য এক্ষণে অনেক মহিলা বেসনের পরিবর্ত্তে সাবান দিয়া কেশ মার্জ্জনা করেন, ফলে আজানুলম্বিত-চাঁচর-চিকুর আগ্রীবা-দোদুল্যমান টিক্‌টিকির লাঙ্গূলে পরিণত হয়। অন্ততঃ এক টাকা মূল্যেরও একখানি সাবান হস্ত বা মুখ পরিষ্কারের জন্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সস্তার তিন অবস্থা, কিন্তু সস্তার সাবানের অতি দুরবস্থা! কেহ আমার কথা শুনিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, এক টাকা, এমন কি, পাঁচ টাকা দিয়াও এক কেক্ সাবান ক্রয় করিয়া দেখিবেন যে,



স্থায়িত্ব হিসাবে তাহা কখন দুর্ম্মূল্য বলিয়া বোধ হইবে না; সিক্ত মুখে সে সাবান একবার অতি-ধীরভাবে বুলাইয়া লইলেই যথেষ্ট ফেনা সঞ্চিত হইবে—এক সেকেণ্ডমাত্র বুলাইয়া লইলে, পাঁচ মিনিট ঘসড়-ঘসড়ের কার্য্য করিবে, বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে গামছাখানা পর্য্যন্ত কাচিয়া না লইলে, একখানি সাবানে কয়েক মাস চলিয়া যাইবে। ভৃঙ্গরাজ নামে যে শাক আছে, তাহার আর একটি আভিধানিক নাম কুন্তল-বর্দ্ধন। ঐ ভৃঙ্গরাজের রস এবং কেশুরতে পাতার রস চুলের পক্ষে মহোপকারী; চুলের মূল দৃঢ় করে, কেশজাল কৃষ্ণ ও উজ্জ্বল করে—আর মুকুর দেখাইয়া দেয়, সে চিকুরে কি মাধুর্য্য, কি প্রাচুর্য্য, কি সৌন্দর্য্য! আমি বাবুয়ানার পক্ষপাতী, কিন্তু সস্তায় বাবুয়ানা হয় না;—বুল্‌বুলের মত ঘাড় ছাঁটিতে গেলেও পরামাণিককে দু'পয়সার স্থলে দুই গণ্ডা দক্ষিণা দিতে হয়। সুস্বচ্ছ—সুতরল—স্নিগ্ধ সুবাসিত উৎকৃষ্ট তৈলের ন্যায় কেশ-সংস্কারের উপযুক্ত পদার্থ আর কি আছে? কিন্তু ছ' আনা আট আনা শিশিতে কি সে তৈল পাওয়া যায়? প্রথমে ভাল নারিকেল বা তিল-তৈল সাদাসিদা কিনিতেই কত পড়ে? তার উপর তাকে পরিষ্কার করা আছে—বিবিধ বাসের রাসায়নিক মিশ্রণে তাহাকে কোমল সৌরভপূর্ণ করা আছে—ক্রমে শিশি, ছিপি, টপ, কেশ লেবেল, বিজ্ঞাপন, কমিশন এ সব আছে—বিক্রেতাও কিছু কল্পতরু হইয়া বসেন নাই—যৎসামান্য লভ্যেরও প্রয়োজন, সুতরাং তাহা যদি বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ কত অল্প মূল্যে বিক্রয় করা যায়? আমরা



সংসারী জীব বড় মিথ্যাপ্রিয়; চাটুকার বলিতেছে—আমার মত বিদ্বান্ জগতে নাই—আমি জানি, লোকটা মিথ্যা বলিতেছে, তবু শ্রুতিসুখের আনন্দে তাহাকে বৃত্তি দিয়া প্রতিপালন করিতেছি! দ্বারে ভিখারী আসিলে কুকুর লেলাইয়া দিই—কিন্তু পার্শ্বচর বলিল, আমি দাতাকর্ণ—অমনি তাহাকে এক জোড়া চীনের বাড়ীর জুতা কিনিয়া দিলাম! বিজ্ঞাপন বলিতেছে যে, আমার এই দশ আনার তৈল চুলে লাগাইলে 'কোটী কামিনী তোমায় ভাবিয়া জাগিয়া যামিনী যাপন করিবে'—ব্যস্! আমিও তৈল কিনিলাম! প্রবন্ধের প্রারম্ভেই একরূপ বলা হইয়াছে যে, সৌন্দর্য্য-সাধন একটি অতি আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য। নিজের অঙ্গের শ্রী না থাকিলে গৃহের শ্রী থাকে না; সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য পারিবারিক সুখকে সুমধুর করে; প্রথমে বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, এই সৌন্দর্য্যের মায়া-রজ্জুই আমাদিগকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, প্রণয়ঘটিত নাটক, উপন্যাস, কবিতাদিতে কে কবে কুৎসিত, কুৎসিতা নায়ক-নায়িকার কথা পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন? আমাদের শ্যামসুন্দর, উমাসুন্দর, রমাসুন্দর, শূলপাণি, ভবানী, বাণী, শচীরাণী সব সুন্দর। অবতার মহাপুরুষদিগের মধ্যে শ্রীরাম, বলরাম, রামানুজ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ এঁরা কি সুন্দর, আর কি সুন্দর শিশু যীশুবক্ষে মেরীমাতা!

*   *   *   *   *   *

প্রিয়তমে! তুমি আমার গৃহসুন্দরী। আমি বন্য পশুপুরুষ—হাটে মাঠে ঘাটে ছুটিয়া বেড়াইতাম, লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন উদ্‌ভ্রান্ত মন লইয়া বনে বনে বিচরণ করিতাম, যদি না তোমার সৌন্দর্য্যের মোহিনী



আমার এই প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণকে নন্দনের আনন্দপূর্ণ শোভায় ভূষিত করিত। সুন্দরি! পিতা-মাতা আমার নিজ দুহিতাকে পরগৃহে পাঠাইয়া তোমার কন্যাস্নেহে সাদরে ক্রোড়ে লইয়াছেন; তোমায় বিবাহ করিয়া আনিয়া আমি ক্রীড়াচ্ছলে ধান ঢালিয়া দিলাম, তুমি তাহা তুলিয়া মঙ্গলভাণ্ডে রাখিলে; এখনও সেই খেলা চলিতেছে, আমি মাথায় মোট বহিয়া আনিয়া ঢালিয়া দিতেছি—তুমি সেগুলি কুড়াইয়া গুছাইয়া রাখিতেছ। সেই শুভদিনে প্রথম তোমার মঙ্গলময় দৃষ্টিতে তপ্ত কটাহ হইতে দুগ্ধ উছলিয়াছিল—এখনও আমি একগুণ আনিতেছি, তোমার গুণে তাহা দশগুণ হইয়া উছলিয়া পড়িতেছে। বালিকা তোমায় ধূলা-খেলা করিতে দেখিয়াছি, কৈশোরে তোমার নয়নে ব্রীড়ার প্রথম ক্রীড়া দেখিয়াছি—যেন যাদু-যষ্টি-সংস্পর্শে যৌবনে তোমার অঙ্গে লাবণ্যের নবীন তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস দেখিয়াছি! ধীরে—ধীরে—ধীরে আমি তোমার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে শিখিয়াছি। দেখিয়াছি, পাকশালায় তোমার রূপে পাঞ্চালীর সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে; সন্তান-কোলে বসিয়া আছ—সেই মাতৃমহিমমণ্ডিত মুখমণ্ডলে সৌন্দর্য্যের অতুল গৌরব; সেবায় তোমাতে সত্যভামার সৌন্দর্য্য, অভিমানে তোমার অধরে রাধার মাধুরী, আর পতিপার্শ্বে তুমি আত্মহারা বসুমতী-সুতা সীতা।

*　*　*　*　*　*

একবার এসো দেখি, আমরা একখানি রূপ দেখি; নবীন সজ্জায় সজ্জিতা নবীন সৌন্দর্য্যের একখানি ছবি দেখি। চন্দনচর্চ্চিত গাত্রে বসন্ত

সৌন্দর্য্য

উনবিংশতিবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া মল্লিক-কুমারী বেলার অঙ্গে ফুলের বীজন ঢুলাইয়া গিয়াছে; লঘু-কায়া বেলা কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়তন শ্যামাঙ্গী, যেন কুসুমভার-ভূষিতা মাধবীলতা; ভাদ্রমাসের ভরা নদীর ন্যায় যৌবনের জোয়ার যেন নিজের পূর্ণতায় দুকূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে; ভ্রমরকৃষ্ণ ঈষৎ তরঙ্গায়িত কেশদাম শিথিল কবরীতে আবদ্ধ হইয়া গ্রীবার মরাল ভঙ্গিতে মাধুর্য্য মাখাইয়া দিয়াছে। কপোল-যুগলের রক্তিমরাগে কোমলদল ডুবাইয়া লইয়া একটি আধফুটন্ত সপত্র গোলাপ বেলার সীঁথির বামপার্শ্বে বসিয়া চুলের পরিমল হরণ করিতেছে। আর সেই কেশরাশি কি কোমল, কি উৎফুল্ল, কি মসৃণ, কি চিক্কণ, কি সুখস্পর্শ, কি মদির গন্ধে কুন্তলদল ইন্দ্রিয় সকল অবশ করিয়া দেয়;—কবরী-বিগলিত সমীর-সঞ্চালিত একটিমাত্র চুলও অঙ্গে স্পর্শ করিলে—সমস্ত শরীর হর্ষের উত্তেজনায় রি-রি করিয়া শিহরিয়া উঠে, আনন্দের স্পন্দনে হৃদয় মাতিয়া নৃত্য করিতে থাকে। দেখাও বেলা, দেখাও তোমার ফুটন্ত চক্ষু দুটি—কোন্ গগনের কোন্ দুটি তারা পথহারা হয়ে তোমার ঐ তুলি দিয়ে আঁকা ভ্রূর তলে কালো পাখার ঝালর দেওয়া পাতলা পাতার কোলে আশ্রয় লইয়াছে। ও চোখ কি চায়, কাকে চায়, কি বলে বলে বল্‌তে পারে না; কি আলোক, কি পুলক ঐ চক্ষে খেলা করে, কত আবেশ, কত আশা, কত উল্লাস, কত পিয়াসা ঐ চোখে ভেসে বেড়াচ্ছে; কার ভালবাসার নেশায় মাতাল হয়ে চোখ দুটি ঢল্-ঢল্ টল্-টল্ কর্‌ছে। ঐ দৃষ্টিতে কি উদ্দীপনা, কি আবেশ, কি সরম, কি গরিমা; ব্রীড়াতরল



ক্রীড়াচঞ্চল ঐ দৃষ্টি কি শীতল, কি কোমল বিদ্যুৎধারা বৃষ্টি করে। ঐ চোখে কালিদাসের কবিত্ব, ভবভূতির বিভূতি, বায়রণের আবেগ, সেলির স্বপ্ন, বিদ্যাপতির বিরহ, জয়দেবের মুরলী-ঝঙ্কার। ঐ চোখ রূপ-পিপাসা শান্ত করে, কিন্তু কলুষ লালসা জাগাইয়া দেয় না। ঈষৎ-ভিন্ন প্রবাল-লাল অধরের মধ্য হইতে তিন চারিটি মুক্তা দেখা যাই-তেছে; ঐ মতির মালা হাসির ছলে অধরপল্লবে চুম্বন-নিমন্ত্রণ মুদ্রিত করিয়া কোন্ ভাগ্যবান্কে হৃদয়াসনে বসিবার জন্য আহ্বান করে। চেলাঞ্চলাবৃত নিরলস কাঞ্চন-কলস-যুগল হৃদয়বিহারী হেমহার ধারায় কি মধুর লহর-লীলা তুলিতেছে। ক্ষীণ মধ্যবিলম্বী বিপুল ভূগোল আলিঙ্গন করিয়া কাঞ্চনকাঞ্চী যেন বিষুবরেখার ন্যায় বিমল গৌরবে বিরাজ করি-তেছে! বর্ষাধৌত আকাশের ন্যায় ঈষন্নীলাভ স্বচ্ছ শাটীখানি বেলার লাবণ্য উচ্ছ্বাসে ভিজিয়া তাহাকে বেড়িয়া জড়াইয়া ধরিয়া আছে। মেদিনী যেন বেলার চরণতলস্পর্শে পুলকে বিগলিতা! ও রূপ কেবল দেখিতে হয়, চাহিয়া চাহিয়া জগৎ ভুলিয়া বিভোর হইয়া, ঐ রূপ কেবল দেখিতে হয়; ও রূপের কাছে গিয়া উহাতে ছায়া ফেলিতে নাই,—ও রূপ স্পর্শ করিয়া মলিন করিতে নাই;—দৃষ্টির খরতায় ও সৌন্দর্য্যকে লজ্জাবতীলতার ন্যায় মুদিত করিয়া ফেলিতে নাই। মানব-চক্ষে সুধা-বৃষ্টি করিতে ওই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি; মানব-মনে আনন্দের তুফান তুলিতেই ওই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি; মানবকে সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে পূজা করিতে শিক্ষা দিতেই ওই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি।



কবি—শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

রূপ-ভোগ

১

চাল' তবে তীব্র সুরা রূপ-পাত্র ভরি',
চরণ-মঞ্জীর ছন্দে উঠুক্ গুঞ্জরি'!
টানিতে গুণ্ঠন লাজে, সরুক্ হাসিতে;
প্রেম হোক্ বিশ্বভোগ,—আপনা বিস্মরি'

২

যাক্ দিন,—হেরি রঙ্গে অপাঙ্গ বিলোল,
আদরে অলকে দিয়া মৃদুমন্দ দোল;
স্ফুরিত অধরে হেরি' কৌতুক-কুঞ্চন,
কভু দীপ্ত-লুপ্ত টোলে নিটোল কপোল:।



৩

কহিও না কোন কথা,—অদৃষ্ট হাসিবে,
কি কথা বলিতে গিয়া কি কথা আসিবে!
হয় ত কথার ভ্রমে সুধা হবে বিষ,
আমরণ আঁখি-জলে হৃদয় ভাসিবে।

৪

নাসাগ্র, ঈষৎ স্বিন্ন, শ্বসুক্ কামনা,—
শ্বাসে শ্বাসে নব আশা, নবীন ছলনা!
কত স্তব-স্তুতি-পূজা,—মেঘ নাহি সরে,
মেঘান্তরে করে নর স্বরগ রচনা।

৫

কোন্ রাজা ভুঞ্জিয়াছে এ সুখে বসুধা!
দেব-দৈত্য যুঝেছিল পিতে এই সুধা!
করি' রাজসূয়-যজ্ঞ, করি' অশ্বমেধ,
জীবনে মিটেছে কার জীবনের ক্ষুধা!



লেখক—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

ইংরাজ-রমণী

যাঁহারা বিলাতে গিয়াছেন এবং ফিরিয়া আসিয়া ভ্রমণসম্বন্ধে বহি ছাপাইয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ইংরাজ-রমণী সম্বন্ধে কিছু না কিছু লিখিয়াছেন। কেবল আমিই এতদিন এ সম্বন্ধে নীরব ছিলাম। মহাজনগণের প্রদর্শিত পথেই বিচরণ করা কর্ত্তব্য, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া আমার যেটুকু বলিবার আছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলি, কারণ, বৎসরের পর যেমন বৎসর কাটিতেছে, আমার প্রবাস-স্মৃতিও তেমনি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে।

প্রথম—ইংরাজরমণীর সৌন্দর্য্য। এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলিতে ভয় পাই। আমি কবি নহি, চিত্রকরও নহি, সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে



একান্তই অপটু। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়্‌বেই! শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন; আমার বিশ্বাস, ইংরাজ-মেয়ের মত সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। নবনীর মত সুকোমল শুভ্র রঙ্গের উপরে একখানি পাংলা টুক্‌টুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা, এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট নির্ম্মল নীলনেত্র,—দেখে পথকষ্ট দূর হয়ে যায়।"—আমি কিন্তু বিলাতে ইহা দেখি নাই। সুন্দরী মেয়ে কি একেবারেই দেখি নাই?—তাহা নহে। তবে পথে ঘাটে সৌন্দর্য্যের অত ছড়াছড়ি আমি দেখি নাই। প্রথমতঃ বর্ণের কথা,—অত শাদা আমার ভাল লাগে না—যেন চক্ষু ঝলসিয়া যায়। বরং ইতালীয় বা স্পেনদেশীয় যুবতীর দেহবর্ণ আমার নিকট সমধিক মনোরম। তাহারাই যথার্থ গৌরী। ইংরাজের মেয়ে গৌরী নহে—শ্বেতা। তাহার পর ধরুন, চক্ষুর কথা। যুবতীর নয়নই সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রভূমি। শুনিতে পাই, এই রন্ধ্রপথেই পঞ্চশর না কি অহরহঃ তাঁহার ধনুর্ব্বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন। ইংরাজ-রমণীর চক্ষু হয় কটা, নয় নীল—কালো চক্ষু খুব কম। অথচ কালো চক্ষুর কাছে সৌন্দর্য্যে আর কে দাঁড়াইতে পারে? সত্যকথা বলিতে কি, কটা চক্ষুকে, নীল চক্ষুকে কেমন যেন বিশ্বাস হয় না। আপনার লোকটি বলিয়া মনে করা যায় না। তাহাদের হাতে নিশ্চিন্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করা যায় না। কালো চক্ষুর ভিতরে যে একটা স্নিগ্ধতা, বিশ্বস্ততা ও সহানুভূতির ভাব আছে—কটা চক্ষুতে, নীল চক্ষুতে তাহা কোথায়? হইতে পারে, ইহা আমার ভুল—বংশ-পরম্পরাগত



একটা সংস্কার মাত্র। কত পুরুষ ধরিয়া কালো চক্ষুর উপাসনা করিয়া আসিলাম, আজ হঠাৎ দেবতা বদল করিব কেমন করিয়া?

বাহিরের কথা সংক্ষেপে সারিয়া, এবার ভিতরের কথা পাড়ি। ইংরাজ-রমণীর অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলি—যেমন মায়া, দয়া, স্নেহ, প্রেম —আমাদের দেশের রমণীগণের অপেক্ষা যেন কিছু কম। আর, মনের যেগুলি কঠিন বৃত্তি, যথা স্থিরপ্রতিজ্ঞা, আত্মসম্মানবোধ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি—সেগুলিতে তাঁহারা ভারতীয় রমণীগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বলিয়া বোধ হয়। আমাদের দেশের মা, ছেলের মুখে একটু রোদ লাগিলেই যেমন "আহা, বাছার মুখখানি কালী হয়ে গেছে" বলিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠেন, ইংরাজমাতা সেরূপ হন না। আমি দেখিয়াছি, সে দেশে মা বসিয়া সেলাই করিতেছেন, বা বই পড়িতেছেন, দামাল ছেলে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, পড়িয়া গেল, আঘাত পাইল, মা যেখানে ছিলেন, সেখানে বসিয়াই একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন মাত্র—আবার নীরবে আপন কার্য্যে মন দিলেন। প্রথম প্রথম এরূপ দেখিয়া আমি মনে মনে বলিতাম—কি পাষাণী মা! ছেলেটা অমন চোট খাইল, মা একবার 'আহা' বলিল না? আমাদের দেশে হইলে মা মাসী পিসী আসিয়া ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইয়া কতমতে তাহাকে সান্ত্বনা করিতেন। —ক্রমে নিজেই বুঝিলাম, এই মা কোমলতায় কিছু খাটো হইলেও বীর-জাতির জননীর উপযুক্ত বটে। এই ছেলেরা আছাড় খাইয়া খাইয়া মানুষ হইতেছে—বড় হইয়া পৃথিবী শাসন করিবে—আর, মা-মাসী-পিসীর অঞ্চলের নিধি আমরা ইহাদের কেরাণীগিরি করিব।

সৌন্দর্য্য

ইংরাজ-রমণীর একটা প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ আছে—যাহা আমাদের রমণীদের মধ্যে দেখি না। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের শাস্ত্র—বহু শতাব্দী ধরিয়া উপদেশ ও অনুশাসনের দ্বারা হিন্দুরমণীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব-টুকু লোপ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাই হিন্দুরমণী স্বামীকে বলে—

"আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশী নই।"

(রাজা ও রাণী)

কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিলে নগেন্দ্রনাথ সুখী হইবেন, সুতরাং সূর্য্যমুখী নিজেই তাহার উদ্যোগিনী হইলেন। আপনার সুখ-দুঃখ গণনার মধ্যেই আনিলেন না। তিনি স্বামীকে বলিলেন না—"তুমি আমায় অপমান করিতেছ।" যেখানে "আমি"ই নাই—সেখানে মানই বা কি, অপমানই বা কি? আমাদের দেশে সকল স্ত্রীই যে সূর্য্যমুখী, তাহা আমি বলিতেছি না—কিন্তু আদর্শ তাহাই। নিজে সে যাহাই হউক, হিন্দুরমণী এই আদর্শকেই প্রশংসার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইংরাজ-রমণী কিন্তু এ চিত্র দেখিলে তাচ্ছিল্যের সহিত নাসিকা কুঞ্চিত করিবে। বরঞ্চ ভ্রমরের সহিত তাহাদের সহানুভূতি আশা করা যায়। ভ্রমর কিছু সূর্য্যমুখীর অপেক্ষা স্বামীকে কম ভালবাসিত না, কিন্তু সূর্য্যমুখীর আত্মলুপ্তি ভ্রমরে ছিল না। স্বামিকর্ত্তৃক তাহার প্রেমের অপমান সে মর্ম্মে মর্ম্মেই অনুভব করিয়াছিল—এবং সে অপমানের কঠোর প্রতিশোধ লইতেও ছাড়ে নাই। ইংরাজ-রমণী হইলেও এইরূপই করিত।

এই প্রবল ব্যক্তিত্ব-বোধেরই একটা ফল, তাহাদের স্বাবলম্বনপ্রিয়তা। কাহারও দয়া স্বীকার করিতে, সাহায্য লইতে—এমন কি, উপদেশ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে তাহারা একান্ত নারাজ। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে দেখিয়াছি, বড় মেয়ে, বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ—সে নিজের চেষ্টায় কিছু কিছু রোজগার করিয়া, মাকে নিজের বাসা-খরচ দেয়। মার অভাব আছে অথবা মা চাহেন বলিয়া যে দেয়, এমত নহে। না দিতে পারাটাই মেয়ে দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করে। উপদেশ-বিমুখতার কথায় একটা ঘটনা মনে পড়িল। আমি প্রায়ই ব্রিটিশ মিউজিয়মের পাঠাগারে বসিয়া পড়িতাম—মিউজিয়ামের বাহিরে একটা মণিহারীর দোকান ছিল, কাগজপত্র আবশ্যকমত সেইখান হইতেই কিনিতাম। মাঝে মাঝে পঁচিশখানা করিয়া চিঠির কাগজ এবং পঁচিশখানা খাম কিনিতাম। আমি খাম-কাগজ চাহিলেই, বিক্রেতা কর্ম্মচারী একটি প্যাক করিবার বড় খাম লইত (অর্থাৎ যাহার মধ্যে আমার চিঠির কাগজগুলি না ভাঁজিয়া প্রবেশ করান যাইতে পারে) —তাহার মধ্যে চিঠির কাগজগুলি দিয়া খামের প্যাকটি ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ করিত এবং সেগুলি দুই থাকে চিঠির কাগজগুলির উপর সাজাইয়া দিত। উদ্দেশ্য—যাহাতে প্যাকেটটি সর্ব্বত্র সমান হইয়া থাকে। এইরূপে এই দোকান হইতে আমি বহুবার খাম কাগজ কিনিয়াছি। একদিন কিনিতে গিয়া দেখি, সে বিভাগে পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তি নাই—তাহার স্থলে একটি তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে বিক্রয় করিতেছে। খাম কাগজ চাহিলাম। সেও একখানি বড় খামে কাগজগুলি পূরিল—কিন্তু খামের বাণ্ডিলটি, যেমন ছিল, সেই অবস্থাতেই ভিতরে দিল। ফলে প্যাকেটটি, উটের

পিঠের মত মাঝখানে উঁচু হইয়া রহিল। আমি বালিকাকে বলিলাম—"ওগো—অমন করিয়া নয়। খামগুলা ডু থাক্ করিয়া, এমনি করিয়া প্যাক করিতে হয়।"—বালিকা আমাকে কিছু বলিতে পারিল না—কিন্তু



সৈকত-প্রেম।



এমন করিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল, যাহা বলার অধিক। রোষ ও বিরক্তি তাহার চক্ষু দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। ভাবটা যেন —আমার কাজ আমি করিতেছি, তুমি কে মহাশয় যে, আমাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছ?

ইংরাজ-রমণীর সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা একটা বেশ লক্ষ্য করিবার জিনিস। নিজের কেশ-বেশ, ছেলে-মেয়ে, গৃহস্থালী দ্রব্য, সমস্তই সে পরিপাটী-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে জানে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তো কথাই নাই —নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও ইহা দেখা যায়। লণ্ডন হইতে কিছু দূরে, "সেণ্ট-মার্গারেটস্ বে" নামক সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে—আমরা মাঝে মাঝে সেখানে বেড়াইতে যাইতাম। একজন মৎস্যজীবী ছিল, সমুদ্রের ধারেই তার বাড়ী—দ্বিতলে একটি ঘর সে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে, বায়ুসেবী ভদ্রলোক আসিয়া চাহিলে সেই ঘরখানি ভাড়া দেয়। তাহারও ভাড়ার বাড়ী—এইরূপ করায় তাহার বাড়ী ভাড়ার কিছু সাহায্য হয়। আমি কয়েকবার গিয়া সেই ঘরখানি ভাড়া লইয়া-ছিলাম। দেখিতাম—তাহারা জেলে হইলেও, বাড়ীর গৃহিণী, ছেলেপিলে-গুলি, কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে—যেন তেমন পরিচ্ছন্নতা আমাদের দেশের ডেপুটি বা মুন্সেফ বাবুদের পরিবারেও দুর্ল্লভ। অথচ বাড়ীর কর্ত্তা যে, সে কেবল জাত্যংশে জেলে নহে—রীতিমত জাল ঘাড়ে করিয়া রোজ সে নৌকা চড়িয়া সমুদ্রে মাছ ধরিতে যায়।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর রমণীগণ সচরাচর সুশিক্ষিত—সুতরাং তাঁহাদের সৌন্দর্য্যবোধ আরও উৎকর্ষপ্রাপ্ত। কুৎসিতকে শুধু যে কুৎসিত বলিয়া

বর্জ্জন করেন, তাহা নহে—কুৎসিত তাঁহাদের চক্ষুকে যথার্থ ই পীড়া দেয়। এটি তাঁদের বহুকালের সৌন্দর্য্যচর্চ্চার ফল। দুই একটা উদাহরণ দিই। সে দেশে, ঘরের দেয়াল চিত্রিত কাগজের (wall paper) দ্বারা আবৃত থাকে। সে কাগজ নানা বর্ণের, নানা পরিকল্পনার আছে। সবগুলি উচ্চকলাসঙ্গত যে, তাহা নহে। একবার আমি একটা ইংরাজের মেয়ের সঙ্গে একটি কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"উঃ, কি কুশ্রী কাগজ! আমি এ ঘরে শুইলে ঘুমাইতে পারি না।"—এ দেশে—কলিকাতায় একটি বঙ্গমহিলা স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় সংবাদ পান, তাঁহার কোনও ইংরাজ সখী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। স্নানান্তে বেশ পরিধান করিয়া, কেশবিন্যাস না করিয়াই তিনি সখী-সম্ভাষণে গেলেন। বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন,—"আর ত কেউ নয়—আমাদের অমুক। তার সঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে চুল আঁচড়ালেও চল্‌বে।"—তিনি সেই ইংরাজসখীর সম্মুখীন হইবামাত্র—সেই মহিলাটি তাড়াতাড়ি নিজ চক্ষুযুগল হস্তে আবৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"Oh..............do up your hair quick, you are looking ugly"—"চুলগুলি শীগ্‌গির কপালের উপর থেকে তুলে নাও, তোমায় বিশ্রী দেখাচ্চে।"—কুশ্রীতা যে মানুষের চক্ষুকে বাস্তবিকই আঘাত করিতে পারে, এই ঘটনা হইতে সেটি বেশ বুঝা যায়।

শেষ কথা ইংরাজ-রমণীর সতীত্ব। আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন—ইংরাজ-স্ত্রী-সমাজে সতীত্বের মর্য্যাদা কিরূপ? আমি উত্তর দিই, বড় বড় ঘরের কথা আমি জানি না, সে দলের সহিত মিশিবার কোনও সুযোগ পাই নাই—কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর কথা বলিতে পারি—তাঁহাদের

মধ্যে সতীত্বের মর্য্যাদা যে আমাদের অপেক্ষা কম, এমন বোধ হয় না। তবে সহরবাসী নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে—অর্থাৎ যাহারা কার-



প্রতীক্ষায়।

খানায় বা দোকানে গতর খাটাইয়া খায়, তাহাদের মধ্যে সতীত্ব জিনিসটি খুব সুপ্রাপ্য নয়। আমি তিন বৎসরকাল সে দেশে একটি মধ্যবিত্তশ্রেণীর



পরিবারমধ্যে, পরিবারস্থ একজনের মতই বাস করিয়াছিলাম। সেই সূত্রে আরও অন্যান্য পরিবারের সহিতও আমার মেলামেশার সুযোগ হইয়াছিল। তাহাদের সকলের বাড়ীতে বড় বড় মেয়েরও অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে, কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত, পরিচিত কোনও মেয়ে সম্বন্ধে ঘৃণাক্ষরেও কোনও অপবাদের কথা আমি শুনি নাই।

উক্তপ্রকার উত্তর শুনিয়া বন্ধুবান্ধবেরা আমার কথা বিশ্বাস করেন না। বলেন—"তুমি ইংরাজের স্তাবক—তাহাদের দোষ দেখিতে পাও না।"

বন্ধুবান্ধবের অবিশ্বাসের কারণ এই যে, এ দেশে প্রবাসী ইংরাজ-সমাজসম্বন্ধে তাঁহারা অন্যরূপ দেখিয়া ও শুনিয়া থাকেন। আমি বিলাতে যাঁহাদের গৃহে থাকিতাম, সেই বর্ষীয়া গৃহিণী একদিন আমায় কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্বে বরাবর আমার সাধ ছিল, আমার স্বামী ইণ্ডিয়াতে কোনও চাকরী গ্রহণ করেন, আমরা সকলে ইণ্ডিয়াতে যাই। তাহার পর রাডিয়ার্ড কিপ্লিংয়ের পুস্তক পড়িলাম। কিপ্লিং, ভারত-প্রবাসী ইংরাজসমাজের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অবধি ইণ্ডিয়াতে গিয়া বাস করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছি।"

বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের প্রসিদ্ধ অনুবাদকর্ত্রী শ্রীমতী মিরিয়াম নাইট মহাশয়া তখন লণ্ডনে ছিলেন, তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদিন তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আপনি ত বহুকাল ভারতবর্ষে ছিলেন, কিপ্লিং তাঁহার পুস্তকে, ভারতপ্রবাসী ইংরাজ-সমাজের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা যথার্থ না অতিরঞ্জিত?"



বৃদ্ধা অবনত-নয়নে বলিলেন—“দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, কিপ্লিং-বর্ণিত চিত্রগুলি অতিরঞ্জিত নহে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“ইহার কারণ কি? এ দেশের এই সকল মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরাই ত অধিকাংশ ভারতবর্ষে যায়। সেখানে গিয়া অমন হইয়া যায় কেন?”

শ্রীমতী নাইট্‌ উত্তর করিলেন—“এ দেশে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মেয়েরা সর্ব্বদাই গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকে। চাকর-বাকর এখানে ব্যয়সাধ্য, সুতরাং সংসারে সকলকেই খাটিতে হয়। এই মেয়েরা ভারতবর্ষে গিয়া দেখে, ডজন ডজন দাস-দাসী হুকুমের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে নিজ হাতে কুটাটিও সরাইয়া রাখিতে হয় না। আলস্যময় জীবন ঐরূপে বিকৃত হইয়া যায়। সেই প্রবাদ জান ত—অলস ব্যক্তির মনটি সয়তানেরই কারখানা।”



লেখক—শ্রীসরোজকুমার ঘোষ।

বঙ্গনারী

(১)

কাব্য, উপন্যাস, গল্প ও সাহিত্যে বঙ্গ-রমণীর কত বিচিত্র চিত্রই না অঙ্কিত হইয়াছে। তথাপি আমাদের এই সুজলা সুফলা শ্যামা জন্মভূমির নারী-সৌন্দর্য্য এবং চরিত্রের আলোচনা করিবার জন্য প্রাণে একটা ব্যাকুলতা জন্মে। নারী বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কি না, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইহা যে তাঁহার এক মধুর, মনোরম এবং অপূর্ব্ব সৃষ্টি, পৃথিবীর কবিগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গরমণীকে আমি বড় শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, মনে হয়, এমন মধুর ও সুন্দর সৃষ্টি পৃথিবীতে আর কিছু

নাই। বাঙ্গালার নারীজাতির সহস্র ত্রুটি, সহস্র অসম্পূর্ণতা থাকিলেও তাঁহারা আমাদের গৌরবের সামগ্রী। বাঙ্গালার এক শ্রেষ্ঠ কবি বঙ্গনারীর গুণানুকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া পূর্ণ-কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন:—

"কে বলে বিলাতী লিলি নলিনীর উপমা,
দেশে যে কুমুদ আছে,
আসুক তাহার কাছে,
তখনই বুঝিয়া লব কার কত গরিমা!"

আজ নিশীথ রাত্রিতে চন্দ্রালোকিত শারদাকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া কবির এই বঙ্গ-নারী-স্তোত্র-কথা মনে পড়িতেছিল। ভাবিতেছিলাম, দারিদ্র্য-নিপীড়িত, রিক্ত-সর্ব্বস্ব বঙ্গদেশে গর্ব্ব করিয়া সভ্যজাতির সম্মুখে দাঁড় করাইবার যে কয়টি বিষয় আছে, তন্মধ্যে বঙ্গ-রমণী অন্যতম। কিন্তু সেই নারীজাতিকে কি আমরা সকলে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া থাকি? না, শুধু কবির দোহাই দিয়া সভ্য-সমাজের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বঙ্গনারীর জয় ঘোষণা করি? কথাটা ভাবিয়া দেখিবার।

শ্রান্ত বাতাস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গেল। আকাশে নক্ষত্র-পুঞ্জ কাঁপিতেছে। হৃদয়ের মধ্যে একটা অতৃপ্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হইল। রঙ্গমঞ্চের পট-পরিবর্ত্তনের ন্যায় মানসনেত্রে একে একে নারী-সমাজের দৃশ্যাবলী আবির্ভূত হইতে লাগিল।

নগরের নারী-সমাজে বিভিন্ন স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি স্তর সহসা মানবচিত্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই স্তরকে



নগরের বিলাসিনীসম্প্রদায় আখ্যা দান করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না। পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণে এই স্তরের উদ্ভব। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালার নারী-সমাজে এ স্তরটি নিতান্তই নগণ্য ও মুষ্টিমেয় ছিল; কিন্তু এখন ইহার প্রভাব সারা বঙ্গে ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিয়াছে। ইহাঁরা নব নব ফ্যাসান আমদানী করেন; বসন, ভূষণ, অঙ্গরাগ ও বিলাস উপকরণের জন্য অনুক্ষণ বিব্রত। শিষ্টাচারে ইহাঁরা অগ্রগণ্যা। আলাপ-ব্যবহারে কোন ত্রুটি দেখিতে পাইবে না। রঙ্গ-রস, হাস্য-পরিহাস এবং আলাপ ও আলোচনায় ইহাঁদের সংযম প্রশংসনীয়। হাস্য কখনও নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া যায় না, আলাপও গণ্ডীর রেখা উল্লঙ্ঘন করে না। সহবৎ, ভব্যতা এবং আদব-কায়দার শিক্ষা অনুকরণীয় কি না, বলিতে পারি না, তবে তাহা উল্লেখযোগ্য। জীবনটা যে শুধু আমোদ-প্রমোদ এবং বিলাস-ব্যসনে মগ্ন করিয়া রাখিবার বিষয়—সে যে শুধুই স্বপ্ন, শুধুই গান, শুধুই আনন্দ—ইহা ছাড়া আর কিছু আছে, তাঁহাদের জীবনযাত্রা দেখিয়া তাহা অনুমান করা সুকঠিন। ঘড়ীর কাঁটার মত তাঁহাদের সংসারের যাবতীয় কার্য্য নিয়ন্ত্রিত। প্রভাতে উঠিয়া সকলে একত্র বসিয়া চা-পান, বাথ-রুমে স্নান, প্রসাধন, বেশ-পরিবর্ত্তন সমস্তই যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা আনন্দ লাভ করেন। রন্ধনাগারের ভার বাবুর্চ্চি বা পাচকের হস্তে। বাজার—বেহারা অথবা বাজার-সরকার করিয়া আনে। সে সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার অবকাশ তাঁহাদের অতি অল্প।

স্বামী কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলে ভামিনীগণ হয় উপন্যাস বা কাব্য পাঠ করেন, নয় ত কোন কবিতা, গল্প বা উপন্যাস রচনায় আনন্দ লাভ করেন,

(কিন্তু এরূপ রমণীর সংখ্যা অঙ্গুলির অগ্রভাগে গণনীয়) কেহ কেহ সূক্ষ্ম শিল্প, চিত্র অথবা সূচিকর্ম্মে মধ্যাহ্নের অবসর কাটাইয়া দেন। সখীজন অথবা আত্মীয়-বন্ধু কেহ আসিলে কেহ কেহ হারমোনিয়ম অথবা পিয়ানোর সুরে কণ্ঠ মিশাইয়া সঙ্গীতালাপ করিয়া থাকেন। ব্যবহার্য্য বসনভূষণের প্রয়োজন হইলে ভামিনী স্বয়ং বাজারে যাইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। প্রবাসী আত্মীয় গৃহে ফিরিলে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার উৎসাহ ইহাঁদের মধ্যে বিলক্ষণ প্রবল, তজ্জন্য কোনরূপ সঙ্কোচ তাঁহাদের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায় না। সভা-সমিতি অথবা সান্ধ্য ভোজ-উপলক্ষে অভিভাবকসহ ইহাঁরা সর্ব্বত্রই গমন করেন। নিমন্ত্রণ-রক্ষা শিষ্টাচারের এক প্রধান অঙ্গ। লোকহিতকর অনুষ্ঠানে ইহাঁদের সহানুভূতির অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য চীরধারী ভিখারী ইহাঁদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতে ভীত হয়, কিন্তু কোন সভা-সমিতির চাঁদার খাতা হাতে লইয়া ভদ্রবেশী সাহায্য-প্রার্থী ইহাঁদের নিকটে অগ্রসর হইলে প্রায়ই তাঁহাকে ব্যর্থ-মনোরথে ফিরিতে হয় না।

এই স্তরের ভামিনীগণ যে সকলেই সুন্দরী, তাহা নহে। কিন্তু বেশ-বিন্যাসের ভঙ্গী, প্রসাধন-নৈপুণ্য এবং অঙ্গরাগের প্রভাবে প্রথম দর্শনেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু কবির ভাষায়—"দূর হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি" যেমন মধুর ও সুন্দর দেখায়, তীরে উঠিলে আর তেমন মনে হয় না। বিলাসিনী-স্তরের অনেকের সম্বন্ধেই এ কথা খাটে।

সন্তানের লালনপালন-সম্বন্ধে ইহাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব পূর্ণ-মাত্রায় প্রবল। মাতৃবক্ষের অমৃতধারা-পানে কদাচিৎ কোন শিশু পরিতুষ্ট হয়। ধাত্রীর স্তন্য অথবা "ফিডিং" বোতলস্থিত গব্যরসধারাতেই শিশুর



পানতৃষ্ণা এবং ক্ষুধার জ্বালা প্রশমিত হইয়া থাকে। পুত্র-কন্যার শিক্ষার ভার কিন্তু জননী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বালক-বালিকা



জননীর কাছেই সহবৎ শিক্ষা করিয়া থাকে। তাহারা যাহাতে শৃঙ্খলা ও নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, সে বিষয়ে অধিকাংশ জননীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। বিলাস-ব্যসনে দিবারাত্র মগ্ন থাকিলেও সন্তানপালনসম্বন্ধে তাঁহাদের কর্ত্তব্য শিথিল নহে। আহারকালে পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলেই একত্র একস্থানে বসিয়া ভোজন করেন। তখন গুরু-লঘু-ভেদ-জ্ঞান হিসাবে আহারের তারতম্য হয় না।

ধর্ম্মমতসম্বন্ধে এই স্তরের নারীগণের মধ্যে আন্তরিকতা বিরল। ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু কতটুকু শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আছে, তাহা বিচার করিবার বিষয়। ভগবান্ আছেন, সে বিশ্বাস সকলের মধ্যেই থাকিতে পারে, নাস্তিক কেহই নহেন, কিন্তু ভক্তিনিষ্ঠা এবং একাগ্রতার অভাব অধিকাংশের মধ্যে পরিস্ফুট। ইহাঁরা স্বামীর সহায়, সখী ও সচিব হইতে পারেন, কিন্তু কুললক্ষ্মী, ভার্য্যা, গৃহিণী ও সহধর্ম্মিণী নহেন।

আর এক স্তরের নারী আছেন, তাঁহারা বিলাসিনীসম্প্রদায়ের অন্তর্গতও নহেন অথবা গৃহিণী বা সহধর্ম্মিণীর স্থান অধিকার করিবার স্পর্দ্ধাও রাখেন না। তাঁহাদিগকে লোকে "পটের বিবি" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বসন-ভূষণে তাঁহারা বিলাসিনী সাজিতে ভালবাসেন। গঙ্গাতীরে বাস সত্ত্বেও স্নিগ্ধ ভাগীরথীসলিলে অবগাহন-স্নানের সৌভাগ্য এক পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ ব্যতীত ইহাঁদের অদৃষ্টে ঘটে না। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস, গঙ্গার জলে বর্ণ মলিন হয়। সুন্দরীরা সাবান ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু মস্তকে নহে। ইহাঁদের ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাজি সুগন্ধ তৈলে চর্চ্চিত, সীঁথির উভয় পার্শ্বে সহ্যাদ্রিমালা বিরাজিত।



গৃহকর্ম্ম দাসদাসীর উপরই ন্যস্ত। সন্তানপালনের ভার কিছু দাসদাসীর উপর, কিছু বা স্বামীর স্কন্ধে। অখাদ্য হইলেও উৎকলদেশীয় পাচকবরের বিচিত্র রন্ধনের উপর প্রধানতঃ ইহাঁদিগকে নির্ভর করিতে হয়। কারণ, রন্ধনশালার ধূম্রজাল এবং অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিবার সামর্থ্য দেহে নাই। স্বামীও পত্নীর কুসুম-কোমল তনুলতা এলাইয়া পড়িবার ভয়ে তাঁহাদিগকে রন্ধনাগারের চৌকাঠ পার হইতে দেন না। অত্যধিক কাব্য আলোচনা এবং উপন্যাসপাঠে তাঁহাদের অধিকাংশেরই শরীরে হিষ্টিরিয়ার প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। পত্নীবৎসল ভর্ত্তা স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য অবিশ্রান্ত নাটক ও উপন্যাস যোগাইয়া থাকেন, নহিলে দীর্ঘ অবসর কোমলাঙ্গীরা যাপন করিবেন কিরূপে ?

সপ্তাহে দুইবার না হউক, অন্ততঃ এক দিনও রঙ্গালয়ে না গেলে ইহাঁদের চলে না; বাস্তবিক ইহাঁরা নগরের রঙ্গালয়গুলির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ছাত্র এবং শিক্ষিতা বঙ্গনারীর আনুকূল্যের অভাব হইলে এত দিনে বাঙ্গালাদেশের রঙ্গালয় ও ঔপন্যাসিক মাসিক-পত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা কল্পনা করিতেও মন শিহরিয়া উঠে।

সন্তান-পালনের সহিষ্ণুতা না থাকিলেও ইহাঁদের শিশুগণ মাতৃস্তন্যপানে বঞ্চিত হয় না। সেবা-প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগিয়া থাকে। কিন্তু সামর্থ্যে কুলায় না বলিয়া তাঁহারা সে পুণ্য হইতে বঞ্চিতা। স্বামীর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজনে ইহাঁরা বীতস্পৃহ নহেন। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা করা তাঁহাদের সকলের দ্বারা ঘটিয়া উঠে না। সেটা বিধিলিপি কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল যে, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।



দেব-দ্বিজে ইহাঁদের শ্রদ্ধা আছে, ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে। পুণ্যানুষ্ঠানে স্পৃহা আছে, কিন্তু নাই শুধু মনের একাগ্রতা। অন্তরে প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি, ভক্তি, করুণা সবই আছে, শুধু কেমন করিয়া তাহার বিকাশ হয়, তাহাতে কত সুখ, কত পুণ্য, সেবায় কত মাধুর্য্য, কত তৃপ্তি, সেই শিক্ষা-টুকু বিদ্যালয়ে বা গৃহে তাঁহাদের অধিকাংশই হয় না।

তৃতীয় স্তরের নারী নগরের নারী-সমাজের মেরুদণ্ড। বিলাসব্যসনের সহস্র প্রলোভন সত্ত্বেও তাঁহারা বিলাসিনী নহেন। তাঁহাদের দেহ মার্জ্জিত, বসন পরিচ্ছন্ন, কেশে গন্ধতৈল ; কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগকে বিলাসিনী বলা চলে না। তাঁহারা দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জয়-মাল্য লাভ করিয়া থাকেন। পরিশ্রান্ত স্বামী গৃহে ফিরিলে স্বহস্তে পতি-দেবতার সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবায় কাতরা নহেন। সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার কাহা-রও উপর অর্পণ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন না। তাঁহারা স্বামীর গৃহিণী, সচিব, সখী, ভার্য্যা, প্রণয়িনী এবং সহধর্ম্মিণী। ভিক্ষুক এই সকল কুললক্ষ্মীর দ্বার হইতে কখনও ব্যর্থ-মনোরথে ফিরে না। দেবতা ও ব্রাহ্মণ এই সকল কল্যাণীর শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য লাভ করিয়া সুখী। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোক-রশ্মি ইহাঁদের চারি পার্শ্বে সমুজ্জ্বল, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি নিষ্ঠা তাহার আলোকে প্রভাবিত হইয়া সত্যকে আরও দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বদা গঙ্গাস্নানের অবসর না পাইলেও সুযোগ ঘটিবামাত্র গভীর ভক্তি ও আগ্রহে তাঁহারা ভাগীরথীর স্নিগ্ধ পবিত্র নীরে

অবগাহন করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করেন। বর্ণের মলিনতার জন্য আশঙ্কা তাঁহাদের চিত্তে কখনও স্থান পায় না। কাব্য-উপন্যাস-পাঠে তাঁহাদের বিতৃষ্ণা নাই, থিয়েটার দেখিবার জন্য আগ্রহের অভাব নাই, কিন্তু তজ্জন্য উন্মত্ততা কখনও লক্ষিত হয় না। তাঁহাদিগকে 'বামুন দিদি কখনও খাওয়াইয়া দেয় না, দাসীরাও আঁচাইয়া দেয় না।' সকলেরই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ নহে; সভ্য-সমাজের রোগ তাঁহাদের দেহেও দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তথাপি গৃহকর্ম্মে তাঁহাদের ঔদাসীন্য নাই। রোগশয্যায় থাকিয়াও স্বামি-পুত্রের তত্ত্বাবধান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। জননীর স্নেহশীতল বক্ষে শিশু লালিত হয়। দাসদাসীর হস্তে তাহাদের পরিচর্য্যার ভার থাকে না। কন্যাগণ বালিকা-বয়সেই জননীর নিকট ব্রতকথা শিখে, শিবপূজা, গঙ্গাপূজার মন্ত্র জানিয়া লয়। ইহাঁরা রন্ধনাগারে দ্রৌপদী; শুধু পাচক-ব্রাহ্মণের কদর্য্য অন্নব্যঞ্জনে স্বামিপুত্রের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয় না। কাব্য-উপন্যাসে আসক্তি সত্ত্বেও মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠে তাঁহাদের শ্রদ্ধার অভাব নাই। অবসরকালে সূচিকর্ম্ম অথবা সূক্ষ্ম শিল্পের চর্চ্চা করিয়া ইহাঁরা কলাবিদ্যার প্রতি অনুরাগ দেখান এবং গৃহস্থালীর অভাব মোচন করিয়া লন।

নগরে আর এক স্তরের নারী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সমাজের চক্ষে ঘৃণিত ও দূষিত জীব; কিন্তু তথাপি এই বারযোষিৎ-সম্প্রদায় বঙ্গললনাকুলের অংশবিশেষ। ইহারা যতই অস্পৃশ্য এবং ঘৃণিত হউক না কেন, ইহাদিগকে বাদ দিয়া বাঙ্গালার নারী-সমাজের পরিচয় দিতে

গেলে একাংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ব্যবসায় অবলম্বনের পূর্ব্বে ইহাদের অনেকেই বাঙ্গালার কুলবধূ ছিল; কিন্তু কর্ম্মফলে—কেহ বা



আপাতমধুর বিলাসভোগ চরিতার্থ করিবার বাসনায়, কেহ বা অপরিণত বুদ্ধিবশে অসংযতচিত্তের যৌবন-ভোগতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য পরের কুহকে



মজিয়া, কেহ বা দগ্ধ উদরের পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য এই দুরপনেয় কলঙ্ক-পসরা মাথায় করিয়া লইয়াছে। সর্ব্বদা বিলাসিতার আবিল স্রোতে ভাসাইয়া দিলেও ইহাদের সকলেরই হৃদয় যে একেবারে পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছে, এমন কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিলে সত্যের অপমান করা হয়। দয়া, মায়া, ভক্তি, স্নেহ ও ভালবাসা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলি যে একেবারে সকলেরই হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। সর্ব্বদা নানাবিধ সামাজিক পাপানুষ্ঠানে রত থাকিয়াও এই সকল মন্দভাগিনীর অনেকেরই হৃদয়ে দেবার্চ্চনা, নিষ্ঠা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রবৃত্তি সমধিক প্রবলা।

(২)

নগরের কোলাহল ছাড়িয়া পল্লীলক্ষ্মীর শ্যামল অঞ্চলের স্নিগ্ধ ছায়ায় যিনি কোন দিন বিশ্রাম-সুখলাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহার পক্ষে পল্লীরমণীর চরিত্র-মাধুর্য্য ও বৈচিত্র্য সম্যক্ অনুমান করা সহজসাধ্য নহে। নগরের ন্যায় পল্লীতেও স্তরবিভাগ আছে বটে, কিন্তু পার্থক্য অতি সামান্য। নগরের নারী-সমাজে বৈচিত্র্য অধিক; কিন্তু পল্লী-রমণীর সকল স্তরেই প্রকৃতির সামঞ্জস্য বড় অপূর্ব্ব। সত্য বটে, সেখানে ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, শিক্ষিতা, অর্দ্ধশিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতা—সকল শ্রেণী এবং সর্ব্ব-স্তরের নারী আছেন, কিন্তু তাঁহাদের চারিত্র্যগত এবং আচারগত পার্থক্য বড় বেশী নয়। সংসারধর্ম্মসম্বন্ধে, ধনীর গৃহিণীই হউন, বা দরিদ্রের কুললক্ষ্মীই হউন, সকলের আচারই সমান। প্রভাতে উঠিয়া প্রচলিত রীতি অনুসারে



সকলেই গোময় দ্বারা গৃহাঙ্গন পবিত্র করেন। দাস-দাসী সত্ত্বেও ধনীর ভার্য্যা দরিদ্রের স্ত্রীর মত স্বহস্তে গৃহদ্বার সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিতে কুণ্ঠিত হন না। পাচক-পাচিকা সত্ত্বেও তিনি স্বামি-পুত্র শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর জন্য স্বহস্তে পাক করিয়া থাকেন। সকল স্তরের পল্লীনারীই অন্নপূর্ণা! পরিজন এবং অতিথি-অভ্যাগতের একজনও অভুক্ত থাকিতে তাঁহারা কখনও আহার করিবেন না। রাখিয়া ঢাকিয়া, ওজন করিয়া আলাপ-পরিচয়ে তাঁহারা অভ্যস্ত নহেন। যখন হাসি আসে, প্রাণ খুলিয়াই হাসেন, ক্রোধ হইলে দিল খোলসা করিয়াই ক্রোধ প্রকাশ করেন। ঝগড়া করিতে হইলে রাখিয়া ঢাকিয়া করেন না। যেন নদীর স্রোতের মতই বেগশালী; ডুবাইয়া তলাইয়া কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায় অর্থাৎ কোন বিষয়েই আন্তরিকতার অভাব নাই।

গ্রামে কাহারও বাড়ী ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে রন্ধনে পারদর্শিনী পল্লীরমণীগণ তাঁহার গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া আনন্দপূর্ণচিত্তে সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। সম্মানের লাঘব হইবে, এরূপ ধারণা তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না। পাচক ব্রাহ্মণের প্রত্যাশায় কেহ বসিয়া থাকে না। পল্লী-অঞ্চলে এ দৃশ্য বিংশ শতাব্দীতেও বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। কটিদেশে বস্ত্রাঞ্চল আবদ্ধ করিয়া তাঁহারা যখন অন্নপূর্ণামূর্ত্তিতে অন্ন বিতরণ করিতে থাকেন, তখন শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিস্ময়ে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অগ্নির উত্তাপে আরক্ত আনন ও শুভ্র ললাটে স্বেদ-জল ঝরিতেছে, সারা দিনের অসামান্য পরিশ্রমে তনুলতা শ্রান্ত, তথাপি নয়নে কি উৎসাহের উজ্জ্বল দীপ্তি!



রোষ-বিহ্বলা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

[illegible] দেবী [illegible] দ্বারেতে [illegible] হইলেন

নগরে নারী-পার্লামেণ্ট বড় দেখা যায় না। কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে তাহার অভাব আদৌ নাই। মধ্যাহ্নভোজন-শেষে পাড়ায় পাড়ায় নারীমজ্‌লীস। কোথাও হয় ত কোন বর্ষীয়সী চরণযুগল প্রসৃত করিয়া সুরসংযোগে রামায়ণ অথবা মহাভারত পাঠ করিতেছেন, তাঁহার চারি পার্শ্বে বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাগণ বসিয়া নিবিষ্টমনে পুণ্যকথা শুনিতেছেন। কোন মজ্‌লীসে অমুকের পুত্র তাহার মাতার সহিত কিরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন ও সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। কোথাও বা অন্য নানারূপ গ্রাম্য বিষয়ের আলোচনা বিপুল উৎসাহের সহিত চলিতেছে। এইরূপে মধ্যাহ্নের অবসর চলিয়া যায়।

অপরাহ্নে রৌদ্র যখন গাছের শীর্ষে রক্তরাগ ঢালিয়া দিয়া বিদায়ের চেষ্টা করিতে থাকে, তখন পল্লীবালাগণ কলসীকক্ষে সন্নিহিত দীর্ঘিকার কালো জলে গাত্র ধৌত করিতে যান। সেখানে পরস্পরের সুখদুঃখ সাধ-আহ্লাদের কত কথাই আলোচিত হয়। পুষ্করিণীর তীর একটা মিলন-ক্ষেত্র। পল্লীরমণীরা সেই মিলন-ক্ষেত্রে অল্পক্ষণের জন্য আসিলেও ভাবের আদান-প্রদান ঘটিতে বিলম্ব হয় না।

শিষ্টাচারে পল্লী-রমণী-সমাজ নগরের নারী-সমাজের সমকক্ষ নহে, সে কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিতে হইবে। শিষ্টাচার যেখানে প্রবল, আন্তরিকতার প্রভাব সেখানে অল্প, ইহা স্বয়ংসিদ্ধ সত্য। রুচি হিসাবে নগরের বিলাসিনীগণ পল্লীরমণীদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া হয় ত নাসিকা কুঞ্চন করিতে পারেন, কিন্তু চরিত্র-মাধুর্য্যে কাহারা প্রশংসালাভের অধি-কারিণী, তাহার বিচারভার পুরুষের উপরে ন্যস্ত।

সৌন্দর্য্য

পল্লীর আকাশে নক্ষত্রমালা ফুটিয়া উঠিলে গৃহে গৃহে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠে, পরিচ্ছন্ন গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত তুলসীমঞ্চের নিম্নে গললগ্নবাস।



কুললক্ষ্মীগণ গৃহের কল্যাণ ও স্বামিপুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেন ; সে দৃশ্য কি মধুর, কি মর্ম্মস্পর্শী ! গ্রামের দেবালয়

হইতে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি সুদূর অম্বর-পথে উত্থিত হইয়া সমগ্র পল্লী-স্ত্রীকে রমণীয় করিয়া তুলে।



পল্লী-লক্ষ্মীগণের দেবতা-বিগ্রহের প্রতি নিষ্ঠা ও ভক্তি কিরূপ প্রগাঢ়, তীর্থক্ষেত্রে তাহার পরিচয়। কালীঘাট, কাশী, পুরুষোত্তম-প্রভৃতি তীর্থস্থলে



যাঁহারা কখন গিয়াছেন, তাঁহারাই এই সার সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গালার কুললক্ষ্মীগণের ধর্ম্মানুরাগবশতঃ ধর্ম্মহীন আমরা এখনও একেবারে অধঃপাতে যাই নাই। নগরের বিলাসিনীগণ এই সব তীর্থে ভ্রমণোদ্দেশে সমবেত হন। কিন্তু পল্লীর নারীসমাজ শুধু বায়ু-পরিবর্ত্তনের অভিলাষে যান না। তাঁহারা দেবদর্শন ও পুণ্যানুষ্ঠানের আগ্রহ লইয়াই এই সকল তীর্থে সমবেত হন। দেবতা-দর্শনের জন্য ইহাঁদের নয়নে, আননে এবং ব্যবহারে যে আগ্রহ এবং উত্তেজনা লক্ষিত হয়, তাহা বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয়।

পল্লীগ্রামে আর এক স্তরের নারী আছেন, তাঁহারা বালবিধবা। বাঙ্গালার অধিকাংশ পল্লীর অধিকাংশ গৃহে এই দেবী-চরিত্রা নারীমূর্ত্তি বিরাজিতা। ইহাঁদের জীবনাকাশে উষার অরুণ রেখা ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই নিবিড় নীরদজালে গগন ছাইয়া গিয়াছে, বসন্ত না আসিতেই মুকুল ঝরিয়া পড়িয়াছে। সংসারের প্রবল ঝঞ্ঝাবেগ সহ্য করিয়া এই দেবীগণের কেহ ভ্রাতা, কেহ বা দেবর অথবা ভাশুরের, কেহ বা ভগিনীর সংসারের সকল ভার স্কন্ধে লইয়া দৃঢ়-চিত্তে বৈচিত্র্যহীন, ভোগবিলাসহীন জীবন যাপন করিতেছেন। সেবাতেই ইহাঁদের সুখ, পরার্থেই ইহাঁদের তৃপ্তি, অযাচিত স্নেহ ও করুণা বিলাইয়াই ইহাঁরা জীবন সার্থক বোধ করেন। সন্তানের জননী না হইয়াও মাতৃত্বের পরিপূর্ণ স্নেহামৃতধারায় ইহাঁরা মানবকে স্নিগ্ধ ও পবিত্র করিয়াছেন। সংসারের পিচ্ছিল পথে অবিশ্রান্ত বিচরণ করিয়াও পদস্খলিত হন না। জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধনের অভাবসত্ত্বেও স্নেহডোরের অভাব ইহাঁরা বোধ করেন না। প্রধান



কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার না থাকিলেও অনন্ত-বিস্তৃত কর্ত্তব্যের মালভূমি তাঁহাদের সম্মুখে প্রস্তৃত। অশেষ কল্যাণদায়িনী, পুণ্যময়ী, স্নেহশীতল-হৃদয়া বঙ্গীয় বালবিধবাদিগের পবিত্র চিত্র স্মরণ করিলেই হৃদয় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে; ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া পড়ে।

পঞ্চম লহরী

রক্ষণ



লেখক—শ্রীঅমৃতলাল বসু

ফ্যাসান

—কিসে মন পাই—

কি করিলে বল নাথ তব মন পাই।
কি পিপাসা পোষো প্রাণে বল না সুধাই॥
বল কি সুন্দর সাজে,
রূপ তব হৃদে রাজে,
কি ছবি লিখেছ করি প্রেমতুলিকায়।
কেমন সাজিলে আমি তেমন দেখায়॥
বনের বিহঙ্গবালা,
তোমারে দিয়াছে মালা,
তুমি দাও আলো করে' আঁধার হৃদয়।
রবিকর বিনা শশী উজল না হয়॥

সৌন্দর্য্য

বল বল প্রিয় স্বামি,
হব কোন্ পথ-গামী,
কিসে বা তুষিব আমি তোমারে সেবায়
কেমনে কামিনী স্থান পাবে প্রিয়-পায় ॥

কি বিদ্যা করিব শিক্ষা,
কেবা দিবে তার দীক্ষা,
তোমা বিনে কার কাছে যাব সে ভিক্ষায়।
কার কাছে হেসে জয়ী হব . পরীক্ষায় ॥

আরশি করেনি ভুল,
দেখ না তুলিছে চুল,
আকুল চিকুরমূল ছুঁইতে চরণ।
ক্ষীরোদসাগরে ঢেউ নীরদবরণ ॥

বল না শিখিব সাধি,
কি ছাঁদে কবরী বাঁধি,
রাখিব কি এক-বেণী পিঠে ফেলে খুলে।
বাঁধিব বা এলোখোঁপা ফুলো-ফুলো-চুলে।

বেণীতে বেলের হার,
সীঁথিতে যূথির সার,
বেণীমূলে গুঁজিব কি গোলাপের কলি।
মুখপদ্মমধু কি গো পিবে মম অলি ॥



বলে তো আমারে লোকে,
কাজল জ্বলিছে চোখে,
উজল কি হবে আরো দীপশিখা পরে'।
আল্‌তা কি লাগে নাথ ললিত অধরে॥

ললাটে খয়ের-বিন্দু,
শোভিবে কি মুখ-ইন্দু,
নাসায় রসের কলি হবে কি ভূষণ।
মুকুতামালায় বুকে দেব কি আসন॥

লাল কানে দুল নীল,
থাবে কি রঙেতে মিল,
পরি যদি ক্ষীণ অঙ্গে নীলাম্বরী বাস।
কটিটি আঁটিয়া বেঁধে কাঞ্চনের পাশ॥

অলঙ্কার রচি রঙ্গে,
রঙিন কুসুম অঙ্গে,
পরে' কি সাজিয়ে সখা দাসী ফুলরাণী।
হরণ করিতে যাবে চরণ-দুখানি॥

করিব কি ত্যজে' লজ্জা,
বিলাতী বিবির সজ্জা,
শয্যাঘরে রুদ্ধদ্বারে সুমুখে তোমার।
তা'তে কি বাড়িবে রূপ বাঙালী-বামার॥



দুধে হবে বিধুমুখ,
উলঙ্গ আধেক বুক,
ঘাগরা ঘেরিয়া অঙ্গ লুটাইবে ভূমে।
কুঞ্চিত কুন্তলদল গ্রীবাতল চুমে॥

আছে অঙ্গ ছিপছিপে,
চলিব চরণ টিপে,
কর্‌সেটে ক্ষীণ কটি হবে মুঠি-ভোর।
সোহাগে শ্যাম্পেন্-পানে নেশায় বিভোর॥

নাম ধরে' ডেকে নাথ
হাত পেতে নেব হাত,
"ডিয়ার্ ডিয়ার্" বলে, প্রেম-আলিঙ্গন।
রঙ্গেতে ঢলিয়া অঙ্গে হব অচেতন॥

বল তো যাপিতে যামি',
তাপসী সাজিব আমি,
রুখুরুখু কেশরাশি এলাইয়ে রেখে।
বিভূতির ভাতি—কায়া পাউডারে ঢেকে॥

আকাশে নয়ন রেখে,
অধরে বিষাদ মেখে,
যৌবন যোগের ক্ষেত্রে যোগিনী উপাধি।
হৃদাসনে যোগাসনে যোগীর সমাধি॥



নিত্য নব-নারী-আশে,
পিপাসা যদি হে আসে,
আমার সকাশে সখা কর তা প্রকাশ।
এক জায়া শত কায়া করিব বিকাশ ॥

পুরুষ রসের কবি,
চায় নিত্য নব ছবি,
যত জানে তত বাড়ে জ্ঞানের পিপাসা।
বিস্তার বাঁধিয়া সীমা নাহি মিটে আশা ॥

খুলিয়া কল্পনাদৃষ্টি,
অভাব করিয়া সৃষ্টি,
হৃষ্ট মনে ঝাঁপ দেয় বিপদ্-পাথারে।
তুষ্ট তার নহে মন এক মিষ্ট তারে ॥

আমারে শিখালে বঁধু,
নিত্য দিব নবমধু,
এক অঙ্গে নানা রঙ্গে কলার বিলাস।
আমাতে দেখিবে তুমি যারে অভিলাষ ॥

হ'লে জায়া গুণযুতা,
জননী ভগিনী সুতা,
এক কায়া এক মনে হয় প্রয়োজনে।
নানা ফুল হব একা প্রমোদ-কাননে ॥



বসন্তের বিভাবরী,
কাঁপিতেছি থরথরি,
টলমল অঙ্গ-তরি যৌবন-তুফানে।
ঢলঢল প্রেমজল প্রাণে কানেকানে ॥

এস বঁধু বসি ছাদে,
আমি দেখি তুই চাঁদে,
চাঁদনীসাগরে দেব ছুজনে সাঁতার।
এক সুরে বাজাইব ছুটি হৃদি-তার ॥

নিঝুম নীরব রাত,
অলস আবেশে নাথ,
সোহাগে গলিয়া আমি গাহিব বেহাগ।
ঝরিবে অক্ষরে সুরে প্রেম-অনুরাগ ॥

কেশে কুন্তলীন-গন্ধ,
বাতাসে ভাসিবে মন্দ,
গীতচ্ছন্দ সনে হবে মধুর মিলন।
যাপিব যামিনী সারা করে' জাগরণ ॥

প্রিয়তমা যদি গীতে,
পারে মন কেড়ে নিতে,
পুরস্কার তবে তার দিও প্রাণধন।
সুখে বুকে তুলে ল'য়ে অধরে চুম্বন ॥



রঙ্গরাজ-রচিত।

অঙ্গরাগ

তোমার স্বামী সংসারের বন্ধুর, কর্কশ, কণ্টকাকীর্ণ পথে বাধা-বিঘ্ন-নৈরাশ্য-দাস্য-দুঃখাদির সহিত যুদ্ধ করিয়া কিসে তোমায় একটু সুখী করিবেন, কিসে তোমায় চিন্তাশূন্য আরামে রাখিবেন, সেই চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার শান্তি—তাঁহার তৃ[illegible] তোমারও কি কিছু করা উচিত নয়? প্রেমের এ প্রতিদান তু[illegible]ই দিতে পার। তোমার হাসি-হাসি মুখখানি তাঁহার রাশীকৃত দুঃখকে অতল জলে ডুবাইয়া দিতে পারে; তোমার সুন্দর চোখ দুটির সুমিষ্ট দৃষ্টি জগতের সমস্ত বীভৎস-বিভীষিকা ভুলাইয়া ব্যাচারীকে শান্তির সুধা-সাগরে ভাসাইতে পারে। অর্থোপার্জ্জন—চেষ্টাজনিত শ্রম ও কার্য্যের হস্ত হইতে ক্ষণিক অব্যাহতি পাইয়া সে তোমার সঙ্গসুখে একটু আরাম—একটু মাধুর্য্য পাইলেই পরিতৃপ্ত হয়। সে মোম দিয়ে পেটে-পাড়ার দিন চলিয়া গিয়াছে, সে তেল-চকচুকে মুখে আর এখনকার পতির প্রাণে সুখোদয় হয় না; আর সে



কপালের উল্কির ভেল্কিতেও এ যুগের পতির চক্ষু মোহিত হয় না। এখনকার স্বামী ইংরাজী পড়িয়াছেন, ইংরাজী কাব্যের রসে তাঁহার প্রাণ ভিজিয়া আছে, তাঁহার মানস-প্রতিমায় বিলাতী ছবির ছায়া পড়িয়াছে। তাই বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের কাব্যসুন্দরীরা—সীতা-সাবিত্রীর ন্যায় বিনীতা পতিব্রতা সতী হইলেও কেমন একটু মেম-মেম! অর্থাৎ চুলগুলি কালো হোক্, কোঁকড়া হোক্—এক-ঢাল হোক্—কিন্তু কবরী-রচনায় একটু নূতন ভাব—একটু বিলাতী পারিপাট্যের আভাস থাকা চাই; সে তেলে জব্‌জবে কপালের উপর টেনে বাঁধা, আঁটা-সাঁটা খোঁপা এখন আর তোফা দেখায় না। মুখখানি একটু দুধে হবে—গাল দুটিতে গোলাপ ফুট্‌বে—তবে এখনকার প্রাণনাথ পায়ে লুট্‌বে। আসল কথা, নীরদবরণ চুলের লহর :দুলাইয়া, কালো চোখে মিষ্টি হাসি হাসিয়া, কপালে একটি ছোট খয়েরের টিপ্ পরিয়া, বুকে আঁটা-সাঁটা জ্যাকেট আঁটিয়া, চিকণ শাটীখানি ঘের দিয়া ঘুরাইয়া পরিপাটী করিয়া পরিয়া, অল্প হাল্‌কা গহনায় ভূষিতা হইয়া. একটি ক্ষীণাঙ্গী মেম কাছে আসিয়া বসিলেই এখনকার বঁধুর প্রাণে রাসলীলার মধুর উৎসব হইয়া থাকে! অবস্থা বুঝিয়া সিল্ক হইতে সেফালী ফুলের বোঁটায় রং করা সূতার শাটীতেও কলাকৌশলে নিপুণা চতুরা কামিনী স্বামীর এ সাধ মিটাইয়া দিতে পারেন।

চুলের কথা—

তোমার স্বাস্থ্য যদি ভাল না থাকে; ধূলামলা-ঘামে যদি মাথা ভরাইয়া রাখ,—তাহা হইলে হাজার সুগন্ধি কেশবর্দ্ধক তৈল মাখো না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। মস্তক উত্তমরূপে নিত্য পরিষ্কার করা আবশ্যক;



"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না উটি লজ্জাবতী লতা"

তৈল মাখিবে, চুলের গোড়ায় গোড়ায় যাহাতে তৈল প্রবেশ করে, তাহার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তা বলিয়া কলুর ঘানীতে চুলগুলি ডুবাইয়া ফেলিও না; তাহা হইলে তোমার মাথা অপরিষ্কার হইবে—বালিস অপরিষ্কার হইবে—পতির কর ও বক্ষ অপরিষ্কৃত হইবে। মাঝে মাঝে বেসনের সাহায্যে চুল পরিষ্কার করিবে। মেমেরাও স্নান-জলে বেসন বা ওটমিল মিশাইয়া দেন, তাহাতে জলের কাঠিন্য দোষ দূর করে—এবং অঙ্গের সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেয়। ভাল হইলে—চিরুণী-বুরুস যেমন কেশের সুহৃৎ, আবার মন্দ হইলে সেইরূপ শত্রু। কড়া বা দাঁড়া-ভাঙ্গা চিরুণী কখনই ব্যবহার করিবে না। চিরুণী ক্রয় করিবার সময়ে বেশ দেখিয়া লইবে, তাহার দাঁড়াগুলি যেন বেশ নরম, সরল এবং সমান ফাঁক ফাঁক হয়। সেই চিরুণী নিত্য উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লইবে। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা অনেকেই বুরুস ব্যবহার করেন না—কিন্তু একটু নরম বুরুস ব্যবহার করা প্রত্যেকেরই উচিত। দেখ, বনাত প্রভৃতি পশমী কাপড় পরিষ্কার করিতে হইলে, তাহা বুরুস করিতে হয়, একটু ভাল করিয়া বুরুস করিলে পুরাতন মলিন বনাত, কাশ্মিয়ার প্রভৃতি নূতনের ন্যায় উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন দেখায়। সেইরূপ মাথার চুলও ভাল করিয়া বুরুস করিলে তাহা চিক্কণ, উজ্জ্বল ও কোমল হইয়া ক্রমে তরঙ্গ-ভঙ্গি-ভঙ্গ লাবণ্য প্রাপ্ত হইয়া অতি সুন্দর হয়। বুরুস করায় আর এক উপকারিতা এই যে, মস্তকের চর্ম্ম বার বার মৃদুভাবে ঘর্ষিত হওয়ায় কেশমূল সকল অধিকতর রক্তসঞ্চারে উত্তেজিত হইয়া কুন্তলমালার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে।

যাঁহার চুল উঠিয়া যাইতেছে, তিনি যদি স্নানধৌত পরিষ্কৃত কেশ



প্রত্যেকবারে দশ মিনিট হিসাবে প্রত্যহ দুই বার বুরুস করেন, তাহা হইলে হাতে হাতে সুফল দেখিতে পাইবেন। বৈকালে কেশ-রচনার সময় অল্পমাত্রায় সুগন্ধি তৈল-ব্যবহার বিশেষ আবশ্যক। যদি বাজারে সুগন্ধি তৈল ক্রয় করেন, তবে হয় রোলাণ্ডের ম্যাকেসার অয়েল অথবা অধিক মূল্য দিয়া অপেরা অয়েল প্রভৃতির ন্যায় উৎকৃষ্ট কেশতৈল ক্রয় করিবেন। মূল্যবান্ উৎকৃষ্ট কেশতৈল হাতের কোষে করিয়া মাথায় মাখিতে হয় না, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা চুলের মূলে মাঝে মাঝে দিলেই মস্তকের উত্তাপে তাহা গলিয়া তরলতর হইয়া সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অক্ষম অবস্থায়—গৃহে একটি উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিবার সহজ উপায় বলিয়া দিই। অতি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ নারিকেল-তৈল ক্রয় করাইয়া আনিয়া, তাহা বেশ মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে, একটি ফাঁদালো বোতল বা জারের মুখে একটা টিনের ফুঁদেল বসাইয়া তাহাতে খানিকটা সাদা ব্লটিং কাগজ ফুঁদেলের মুখ চাপিয়া বসাইয়া দিবে, তাহার উপর খানকতক কাঠের কয়লা রাখিয়া তাহাতে ঐ তৈল ঢালিয়া দিলে ছাঁকিয়া যাহা পড়িবে, তাহা একেবারে মলাশূন্য বিশুদ্ধ হইবে—এবং অনেকটা আটা চলিয়া যাইবে; পরে ঐ তৈলে পচাপাতা, কিছু লতা-কস্তূরী ও গোটাকয়েক গেঁটেকস্তূরী দিয়া সপ্তাহকাল ভিজাইয়া রাখিবে ও একএকবার রৌদ্রেও দিবে। তাহার পর সেই মশলা-মিশ্রিত তৈল বেশ করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া এক বোতল তেলে বিশ পঁচিশ ফোঁটা বারগোমেট অয়েল মিশাইয়া দেখিও, কি সুন্দর তরল সুগন্ধি উত্তম তৈল প্রস্তুত হইল। চুলের সে সৌরভে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিবে।

মাঝামাঝি সরু সাঁতে কাটিয়া, মাথার চুল শিথিল ফুলো ফুলো রাখিয়া বেণী বদ্ধ করিবে; কবরীটি তোমার গ্রীবা চুম্বন করিয়া থাকিবে। এখন এক পাতা কাটা হয়েছে, তাহাতে চুল ভিজাইয়া ভিজাইয়া একরূপ চুলের মাথা খাওয়া হয়। আর যাঁহাদের কপাল বড় ও উঁচু, পেটে কতকটা নানাইয়া দিলে তাঁহাদের মানায় বটে, কিন্তু অনেক সুগঠিত ছোট-খাটো ললাটবিশিষ্টা সুন্দরীও পাতা কাটিতে কাটিতে চুলের সহিত ভ্রূর বিবাহ দিয়া দেন, কপাল আর দেখা যায় না। সাম্‌নের সাঁতির চুলগুলি একটু অঙ্গুরীয়াকারে কুঞ্চিত থাকিলে বড় মানানসই হয়। এই চুল-কুঞ্চনের সরঞ্জাম মায় স্পিরিট ল্যাম্প বাজারে ইংরাজ নাপিত প্রভৃতির দোকানে বিক্রয় হয়। মূল্য তত অধিক নয়, আর একবার ক্রয় করিয়া যত্ন করিলে আজীবন চলিতে পারে। চুলে ঢেউ খেলাইবার কাঁটা ও চিম্‌টা ঐ সকল দোকানেই অনধিক মূল্যে পাওয়া যায়। অক্ষম অবস্থায় একটি ছোট লোহার ছিঁচকের মত শলাকা অগ্নিতে তাতাইয়া, খানিকটা খবরের কাগজ জড়াইয়া টানিয়া লইবে, কাগজ যদি না পোড়ে, চুলও পুড়িবে না—সেই শলাকায় সম্মুখের চুলগুলি অঙ্গুরি আকারে জড়াইয়া, একটি ছোট তপ্ত চিম্‌টার দ্বারা চাপিয়া ধরিলেই চুল কুঞ্চিত হইয়া যাইবে। বাজে চুলের গুছি লইয়া ঐরূপভাবে দু'চার দিন অভ্যাস করিলেই কেশ-কলা শিক্ষা হইবে। চুলে কখনও সাবান দিবে না। চুল সর্ব্বদা বাঁধিয়া রাখিবে না, তাহাতে চুল নষ্ট হইয়া যায়। জাপানী মহিলারা শয়নকালে চুল খুলিয়া বিছানার নীচে ঝুলাইয়া দেন। আমাদের মহিলারা সমস্ত দিবস যতটা পারেন চুল খুলিয়া রাখিলে উহার মধ্যে

বাতাস খেলিয়া পরিষ্কৃত ও সুস্থ রাখিবে। চুল রৌদ্রে শুকাইলেই খুব ভাল।

মুখের কথা—

তৈলাক্ত মুখে রৌদ্র লাগাইলে ঐ তৈল রবির তাপে তপ্ত হইয়া ক্রমে মুখকে কতকটা বিবর্ণ করিয়া ফেলে। কি মুখ, কি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সকল স্থানেই তৈল-মর্দ্দন করা খুব ভাল, ইহাতে চর্ম্ম রুক্ষ, লোল ও খস্‌খসে হয় না, বেশ মসৃণ ও কোমল থাকে; কিন্তু রৌদ্র বা অগ্নির সম্মুখে যাইবার পূর্ব্বে মুখে তৈল মাখিলে মুখের বিবর্ণতা উৎপন্ন করে। সূর্য্যাস্তের পর অল্প সুগন্ধি তৈল মুখে মাখা খুব ভাল। রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপে যাইবার পূর্ব্বে মুখের লাবাণ্যরক্ষার একটি সহজ উপায় বলিয়া দিই। এক ছটাক গোলাপজল একটি শিশিতে ঢালিয়া তাহাতে দশ ফোঁটা গ্লিসারিন মিশ্রিত করিবে, সেই জল মুখে, কণ্ঠে, গ্রীবায়, করপৃষ্ঠে ও করতলে মাখিলে তাপ-জনিত উৎপাত হইতে বর্ণকে রক্ষা করিবে এবং চর্ম্ম অতি কোমল ও মসৃণ থাকিবে। মেয়েরা সাধারণতঃ মুখের জন্য অনেক প্রকার ক্রীম ব্যবহার করিয়া থাকেন; ক্রীম অর্থে সার পদার্থ—অর্থাৎ দুধের সর; কিন্তু বাজারে যে সব টয়লেট ক্রীম বিক্রয় হয়, তাহা চর্ব্বি, মাছের তৈল প্রভৃতির মিশ্রণে প্রস্তুত। আমাদের মেয়েরা চিরকালই মুখে দুধের সর মাখিতেন—এখনও সে প্রথা পরিহার করা উচিত নয়। দুগ্ধ বর্ণসাধনের প্রকৃষ্ট সহায়; আমরা দেবতাকে দুগ্ধে স্নান করাইয়া থাকি; পূর্ব্বে ভারত-বর্ষে এবং রোম প্রভৃতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্যে সাম্রাজ্ঞী ও সঙ্গতিসম্পন্না সুন্দরীগণ দুগ্ধে স্নান করিতেন;—এক্ষণে টাকায় চারিসের দরের দুগ্ধ উদরে

দিতেই কুলায় না, তা আবার স্নান! তবে গৃহস্থালী-শাস্ত্রে নিপুণা রমণীগণ মাঝে মাঝে চেষ্টা করিলে সংসারখরচের দুধ হইতেই সর কাটাইয়া লইতে পারেন। মসুরির ডালের সহিত চাঁপাফুলের পাতা বাটিয়া মুখে মাখিলে মুখ বেশ পরিষ্কৃত ও লাবণ্যময় হয়; কমলা-লেবুর খোসা বাটিয়া তাহার দ্বারা মুখ পরিষ্কার করিলেও ঐরূপ ফলপ্রদ হয়। মুখে ব্রণ হইলে টিপিয়া দেওয়া দূরে থাক—তাহাতে করস্পর্শও করিবে না, তাহা হইলে উহা আপনি শুকাইয়া যাইবে, কোন দাগ থাকিবে না এবং ব্রণও বেশী হইবে না। লাবণ্যবর্দ্ধনের আরও অনেক উপায় আছে,—ব্যয়বাহুল্য বলিয়া সেগুলির এখানে উল্লেখ করিলাম না। স্নানাদি অন্তে আর্দ্র গাত্রে থাকিবে না—আর্দ্র গাত্রে অনেকক্ষণ থাকিলে ক্রমে ক্রমে চর্ম্ম লোল হইয়া যায়। অঙ্গমার্জ্জনার বা মুছিবার সময় গামছা বা তোয়ালিয়া কখনই উপর হইতে নীচের দিকে ঘসিবে না, তাহাতে চর্ম্ম শীঘ্র লোল হইয়া যাইবে; স্মরণ রাখিও, অভ্যাস করিও, সকল সময়েই নীচের দিক্ হইতে মাজিতে বা মুছিতে।

পাউডার প্রভৃতির ব্যাপার—

গম্ভীর-প্রকৃতির লোকে বলিয়া থাকেন যে, বিধাতা যে রঙ দিয়াছেন, তাহার উপর আবার রঙ ফলাইবার আবশ্যক কি? অত তত্ত্ববিদ্ হইলে সুন্দরীর সুন্দর মুখখানির পানে চাহিয়া ধ্যানস্থ হইয়া ভাবিতে হয় যে, এই চামড়ার নীচে ত বিকট-দর্শন কঙ্কাল আছে, তবে আর এর সৌন্দর্য্য কোথায়? রঙ করিয়াছে, ইহা না দেখাইয়া, যে মুখ রঙ করিতে পারে, সেই কলাবতী। দিবালোকে রঙ করা বড় বিপজ্জনক। গৌরাঙ্গীরা

মুখে কিছু পাউডার লাগাইয়া বেশ করিয়া পাউডারের চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া, দুটি গালে ও ঠোঁট দুখানিতে ঈষৎ আল্‌তা বা 'ব্লুম অব্‌ রোজ' দিলে সোনায় সোহাগা হইয়া যায়, কিন্তু শ্যামাঙ্গীদের আমি সে পরামর্শ দিতে পারি না।

যামিনীই কামিনীর রাজ্য—বাহ্য-সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের এমন সুযোগ আর নাই। শিখিয়া, অভ্যাস করিয়া রঙ ফলাইতে পারিলে কালশশীও নিশাকালে শরৎশশী সাজিতে পারেন।

খুব ভাল ফুলখড়ি (French chalk) বেশ মিহি করিয়া গুঁড়া করিবে —পরে তাহা পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে ঈষৎ পেউড়ী ও কিঞ্চিৎ সিন্দূর মিশাইয়া দিবে; ইহার ঠিক ভাগ লিখিয়া দেওয়া যায় না, কেন না, সকলেরই বর্ণের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতির বর্ণের তারতম্য অত্যধিক। গোপন কক্ষে বসিয়া মুকুরকে সাক্ষী করিয়া দীপালোকে নিজের স্বাভাবিক বর্ণের উপযোগী রঙ ফলাইতে শিক্ষা করিতে হয়। একটু জলমাখা ভিজে হাতে ঐ রঙ আকণ্ঠমুখে বেশ পরিষ্কার সমান করিয়া মাখিবে, কোন স্থানে যেন ফাঁক না পড়ে, কম-বেশীও কোথাও না হয়; ঘষিতে ঘষিতে যখন বেশ সমান হইয়া রঙটি দাঁড়াইবে—তখন একটু রুজ (রুজের কৌটার দাম অধিক নয়) কপালে, চোখের কোলে, দুটি গালে ও চিবুকে দিবে; এমন করিয়া দিবে,যেন কোথাও এক ধেবড়া লাল বলিয়া না মনে হয়; গাঢ় হইতে ক্রমে হাল্‌কা করিয়া আনিয়া ক্রমে সাদার সহিত মিশাইয়া দিবে। এ দেশে অলক্ত ও সিন্দূরের দ্বারাও অনেকটা ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। প্যারিসে অনেক সুন্দরী রুজের



পরিবর্ত্তে বীটপালমের গোড়ায় লাল রস ব্যবহার করিয়া থাকেন ; ইহা অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ। ইহাতে কোনরূপ বর্ণের হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। খড়ি অপেক্ষা সবেদার গুঁড়ায় ভাল রঙ ফলে, কিন্তু অধিক ব্যবহারে ক্রমে দোষ ঘটিতে পারে। তবে বেশ তৈলদ্বারা রঙ উঠাইয়া পরিষ্কার করিলে আর তত দোষ হয় না। বোতলের ছিপির কাক পোড়াইয়া সেই ভূষার দ্বারা ভ্রূ রঞ্জিত করিলে বড়ই সুন্দর দেখায়। কিন্তু দেখো, ভ্রূচিত্র করিতে গিয়া, যেন কুমারটুলির প্রতিমা চিত্রিত করিও না। চক্ষুকে কজ্জলোজ্জ্বল দেখাইতে হইলে সুরমাই বড় উপযোগী, অভাবে ঈষৎ কজ্জলরেখাতে কার্য্য চলিতে পারে। মুখ গলা রঙ করিলেই শরীরের অপরাংশ জামাকাপড়ের বাহিরে থাকিবে, তাহাও ঐরূপে মানাইয়া রঙ করিতে হইবে। নচেৎ সে একটা অতি বীভৎস ব্যাপার দাঁড়াইয়া যায়। যাঁহারা পাদুকা পরিধান করেন না, তাঁহারা অবশ্যই চরণ অলক্তক-রাগে রঞ্জিত করিবেন, অলক্তকরাগরঞ্জিত চরণে লুটিয়া পড়িয়া স্মরগরলখণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্ বলিতে সকল স্বামীরই সাধ হয়!



মিস্ নাইট্ ও মিস্ বিশ্বাস লিখিত

বৈজ্ঞানিক রূপ

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

ভাব-বিহ্বল কবি জন্ম জন্ম রমণীরূপ নিরীক্ষণ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছেন না। তাই সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, বিমল রূপ-নিরীক্ষণ-তৃষ্ণা, কবিতার ভাষায় স্বতঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বাস্তবিক রমণীর রূপ কি এতটাই মোহজনক যে, মানুষ রূপের জন্য পাগল হয়? হয় বই কি! রমণীর রূপের খাতিরে—অথবা রূপসী রমণীর রূপের খাতিরে—পৃথিবীতে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছে, কত রাজ্য ছারেখারে গিয়াছে, কত মহাপাপ-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আবার কত মহাকাব্য বিরচিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণ, পঞ্চম বেদ



মহাভারত, হোমারের ইলিয়াড,—এই সকল মহাকাব্য এক একটি মহাযুদ্ধের ইতিহাস, কেবল রমণীর রূপ হইতেই এই সকল মহাযুদ্ধের সূচনা।

পুরুষের পক্ষে রমণীর সৌন্দর্য্যের উপাসনা, রূপলালসা এবং রমণীর পক্ষে স্বীয় সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির কামনা কেবল ভারতের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। অধুনা ভারতবর্ষে প্রতিবর্ষে বহু টাকার রমণী-সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির বিলাতী উপকরণ আমদানী হইতেছে। ধীরে ধীরে পল্লীগ্রাম-প্রান্ত পর্য্যন্ত এই সকল বিলাসোপকরণ ছড়াইয়া পড়িতেছে। অন্নহীন বাঙ্গালী কেরাণী হইতে কোটীপতি বাঙ্গালী জমীদারের গৃহে এই সকল উপকরণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই সকল দ্রব্য প্রধানতঃ বিলাতী বিলাসিনীকুলের ব্যবহারোপযোগী করিয়া প্রস্তত। ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও মার্কিণ রাজ্য এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের রমণীরা এই সকল দ্রব্য কোন্ প্রয়োজনে কি ভাবে ব্যবহার করেন, তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গালী রমণীদের কৌতূহল আসে।

আমাদের দেশে রমণী কুড়ি বৎসরেই বুড়ি। কুড়ি বৎসরের যুবতী পাঁচ ছেলের মা। সন্তান-সম্ভাবনা রমণী-সৌন্দর্য্যের একটি সর্ব্বপ্রধান শত্রু। কিন্তু পাশ্চাত্যখণ্ডে বহু সন্তানের জননী হইয়াও রমণীগণ কি কৌশলে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য-রক্ষায় সমর্থা হয়েন? এ কৌশল জানিবার জন্য আমাদের সকলেরই একটা আগ্রহ আছে। সেই কৌতূহল ও আগ্রহ প্রশমনের জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।



স্বাস্থ্য অক্ষুণ্নতার কারণ—

পাশ্চাত্য রমণীগণ অলসতার নিকট হইতে অতিদূরে অবস্থান করেন। গৃহকর্ম্ম ভিন্ন রীতিমত ব্যায়াম-ক্রীড়া ও মুক্ত প্রান্তরের নির্ম্মল বায়ু-সেবন, পরিমিত আহার ও বিশ্রাম তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের প্রধান সহায়।

আমাদের রমণীগণ যেন উৎসাহহীন লক্ষ্যহীন, যেন—কোনপ্রকারে প্রাণধারণমাত্র প্রয়াসী—সন্তান-প্রসব ভিন্ন যেন তাঁহাদের জীবনের অন্য কোন কার্য্যই নাই—অধিকাংশ রমণীই সর্ব্বদা ম্রিয়মাণা থাকেন, কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে জাপানের প্রবীণা রমণীদের প্রাণেও নবীন রসের প্রফুল্লতা তরঙ্গ বহিয়া থাকে। মুখে নবীন শ্রী—চক্ষে হর্ষের স্ফুলিঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহার উপর তাঁহারা সৌন্দর্য্যরক্ষার জন্য নানা বৈজ্ঞানিক কৃত্রিমতার সহায়তা গ্রহণ করেন।

চিরযৌবন—

আমাদের দেশে পাণ্ডব-জননী কুন্তীমাতা চিরযৌবনা ছিলেন; পাশ্চাত্যবিজ্ঞানেও কুন্তীমাতার সাহায্যে রমণীগণ চিরযৌবনসম্পন্না হইতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন এবং স্থিরযৌবন উপভোগ করেন। বৈজ্ঞানিকেরা নানাবিধ টিকা দিয়া রোগের বীজাণু নষ্ট করিয়া চিরযৌবন-প্রদানের জন্য সাধ্যমত প্রয়াস পাইতেছেন।

বশীকরণ—

পুরাণবর্ণিত সুভদ্রার মন্ত্রপূত মনোহরণ তিলকরঞ্জন হইতে প্রবীণা রমণীর মন্ত্র-তন্ত্র-তুক্-তাক্ প্রভৃতির অমোঘ-প্রয়োগে স্বামী ব্যাচারিগণের

চাঁদধরা রূপের ফাঁদে ফেলিবার কৌশল আমাদের দেশে অনেক শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকযুগে, সেই সব আজগুবিতে আর কাহারও বড় বিশ্বাস হয় না—পাশ্চাত্যজগতে বশীকরণের হাব-ভাব-কটাক্ষ-কায়দার রীতিমত শিক্ষা করিতে হয়, এ মোহনীয় তন্ত্র অমোঘ।

প্রথম যৌবন-সমাগম—

কিশোরীর দেহে নারীত্বের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়, শৈশবের খেলা-ধূলা ভুলিয়া তাহার মনে হয়—আমি দেখিতে কেমন? সুশ্রী না বিশ্রী? সুরূপা না কুরূপা? একখানি মুকুর তাহার নিত্য সহচরী হয়।

প্রথম সমাগতযৌবনা দর্পণে স্বীয় রূপ নানা ভঙ্গীতে নিরীক্ষণ করেন, অপাঙ্গদৃষ্টি, ওষ্ঠাধর কুঞ্চন ও প্রসারণ স্তরে স্তরে সজ্জিত, কেশের বিভিন্ন বিন্যাস করিয়া নিজের রূপের বাহার নিজে দেখেন।

কেশবিন্যাস—

কেশ-সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের নানা কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। পাশ্চাত্য ধনবতী মহিলাদের কেশ-বিন্যাসকারিণী থাকে—তাঁহারা অতি সাবধানে কুঞ্চিত কেশগুলি হাতের উপর তুলিয়া আঁচড়াইয়া প্রত্যহ নব নব ফ্যাসানে সুগঠনের সহিত মানাইয়া চুল বাঁধেন। জাপানী ও মালাবারের রমণীরা কেবল বেণীবন্ধন-কৌশলে কেশের দীর্ঘতা-সাধনে সমর্থ।

পূর্ব্বে আলগা-খোঁপা, বিড়ে-খোঁপা প্রভৃতির প্রচলন ছিল; বিবাহ-যোগ্যা বালিকাদের কলি কাটিয়া ঝাপ্টা তুলিয়া চুল বাঁধিয়া দেওয়া

হইত। পাশ্চাত্য-সভ্যতার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বর্জ্জিত হইতেছে। সেই জন্য কবি গাহিয়াছেন, "কলি কাটা, ঝাপ্টা তোলা, চলে না লো আর—"। এখন ফিরিঙ্গি-খোঁপা, চ্যাপ্টা খোঁপা,



বিনুনী খোঁপা, কাক-খোঁপা, চিঁড়েতনের টেক্কা, চার বিনুনী-পৈঁচে ফাঁস, এলো খোঁপা, হরতনের টেক্কা, গোঁজ খোঁপা, বেড়াবিনুনী, সাতগুছি চেটা, অমৃতিপাক খোঁপা, বিবিয়ানা, জলতরঙ্গ প্রভৃতির সমধিক প্রচলন।



ব্যসন সম্বন্ধে—

গঠন ও বর্ণের উপযোগী করিয়া পোষাক প্রস্তুতের জন্য বিলাতী দর্জ্জিদের অনেক রং-ঢং ক্রমাগত বদলাইতে ও মানাইতে হয়। আমাদের রমণীরা অনেকেই একটু ধনগর্ব্ব দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন— অলঙ্কারভারে স্বভাব-সৌন্দর্য্য আড়ম্বরে ম্লান করিয়া ফেলেন। গঠন ও বর্ণের সামঞ্জস্য করিয়া সাদা-সিধা রুচিমত উৎকৃষ্ট সুনির্ব্বাচিত বসন-ভূষণের পক্ষপাতিনী হইলে স্বভাব-সৌন্দর্য্য আপনিই ফুটিয়া উঠিবে।

বর্ণবর্দ্ধন—

প্যারিসনগরের বৈজ্ঞানিকগণ কুৎসিতা শ্যামাঙ্গী রমণীর চর্ম্ম সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে তুলিয়া লয়েন। তখন দ্বিতীয় স্তরের শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ চর্ম্মে তাঁহাদের দেহ আবৃত থাকায় তাঁহাদিগকে অতি সুন্দর দেখায়। এই প্রণালী অতি বিপজ্জনক; চর্ম্ম খুলিয়া লওয়ার পর কিছুকাল অতীব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। দ্বিতীয় স্তরের চর্ম্ম প্রথম প্রথম শীতাতপ সহ্য করিতে পারে না। অথচ বহু স্ত্রীলোক কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বীয় দেহের চর্ম্ম-পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ধন্য ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং ধন্যা সেই কামিনী!— যিনি সুন্দরী সাজিবার লোভে নিজের জীবনকে এরূপে বিপন্ন করিয়া প্রকৃতি দেবীকে কদলী প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

চক্ষের কথা—

রমণীর নয়ন সৌন্দর্য্যের আকর। 'Lovely eyes makes lovely face' চোখ দুটি সুন্দর হইলে মুখখানি সুন্দর দেখায়, এবং সেই চোখ অনেক রকম; টানা চোখ, পটলচেরা চোখ, ড্যাবরা চোখ, পদ্মপলাশলোচন,


সৌন্দর্য

খঞ্জন-নয়ন, হরিণনেত্র, বড় বড় ভাসা চোখ। ইংরেজী রমণীর চক্ষু পাঁচ প্রকার বর্ণের—কালো চোখ (অতি বিরল), কটা চোখ, নীল নয়ন, ঘোরালো, হেজেল ব্রাউন।

ভ্রূযুগল চক্ষের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

ভ্রূযুগল অত্যধিক পরিমাণ ঘন বা অত্যধিক পরিমাণে লোমহীন হইলে চক্ষুর সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। যাঁহাদের ভ্রূযুগল অধিক স্থূল, তাঁহারা রাত্রে ও প্রাতঃকালে ছোট ব্রুস দিয়া ভ্রূ-দুটি ঘষিয়া উত্তমরূপে ক্রীম মাখাইলে ভ্রূযুগল অতি শীঘ্রই সূক্ষ্ম হইবে। আর যাঁহাদের ভ্রূযুগল লোমহীন, তাঁহারা উক্তস্থানে প্রতিদিন দুই চারিটি ছারপোকা টিপিয়া দিলে শীঘ্রই উক্তস্থান লোমবহুল হইয়া উঠিবে। চক্ষু সমুজ্জল হইলে বড় সুন্দর দেখায় ; নিষ্প্রভ চক্ষু শ্রীহীন ; এইজন্ত বিলাতী ঔষধের সাহায্য না লইয়া প্রতিদিন প্রাতে শীতল জলে চক্ষু মার্জ্জনা ও শয্যাগ্রহণের সময় ঈষৎ উষ্ণ জলে চক্ষু ধৌত করা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

চাহনি।

মেয়েরা চেষ্টা করিয়া তীব্র, কোমল, কুটিল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চাহনি রীতিমত শিখিয়া থাকে। Stare—একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা অতি ভয়ঙ্কর। ইহাতে কেবল লজ্জাহীনতা প্রকাশ পায় না, লক্ষ্য ব্যক্তিও ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠেন। চাহনির বিভিন্নতায় মুখের ভাব—অন্তরের কথা চোখের ভাষায় প্রকাশিত হয়।

সুন্দরী রমণীর নলিন-নয়নের অশ্রু-শিশির ব্রহ্মাস্ত্র। সুযোগ বুঝিয়া প্রয়োগে অনেক কঠিন কার্য্য অনায়াসে হাসিল হইয়া যায়। এ অশ্রু



দুঃখের পরিচায়ক নহে। আনন্দ, ক্রোধ, ঘৃণা, প্রেম প্রভৃতিতেও অশ্রুর প্রকাশ। মহাকবি সেক্সপিয়র বলিয়াছেন, "A beauty's tears are lovelier than her Smile" অর্থাৎ সুন্দর মুখের অশ্রু হাসির অপেক্ষা মানবহৃদয়কে মোহিত করে। সুন্দর নয়নে অশ্রুরেখা দেখিয়া কোন্ পাষাণ-হৃদয় বিগলিত না হয়? বিলাতের নারীসমাজ এই অব্যর্থ-প্রয়োগ বিদ্যা রীতিমত অভ্যাস করেন, কিন্তু অপপ্রয়োগ বা অযথা ব্যবহারে ইহা বড়ই বিরক্তি-উৎপাদক।

হাসি।

উচ্চহাস্য, মৃদুহাস্য, যে হাসি ওষ্ঠেই মিলাইয়া যায়, আবার যে হাসি পুরুষের মন কাড়িয়া লয়—এইরূপ নানাপ্রকারভেদে রমণীর ওষ্ঠাধরে হাসির লহরলীলার সৌন্দর্য্য স্পন্দিত হয়। কবি গাহিয়াছেন,—"আঁখিতে দেয় লো ফাঁকি, হাসিতে পরায় ফাঁসি।" অশ্রুর ন্যায় অমিতপ্রভাবসম্পন্ন না হইলেও হাসির প্রভাব বড় অল্প নহে।

ওষ্ঠাধর হাসির লীলাভূমি; এবং দন্তপংক্তি তাহার দুর্ভেদ্য দুর্গ। দন্তগুলি যত সুন্দর, সুগঠিত ও সুমার্জ্জিত হইবে, ওষ্ঠাধর পরিমাণমত পাতলা ও গোলাপী বর্ণ (Ruby colour) হইবে, হাসিও তত মধুর হইবে। বিলাতে সহস্র প্রকারের দাঁত মাজিবার মঞ্জন ও বুরুস আছে। ওষ্ঠাধর কুৎসিত হইলে হাসি ভাল খেলে না—দন্তগুলি সুগঠিত না হইলে হাসি মানায় না। 'বিলাতী দেঁতোর হাসি' অতি উৎকট।

সুগন্ধ ব্যবহার।

সকল দেশের রমণীসমাজই সুগন্ধের পক্ষপাতিনী। রুচি-পরিবর্ত্তনের

আবেশ চুম্বন



"অবশে এলোকেশে- অরুণ-আঁখি চায় আবেশে,



সঙ্গে সঙ্গে চন্দন, আতর, মাথাঘষা, গোলাপজল প্রভৃতির পরিবর্ত্তে আমাদের রমণীরা এসেন্স, অটো, সাবান প্রভৃতি বিলাতী সুগন্ধি-সম্ভারের পক্ষপাতিনী হইতেছেন। বৈজ্ঞানিক কৌশলে সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে প্যারিস-বাসিনী রঙ্গিণীরা স্ব স্ব দেহে সুগন্ধি এসেন্স প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন। তাহার ফলে তাঁহাদের দেহ হইতে চিরমধুর সুগন্ধ বাহির হয়। কিন্তু ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে।

স্তন-শোভা-রক্ষার জন্য—

মেয়েরা রাত্রে শয্যাগ্রহণের সময় স্তনে ক্রীম মাখাইয়া প্রাতে শীতল-জলে ধৌত করিয়া Tincture of Benze মাখাইয়া রাখেন, এবং মধ্যে মধ্যে মুক্ত বাতাস লাগান। অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত হইলে ডাইরেক্টর যন্ত্র ব্যবহার করেন। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদেও শ্রীপর্ণী-তৈল ব্যবহার প্রভৃতি ব্যবস্থা আছে।

বর্ণের ঔজ্জ্বল্য।

কালো মুখ সুন্দর হইতে পারে না, কিন্তু কালোমুখও উজ্জ্বল হইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, অনেক সুন্দর মুখও ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি দ্বারা কুৎসিত হইয়া দাঁড়ায়। মুখে নিয়মিতভাবে ক্রীম ব্যবহারে এগুলি প্রায়ই কমিয়া যায়।

মলিনার বর্ণবিলাসের জন্য।

আইডাইড্ অব পোটাসিয়ম ২ ড্রাম, গ্লিসারিন ১ আউন্স, ডিস্টিল্ড্ ওয়াটার ২০ আউন্স, এই কয়েকটি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নরম কাপড় দ্বারা চর্ম্মের উপর ঘর্ষণ করিতে হইবে।

মুখের ব্রণ প্রভৃতি অপসারণের আর একটি বিলাতী উপায়—



দিনকতক চক্ষে ভিজা রুমাল বাঁধিয়া মুখে গরম জলের ভাবনা লাগাইলে, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইবে, সেই ঘামগুলি মুছিতে মুছিতে বর্ণ অপসারণ হইবে। গরমজলে ভিজান তোয়ালে মুখে জড়াইলেও এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ণ-প্রসাধনের জন্য ভাল ক্রীমযুক্ত নরম সাবান ব্যবহার করা বিধেয়। কুসুম-সুবাসে স্নান করিবার জন্য বিবিরা বাথ-টেবলেট স্নান-জলে ফেলিয়া দেন—ইহাও বর্ণবৃদ্ধির উপকারী। পাউডার বর্ণ-প্রসাধনে ব্যবহার্য্য বটে, কিন্তু পাউডার ভ্রূ প্রভৃতি হইতে ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা আবশ্যক, যেন কোন রেখাতে পাউডার না জমিয়া থাকে। মুখে ক্রীম লাগাইয়া মাংস কোমল করিয়া পাউডার মাখা আবশ্যক। অনিদ্রা ও চিন্তার জন্য যুবতীর মুখে রেখাঙ্কন পরিস্ফুট হয়, এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। চোখের কোলে কালী পড়িলে ক্রীম দিয়া সযতনে তুলিয়া ফেলিবে।

স্থূলাঙ্গী ও কৃশাঙ্গী।

আমাদের দেশে ধনববতী রমণীগণ আলস্যে অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী ও স্থূলোদরী হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সকল সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। রীতিমত শ্রম বা গৃহকার্য্য দ্বারা ব্যায়াম ভিন্ন এ স্থূলতা-নিবারণের অন্য উপায় নাই। সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা ও জল তোলা প্রভৃতি এই ব্যায়ামের অন্তর্গত। স্থূলাঙ্গীরা অত্যন্ত নিদ্রাপ্রিয় হন, দিবা-নিদ্রা বর্জ্জন করিয়া রাত্রে পাঁচ ছয় ঘণ্টা নিদ্রা তাঁহাদের পক্ষে বিধেয়, এবং দুগ্ধ প্রভৃতি ভোজন একেবারে নিষিদ্ধ। ক্ষীণাঙ্গীদিগের পক্ষে সুঠাম পরিপুষ্ট হইবার জন্য দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি আহার ও পরিমিত বিশ্রাম আবশ্যক।



লেখক—শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী।

সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান

"কমলিনী মলিনী দিবসক্ষয়ে,
শশিকলা বিকলা রজনীক্ষয়ে।
ইতি বিদধে প্রমদামুখং,
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥"

রমণীই বিধাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। বিধাতা সর্ব্বপ্রথম একটি উৎকৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া প্রস্ফুটিত কমলিনী সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু দিবাবসানে ঐ প্রস্ফুটিত কমলিনী মুদিত হইয়া গেল; তাহার সে সৌন্দর্য্য আর রহিল না; তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বিধাতা চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং অন্য একটি কমনীয় পদার্থ সৃষ্টি করিবার জন্য মনে নানাবিধ কল্পনা করিতে লাগিলেন; সেই কল্পনার ফলে জগৎ-প্রকাশক



চন্দ্রের সৃষ্টি হইল; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, ঐ চন্দ্রও অস্তমিত হইয়া গেল; বিধাতার পুনরায় ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন, এত চিন্তা, এত কল্পনা করিয়া এমন দুইটি কমনীয় বস্তু সৃষ্টি করিলাম, কিন্তু উহারা চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকা পর্য্যন্ত নিজ নিজ সৌন্দর্য্য বজায় রাখিতে পারিল না। অনন্তর বহুদিন পর্য্যন্ত সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করিবার জন্য নানাবিধ কল্পনা করিতে করিতে, সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করিলেন।

"ইদং বক্ত্রং সাক্ষাৎ বিরহিতকলঙ্কঃ শশধরঃ॥"

এইবার তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইল। রমণীমুখ সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি সমভাবে সৌন্দর্য্যপূর্ণ ও দ্রষ্টার আনন্দদায়ক হইয়া থাকে।

মানুষের পক্ষে একদিনে অভিজ্ঞতা লাভ করা অত্যন্ত অসম্ভব। স্বয়ং বিধাতাকেও ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ যখন চন্দ্রমা ও কমলিনী সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মনের সাধ মিটিল না, তখন অনেক গভীর গবেষণা, প্রভূত কল্পনার পর কমনীয় রমণী-মুখ সৃষ্টি করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। বিধাতৃ-নির্ম্মিত কমনীয় রমণীমুখের সহিত কবিবর চন্দ্রের উপমা দিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে উহা ভুল, কারণ, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, কমনীয় রমণী-মুখে কলঙ্ক রেখা নাই। যদি বিধাতা কখন নিষ্কলঙ্ক শশধর সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। কবিরা রমণী-নয়নের সহিত প্রস্ফুটিত কুবলয়ের তুলনা দিয়া থাকেন, তাহাও ভুল; কারণ, কুবলয় দিবারাত্রি প্রস্ফুটিত থাকে না; সুতরাং দিবারাত্রি শোভা পায় না।



"ইমে নেত্রে রাত্রিন্দিবমধিকশোভে কুবলয়ে।"

কিন্তু রমণীর নয়নযুগল একবৃন্তে দুইটি প্রস্ফুটিত কুবলয়ের ন্যায় রাত্রি দিন শোভা পাইয়া থাকে।

"অব্ধিমধ্যে সুধা চেৎ স্যাৎ তজ্জলং লবণং কথম্।
রমণ্যাশ্চাধরে তস্মাৎ অমৃতং তিষ্ঠতি ধ্রুবম॥"

কবিরা সমুদ্রকেই অমৃতের আধার বলিয়া বর্ণনা করেন, সেটাও কি ভুল কথা নহে? কারণ, যদি সমুদ্রে সুধা থাকিত, তাহা হইলে সমুদ্রের জল অত লবণাক্ত হইত না; উহা অতি সুমধুর হইত। সুতরাং রমণী-অধরই যে অমৃত বা সুধার আধার, ইহাই কি ঠিক নয়?

"পুরা কবীনাং বহিরান্তরং বা,
চক্ষুন চ সীদতি তর্কয়েঽহম্।
স্ত্রীভ্যঃ প্রদত্তং হ্যবলেতি নাম,
গিরিদ্বয়ং যা হৃদয়ে ধরন্তি॥"

প্রাচীন কবিগণ রমণীকে অবলা নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইহার দ্বারা বোধ হয় যে, তাঁহাদের অন্তশ্চক্ষু তো ছিলই না, অধিকন্তু বাহ্য-চক্ষুও ছিল না; কারণ, তাঁহাদের যদি বাহ্য-চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে হৃদয়ে পর্ব্বতদ্বয়-ধারিণী কামিনীদিগকে তাঁহারা অবলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। যাহারা হৃদয়ে উচ্চ-গিরিদ্বয় ধারণ করিতে পারে, তাহা-দিগকে অবলা বলা কি সঙ্গত?



"মৃণালসূত্রান্তরমপ্যলভ্যম্ ॥"

বিধাতৃ-নির্ম্মিত সুন্দরী রমণীর উচ্চ গিরিতুল্য স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থানে সূক্ষ্ম মৃণালসূত্রও স্থানলাভ করিতে সমর্থ হয় না। রমণী যে বিধাতার উত্তম সৃষ্টি, ইহা কেবল ভারতীয় কবি-কল্পনা-প্রসূত কথা নহে, ইংরাজী সাহিত্যেও রমণীকে Fair creature (ফেয়ার ক্রিচার) বা উত্তম সৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। রমণী অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া অভিহিত হয়, কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে ইহাকে Better half অর্থাৎ উত্তম অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

রমণীর উরুদ্বয়ের সহিত কদলী-বৃক্ষের বা করভের উরুর সহিত কেহ কেহ তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাও ভুল; কারণ, কদলীবৃক্ষের অতি শৈত্য ও করভের উরুর কার্কশ্য হেতু উহাদের সহিত কমলসম কোমল কামিনীর উরুর তুলনা দেওয়া কি সহৃদয়তার পরিচায়ক?

ষষ্ঠ লহরী

দর্শন



লেখক—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দার্শনিক রূপ।

যাহা দর্শনগ্রাহ্য, তাহাই রূপ; নয়নের সাহায্যে যাহা দেখিতে পাই, তাহাই রূপ। রূপের দুইটি বিভাগ আছে,—এক আকৃতি, দ্বিতীয় বর্ণ-বিকাশ। আকৃতি বা অবয়ব স্পর্শগ্রাহ্য হইলেও চক্ষুর স্নায়ু ও পেশীর ক্রিয়া-প্রভাবে আমরা ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোলাকার প্রভৃতি নানাবিধ অবয়ব ও আকার দেখিতে পাই। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্পর্শের সাহায্যে—হাত বুলাইয়া অনেক সময়ে সামগ্রীর আকারের অনুভূতি হয় বটে, পরন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই আকারের সম্যক্ অনুভূতি হইয়া থাকে। স্থূল অবয়বসম্পন্ন যাহা, তাহার আকারের অনুভব স্পর্শ-শক্তির দ্বারা কতকটা হইলেও চিত্র-লেখা, বর্ণমালার লেখায় ভাবার বিন্যাস, দূর গগনতলে মেঘের আকার, বর্ণের ও দ্যুতির সাকার বিকাশ এ সকলই দর্শনেন্দ্রিয়ের

সাহায্যে অনুভূত হয়। তাই শাস্ত্রকার মোটের উপর বলিয়া রাখিয়াছেন যে, রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য।

যাহা দেখি, তাহাই রূপ। আমি দেখি কি? চক্ষুষ্মান্‌মাত্রেই বিকাশ দেখেন। বহিঃপ্রকৃতির যাহা কিছু, তাহা জ্যোতিঃ-সাহায্যে বিকসিত হয়, নয়নগ্রাহ্য হয়; আমাদের নয়নের পশ্চাতে যে স্নায়ুর যবনিকা আছে, তাহার উপর প্রাকৃত সকল পদার্থের প্রতিচ্ছবি আসিয়া পড়ে, আর আমরা দেখিতে পাই। আমরা বাহিরে কিছু দেখি না; যাহা দেখি, তাহা ভিতরেই—ভিতরে নিজের মনের মতন করিয়া, নিজের রুচি মিলাইয়া দেখিয়া থাকি। জ্যোতিঃ-রেখাসমুজ্জ্বল পদার্থবিশেষের প্রতিবিম্ব নয়নের যবনিকায় উল্টাভাবে আসিয়া পড়ে, স্নায়ুর ও মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রভাবে উল্টা ছবি সোজা হইয়া বাহিরে আকাশপটে আবার প্রতিবিম্বিত হয়। এই প্রতিবিম্বনই দর্শন। মনে কর, দূরে একটা পর্ব্বত রহিয়াছে, তাহার একটা শৃঙ্গ ও পর্ব্বতের নিম্নভাগের কতকাংশ আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই দর্শনে দুইটি ক্রিয়া হইতেছে। একটি সূর্য্যের রশ্মি-সমুজ্জ্বল চিত্র উল্টাভাবে আসিয়া নয়নের যবনিকায় (Retina) আসিয়া পড়িতেছে, সে উজ্জ্বল চিত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের স্নায়ুমণ্ডলকে আঘাত করিতেছে, সে আঘাত বা স্পন্দন মস্তিষ্কে যাইয়া ক্রিয়া করিতেছে; সেই ক্রিয়ার ফলে নয়ন যবনিকার উল্টাছবি সোজা হইয়া, যে রেখায় বাহির হইতে ভিতরে আসিয়াছিল, সেই রেখার বাহিরে যাইয়া গগনপটে প্রতিফলিত হইতেছে। তাই পাহাড় ও পর্ব্বতচূড়াকে আমরা দেখিতে পাইতেছি। শ্রবণ, দর্শন, আস্বাদন, স্পর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়া স্পন্দনের আকারান্তর

মাত্র। যে স্পন্দন শ্রবণ-পটহগ্রাহ্য, তাহা শ্রবণ, যাহা রসনাগ্রাহ্য, তাহা আস্বাদন, যাহা নয়নগ্রাহ্য, তাহা দর্শন। এক শক্তিরই স্পন্দন আকার-ভেদে দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণাদি কার্য্যে পরিণত হয়। সেই শক্তি জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া নয়নগ্রাহ্য, শব্দময়ী হইয়া শ্রবণগ্রাহ্য, রসময়ী হইয়া রসনাগ্রাহ্য হন। অতএব রূপ সেই শক্তির বিকার মাত্র। মনুষ্য-দেহের উপর বাহ্যশক্তির একটা ক্রিয়া হয়, সে ক্রিয়ার ফলে দেহস্থ আত্মশক্তি স্নায়ুসাহায্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, সে উদ্বোধনের প্রকার অনুসারে মানুষ দেখে, শুনে, আঘ্রাণ করে, কোমল কঠোরের অনুভব করে, মিষ্ট-তিক্তাদির আস্বাদন করে। তন্ত্র বলেন, যেমন লাল-নীল-পীত প্রভৃতি সপ্ত বর্ণ নয়নগ্রাহ্য, তেমনি সা-রী-গা-মা প্রভৃতি ষড়জ ঋষভ মুল সপ্তস্বর শ্রবণগ্রাহ্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে সপ্ত প্রকারের গন্ধের অনুভূতি আছে, রসনায় সাত রকমের রসের বোধ হয়। যে শক্তি নয়নের সম্মুখে সপ্তবর্ণে প্রতিফলিত হয়, সেই শক্তিই অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের উপরও ঐ সাত প্রকারে কার্য্য করে। শক্তির এই সপ্তবিধ ক্রিয়াকেই তন্ত্র রূপ বলিয়া থাকেন। সৃষ্টি এই রূপসাগরের উপর ভাসিতেছে; এই রূপই সৃষ্টি, এই রূপই বিসৃষ্টি। ইহাই আত্মাশক্তির রূপ, অর্থাৎ ঐ ভাবেই সৃষ্টিশক্তি প্রকট হইয়া থাকেন। আমার স্নায়ুর পথে, ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে আমি শক্তির বিকাশ-তত্ত্ব বুঝিতে পারি। যাহা যাহার সাহায্যে অনুভূতিগম্য হয়, তাহাই তাহার রূপ। সুতরাং বলিতে হয়, রূপ আমারই মধ্যে আছে, কেবল বাহিরের ক্রিয়াপ্রভাবে উহা নানাভাবে প্রকট হইয়া থাকে। রূপ অনুভূতির আকার, বিকাশ, উন্মেষ মাত্র।

সৌন্দর্য্য

আমার মধ্যে একটা হ্লাদিনী শক্তি আছে। ঐ শক্তির অনুকূল ক্রিয়া হইলে আমি সন্তুষ্ট হই, প্রতিকূল ক্রিয়া হইলে অসন্তুষ্ট হই। আমার ইন্দ্রিয়গ্রামসমেত স্নায়ু-বাগুরাবিমণ্ডিত দেহের উপর বহিঃশক্তির যখন স্পন্দন হয়, তখন উহা অনুকূল কি প্রতিকূল স্পন্দন, তাহা হ্লাদিনী বিচার করিয়া গ্রহণ করেন। এই বিচারের ফলে কোনটা আমার ভাল লাগে, কোনটা বা ভাল লাগে না। যাহা ভাল লাগে, তাহা দেখিতে, শুনিতে, অনুভব করিতে ভাল লাগে; বারে বারে সেই সকলেরই অনুভূতির আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়া উঠে। যাহা ভাল লাগে না, তাহা পরিহার করিতে মনের সত্ত্ব সত্ত্ব চেষ্টা হয়। যাহা ভাল লাগে, তাহাই প্রেয়ঃ, যাহা ভাল লাগে না, তাহাই হেয়। হ্লাদিনী এই হেয় ও প্রেয়ের বিচার করিয়া দেন। কিন্তু এই হেয় এবং প্রেয় ছাড়া, একটা শ্রেয়োবিষয় আছে; বিবেক শ্রেয়ঃ-পদার্থের নির্দ্ধারণ করেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, যাহা প্রেয়. তাহাই শ্রেয়ঃ, হেয় যাহা, তাহা কখনই শ্রেয়ঃ হইতে পারে না। সাধনাখণ্ডে এ সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও, আয়ুর্ব্বেদে এবং সমাজতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের নিকট উহা কখনই সর্ব্বথা মান্য হয় না। যাউক সে কথা। এই হ্লাদিনী যে স্পন্দন-ক্রিয়াকে অনুকূলভাবে গ্রহণ করেন, তাহাই আমার (অনুভবী ব্যক্তির) ভাল লাগে। যাহা ভাল লাগে, তাহাই সুন্দর,—নয়নে, শ্রবণে, আঘ্রাণে, রসনায়, স্পর্শে, সর্ব্বস্থে এবং ইন্দ্রিয়ঘটিত প্রায় সকল ব্যাপারে তাহাই সুন্দর, মনোহর, প্রাণারাম ও মধুর। কেন ভাল লাগে? হ্লাদিনী গোটাকয়েক স্পন্দনকে অনুকূল, অন্য সকল স্পন্দনকে প্রতিকূল করেন কেন?

উত্তরে শাস্ত্রকার বলিতেছেন, এইখানেই জগন্ময়ীর ইচ্ছার বিকাশ। ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা করেন, তাই গোটাকয়েক সামগ্রী ভাল লাগে, অন্য সকল ভাল লাগে না। এক জনকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে আপনার করিতে ইচ্ছা যায়; অন্যজনকে দেখিলেই প্রাণ চটিয়া যায়, তাহাকে পরিহার করিয়া দূরে পলাইতে সাধ যায়। যাহা আমার প্রকৃতি ও সংস্কারের অনুকূল, তাহাই হ্লাদিনীর গ্রাহ্য। আমার যাহা ভাল লাগে, তোমার তাহা ভাল লাগিতে না পারে; কেন না, তুমি আমি ত এক নহি, তোমার প্রকৃতি ও সংস্কার আমা হইতে বিভিন্ন। তাই তোমার রুচিও ভিন্ন। পরন্তু তোমায় আমায় যে সকল ব্যাপারে সাম্যভাব আছে, সে সকল ব্যাপারে রুচির সাম্যতা থাকিবেই। হিন্দু বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে যাহা সুন্দর ও মনোহর, তুহিন-ধবল-কান্তি, তুষারাচ্ছন্ন-দেশবাসী ইউরোপীয়ের দৃষ্টিতে তাহা সুন্দর ও মনোহর নাও হইতে পারে। বংশানুক্রম ও প্রতিবেশপ্রভাবে মনুষ্যমাত্রেরই রুচিভেদ ঘটিয়া থাকে; রুচিভেদে হ্লাদিনী শক্তির বিকাশভেদ হয়। তা ই হেয় ও প্রেয়ের নির্দ্ধারণ দেশভেদে, জাতিভেদে এবং শিক্ষাভেদে হইয়া থাকে। তবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব-বিধায় সকল মনুষ্যের মধ্যে একটা সাম্যভাব পরিলক্ষিত হয়। পশু-সামান্য প্রবৃত্তির তাড়নায় যে হেয় ও প্রেয়ের বিচার হয়, তাহা সার্ব্বজনীন বলিলে দোষের হইবে না।

রূপেও প্রেয় ও হেয়ের বিশ্লেষণ আছে। প্রথমতঃ দেশ, জাতি ও শিক্ষাভেদে এ বিচার হয়; পরে ব্যক্তিগত রুচি অরুচি লইয়া প্রেয় ও হেয় নির্দ্ধারিত হয়। পশু-সামান্য প্রবৃত্তির উপর যে স্পন্দন হইলে যে

রূপের উন্মেষ হয়, তাহা এক প্রকারের আর আত্মার পিপাসা দূর করিতে যে স্পন্দনের ফলে হ্লাদিনী ফুলিয়া নাচিয়া উঠেন, সে রূপের বিকাশ অন্য প্রকারের। একা আমি দেহবদ্ধ হইয়া আছি, আমি চাই আর এক জনের সহিতে মিলিতে, কি জানি কোন্ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আর এক জনের সঙ্গী হইতে,—এই যে ইচ্ছা, এই যে প্রয়াস, ইহাই বদ্ধ আত্মার পিপাসা—আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তির উপর যে স্পন্দন হয়, তাহাই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। সে কথা পরে বলিব।

"একোঽহং বহু স্যামঃ"—এক আমি বহু হইব। ইহাই আমার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা হইতেই আমি দ্বিতীয়ে মিশিতে চাই। আমার হৃদ্গত হ্লাদিনী এই ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া আর একটি মনের মতন মানুষ খুঁজিয়া বাহির করিতে বলে। হ্লাদিনীর এই ইঙ্গিত—এই ইসারাই আমাকে অতৃপ্ত-পিপাসিত করে। আমি যাহা ভালবাসি—দেখিতে, শুনিতে, স্পর্শ করিতে ভালবাসি, তাহা পাইলেই আমার এই পিপাসা মিটে। এই অতৃপ্তি বা পিপাসা মিটাইবার চেষ্টাই আমাতে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি জাগাইয়া তুলে। যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে অনুভূতির উন্মেষ হয়, তাহাই সেই ইন্দ্রিয়ের রূপ। নয়নে আমি দেখিতে ভালবাসি ;—উষার মুদিত বিকাশ, সূর্য্যের কিরণ-লেখায় বিগলিত কনকতরঙ্গের হেম-বিভা, সাগরাম্বুরাশির সফেন নীল উর্ম্মিমালার ভীম পারম্পর্য্য, চন্দ্রোদয়ে প্রকৃতির সম্বন্ধে রজতধারাস্রাবের ন্যায় কৌমুদী বর্ষা, প্রদোষে পশ্চিম-গগন-ক্রোড়ে সপ্তবর্ণের বিভূতি-বিস্তার—প্রভৃতি নানাবিধ প্রাকৃত দৃশ্য দেখিতে আমি ভালবাসি। যখন নির্দ্বন্দ্ব আমি দ্বিতীয়ে মিশিতে চাই, তখন প্রকৃতির

যাহাতে হ্লাদিনীর প্রকট মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিতে ও বুঝিতে পারি, তাহাকেই সেই মনের মত নারীর মূর্ত্তিতেই আমার প্রাণপণ যেন মিলিয়া মিশিয়া যায়। সেই নারীকেই প্রথমে আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী বলিয়া মনে করি। তখন মুখ ফুটিয়া বলি,

"ইন্দ্রাণী চৈব রুদ্রাণী শঙ্করার্দ্ধ-শরীরিণী।
নারী নারায়ণী চৈব ত্রিশূলিন্যাসিপালিনী॥
অম্বিকা হ্লাদিনী চৈব দ্বাত্রিংশচ্ছক্তয়ো মতাঃ।
পিঙ্গলাক্ষী বিশালাক্ষী সমৃদ্ধির্বুদ্ধিরেব চ॥"

(প্রপঞ্চসার, ১১ পটলঃ)

নারীই নারায়ণী ;—অথবা বলিব কি, নারায়ণী মহাদেবীর অপর নামই নারী। যাঁহার প্রভাবে বিশ্বসৃষ্টি রক্ষা পায়, যিনি আমার প্রাণের পিপাসা, আত্মার আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া,এক আমি—আমাকে বহুতে পরিণত করেন, আমার আত্মশক্তিকে বহুতে বিসর্পিত করিয়া দেন, তিনিই বৈষ্ণবী শক্তি-রূপা নারায়ণী নারী। তিনি রূপময়ী, সকল ইন্দ্রিয়ের সকল ভাবের ভাব-ময়ী সর্ব্বস্বরূপা। তাই ঐ প্রপঞ্চসার মহাগ্রন্থে নারীর স্তব করিতে যাইয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"নমঃ শব্দরূপে নামো ব্যোমরূপে, নমঃ স্পর্শরূপে নমো বায়ুরূপে।
নমো রূপতেজোরসাম্ভঃস্বরূপে, নমস্তেঽস্তু গন্ধাত্মিকে ভূ-স্বরূপে॥
নমঃ শ্রোত্র-চর্ম্মাক্ষি-জিহ্বাখ্যানমাস্যবাক্‌পাণিপৎপায়ুসোপস্থরূপে।
নমো বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তস্বরূপে, বিরূপে নমস্তে বিভো বিশ্বরূপে॥"



হে নারি—তুমি শব্দরূপা, ব্যোমরূপা, স্পর্শরূপা এবং বায়ুরূপা ;—তুমিই রূপতেজস্বরূপা, এবং গন্ধাত্মিকা ভূস্বরূপা ;—অর্থাৎ তুমিই পঞ্চভূতাত্মিকা পঞ্চভাবময়ী। এই নরদেহে যে সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পঞ্চভূতের পঞ্চ ভাব—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—গ্রাহ্য হইয়া থাকে, তুমি সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তুমিই শ্রবণ, চর্ম্ম, চক্ষু, জিহ্বা, নাসা, পাণি, পদ, পায়ু, উপস্থ—সর্ব্বস্বরূপে, তুমিই বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্তরূপিণী—তুমিই আবার অরূপিণী, বিশ্বরূপের বিভুরূপিণী। ইহাই নারীর রূপ—এই বিভূতি-বিলাসিনীই নারী।

নারীর দুই রূপ,—এক জননী, দ্বিতীয় রমণী। নারী যখন সৃষ্টিকর্ত্রী, তখন তিনি জননী, অর্থাৎ প্রজনন-ক্রিয়াশীলা মহামায়া জগন্মাতা। নারী যখন পুরুষে মিশিতে চাহেন, তখন তিনি রমণী—কেলিকদম্বমূলে লীলারসময়ী শ্রীমতী রাধিকা! রাধিকা জননী নহেন, কেবল রমণী—রমণীর শিরোমণি কমলিনী। এইখানে শাস্ত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কে আগে? সর্ব্বাগ্রে নারী জননীরূপে প্রকট, না রমণীরূপে প্রকট? এই প্রশ্নের উত্তরে তন্ত্র এক প্রকারের কথা বলিয়াছেন। বৈষ্ণবশাস্ত্র আর এক প্রকারের কথা বলিয়াছেন। তন্ত্র বলেন, সৃষ্টি না হইলে ত আমার আমিত্ব হয় না, দ্বৈতভাবের বোধ হয় না; সুতরাং সৃষ্টি যখন হইয়াছে, তখন আদ্যাশক্তি জননীরূপে প্রকট হইয়া পরে সৃষ্টিরক্ষার জন্য রমণীরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাই আদ্যাশক্তি সর্ব্বাগ্রে শিবপ্রসূতি, শেষে লীলারসময়ী কমলিনী—কামকলানিধি। বৈষ্ণব-শাস্ত্র বলিতেছেন, তা কেন! এক আমি বহু হইব, এই ইচ্ছা মহাপুরুষের মনে যে ক্ষণে প্রকট হইয়াছে, সেই ক্ষণেই মূলাপ্রকৃতি



"তুমি আড়নয়নে মুচকে হেসে"



রমণীরূপে বিকসিত হইয়াছেন। সর্ব্বাগ্রেই মদনমোহন যুগলরূপ—রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলা গুপ্ত বৃন্দাবনের নিধুবন। তাহার পর সৃষ্টি, তাহার পর শিবদুর্গা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, নর-নারী, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি। সৃষ্টির পূর্ব্বে যে মধুর রসের প্রভাবে পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে রিরংসাজাত স্পন্দন ঘটে, তাহা হইতেই বৃন্দাবন-লীলার অর্থবাদ। আগে শ্রীবৃন্দাবন, পরে মথুরা, দ্বারকা ও রাজপাট। তন্ত্র যে এ যুক্তি অগ্রাহ্য করেন, তাহা নহে। তাই প্রপঞ্চসারে "অনঙ্গকুসুমা বিশ্বরূপা মদনাতুরা" বলিয়া আদ্যানারীর বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য তন্ত্রেও এই ভাবের কথা অনেক পাওয়া যায়। মধুর-রসের দিক্ দিয়া কথা কহিলে বৈষ্ণব যুক্তিই প্রামাণ্য, ভক্তিরসের দিক্ দিয়া বিচার করিলে নারীকে সর্ব্বাংশে জননীর আসন দিতে হয়। তাই মহাগ্রন্থ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে আদ্যাশক্তিকে জননী বলিয়াই সর্ব্বাগ্রে পরিচিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আজ পর্য্যন্ত কোন সাধক পণ্ডিতই এ বিতণ্ডার সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। রমণীর রূপ যখন আমাদের আলোচ্য বিষয়, তখন মধুররসের দিক্ দিয়াই প্রধানতঃ আমা-দিগকে কথা কহিতে হইবে; কেননা, মধুররসের আধারই রমণী।

আমাদের পুরাণে এবং কাব্যগ্রন্থাদিতে রমণীর রূপবর্ণনা অতি সুন্দর-ভাবে করা হইয়াছে। সুরসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিষবৃক্ষ গ্রন্থে রমণীর রূপের কয়েকটা আদর্শের উল্লেখ করিয়াছেন। মদনভস্মের পূর্ব্বে উমা যখন শিবের আরাধনা করিতেছিলেন, তখন উমা জননী নহেন—রমণী। কুমারের জন্মের পর উমা জননী। সে রমণীর রূপ-বর্ণনা মহাকবি কালিদাসই করিতে পারেন এবং সম্যক্‌রূপে করিতে

২৫



পারিয়াছেন। কেবল যুবতীর দেহ বর্ণনা করিলে সে রূপ-বর্ণনা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না। নিসর্গ-সুন্দরীর নিজ নিকেতনস্বরূপ হিমালয়-পর্ব্বতক্রোড়ে বসন্তের পূর্ণ বিকাশ, তখনও মদনের প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই বলিয়া যেন সে বাসন্ত সৌন্দর্য্য-বিকাশ কতকটা স্তব্ধ, যোগস্থ মহাদেবের যোগপ্রভাবেও যেন কতকটা স্তম্ভিত ; সে স্তব্ধ ভাবের কতকটা অনুভূতি করিয়া, পাছে সে স্তব্ধ প্রকৃতি সরবে ফুটিয়া উঠে, সেই শঙ্কায় নন্দী ছড়ি হাতে করিয়া কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন ; আর পাছে সহসা প্রস্ফুরিত বসন্ত-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিহঙ্গ এবং অলিকুল শব্দ করিয়া উঠে, তাই ইঙ্গিতস্বরূপ নন্দী দক্ষিণ হস্তের ীয় অধরোষ্ঠের উপর চাপিয়া রাখিয়াছেন, আর সেই সময়ে ত্রস্ত-বস্ত্রাঞ্চলা উমা পূজার সম্ভার দুই হাতে করিয়া, একটু হেলিয়া, একটু অবনতমুখী হইয়া অগ্রসর হইতেছেন। চারি পার্শ্বের সৌন্দর্য্যের এতটা বর্ণনা করিয়া, সুন্দর মূর্ত্তিকে মনোহারিত্বের "ফ্রেমে" যেন আঁটিয়া তবে মহাকবি কালিদাস উমা-রূপের অপূর্ব্ব ভঙ্গী পাঠকবর্গকে বুঝাইতে পারিয়াছেন। সিদ্ধ চিত্রশিল্পীর ন্যায় তিনি প্রথমে ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া পরিপ্রেক্ষণের পূর্ণ অবসর দিয়া তাহার উপর উমারূপ লিখিয়াছেন। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রমণীরূপ-বর্ণনা আমাদের সাহিত্যে আর আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

মহাভারতে বেদব্যাস দুই স্থানে দুইটি রমণীর ছবি দিয়াছেন। প্রথম পাঞ্চালরাজের মহাসভায় দ্রৌপদীর স্বয়ংবর। বারে বারে কোন রাজাই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিলেন না, তখন নিরাশায় অধীর হইয়া বলিতে হইল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যিনি যে জাতির হউন না, এই লক্ষ্যভেদ



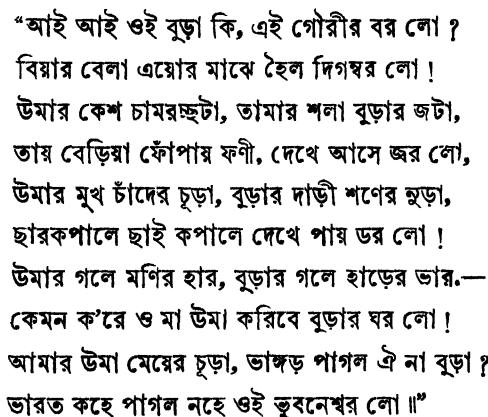
করিতে পারিলে দ্রৌপদীকে পাইবেন। সমবেত দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্ম্মদ বীর ক্ষত্রিয়গণ এই ঘোষণা-বাণী শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন, সে হাস্য-শব্দ শুনিয়া মাল্যহস্তে দ্রুপদবালা কাঁপিতে লাগিলেন, চকিতা হরিণীর ন্যায় উদাস-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। ব্যর্থ-মনোরথ অথচ পূর্ণ-যুবতী দৃষ্টে মদনাতুর রাজাসকল বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছেন; তাঁহাদের বিবৎসার দৃষ্টিতে যেন সেই এতটুকু মেয়েকে তাঁহারা যেন বাগুরাবদ্ধ মৎস্যের মতন করিয়া তুলিয়াছেন, আর সেই মেয়ে নিজ দেহে রূপের ডালি ফুটাইয়া, যুগল পাণিবদ্ধ ফুলের ডালি দেখাইয়া যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট পুরুষের অন্বেষণ করিতেছেন। মহাভারতের এইটুকু বর্ণনা সাহিত্যের হিসাবে এবং কাব্যকলার বিধান অনুসারে অপরাজেয়; যেমন ভাষা, তেমনই ভাব-বিন্যাসভঙ্গী। অলোকসামান্য কবির মনীষাজাত এই কাব্য লেখা, বর্ণনার অনপনেয় লেখায় জগতের সাহিত্যে অদ্বিতীয় হইয়া আছে। এমন বিরোধী রসবিন্যাস আর ত কোথাও দেখি নাই।

দ্বিতীয় চিত্র সুভদ্রা-হরণ, এখানেও বিরোধী রসবিন্যাস আছে; তবে এখানে কেবল রমণীর রূপবর্ণনা নাই, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরও রূপ-বর্ণনা আছে। গাণ্ডীব ধরিয়া ধনঞ্জয় ঘন ঘন বাণ ছুড়িতেছেন, আর ধনুক ও জ্যা চক্রাকারে তাঁহার আরক্ত-মুখমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া আছে, পার্শ্বে দারুক সারথি রথদণ্ডে সংবদ্ধ, সম্মুখে স্বয়ং ভদ্রাদেবী অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া রথ চালনা করিতেছেন, আর এক একবার রাজহংসীর মত গ্রীবা হেলাইয়া বাঁকাইয়া অর্জ্জুনের সেই মদনমোহন রূপ দেখিয়া লইতেছেন। পাছে তাঁহার এই প্রগল্‌ভতা কেহ দেখিয়া ফেলে, এই শঙ্কায় এক একবার লজ্জা

আসিয়া যেন লোহিতবর্ণের শাটী দিয়া তাঁহার গণ্ডস্থলকে আবরণ করিতেছে। নীল সরসীনীরে কহ্লার যেমন সমীর-সন্তাড়িত হইয়া, কখনও বা তাহার লাল মুখখানি জলে ডুবাইতেছে, আর কখনও বা মুখখানি তুলিয়া সভয়ে সূর্য্যকে দেখিয়া লইতেছে। চারিদিকে যাদব-সেনার কোলাহল ও যাদবগণের আক্রমণ, সম্মুখে যুযুধান অর্জ্জুনের অপূর্ব্ব রূপবিকাশ আর ঠিক তাহারই পার্শ্বে কুমুদতুল্যা সুভদ্রার প্রেমস্ফূর্ত্তি। ছবিটি অতুলনীয়—রূপৈশ্বর্য্যের অক্ষয় খনি। যে কবির এমন কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে এমন বর্ণনা, না জানি সে কবি কত বড় কবি।

রুক্মিণী-হরণের চিত্র আর একটি অপূর্ব্ব চিত্র। চারিদিকে বিরোধী জ্ঞাতিসকল রুক্মা সুন্দরীকে ঘিরিয়া আছে, ভিতরে একটি মক্ষিকা-প্রবেশের স্থান নাই। রুক্মিণী কিন্তু কৃষ্ণগতপ্রাণা, তিনি অন্তরীক্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। এমন সময়ে সকলের অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিমান উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। আক্রমণের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার "এরোপ্লেন" নামাইতে সাহস পাইলেন না, ক্ষণেকের জন্য কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। এমন সময়ে রুক্মিণী যেন জৃম্ভণের ছলে দুইটি হাত তুলিয়া হাই তুলিলেন, অমনি রসিক নটবর তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইলেন। এইখানে কবি যে রুক্মিণীর দেহ-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও অপূর্ব্ব এবং অনন্যসাধারণ।

আমাদের ভারতচন্দ্র ব্যঙ্গের সাহায্যে, উপমান ও উপমেয়ের ব্যতিরেকপ্রয়োগে রমণী ও রমণ হিসাবে হরগৌরীর রূপবর্ণনা অতি মনোহরভাবে করিয়াছেন।



"আই আই ওই বুড়া কি, এই গৌরীর বর লো ?
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো !
উমার কেশ চামরচ্ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী, দেখে আসে জ্বর লো,
উমার মুখ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া,
ছারকপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো !
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার,—
কেমন ক'রে ও মা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো !
আমার উমা মেয়ের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ঐ না বুড়া ?
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো ॥"

এই সঙ্গে অন্যত্র লিখিত, ভারতকৃত হরগৌরীর রূপবর্ণনাটা পাঠক মিলাইয়া পড়িবেন ।

"কি এ নিরুপম শোভা মনোরম,
হরগৌরী এক শরীরে ।
শ্বেত পীত কায় রাঙ্গা দুটি পায়
নিছনি লইয়া মরি রে ॥

আধ বাঘছাল ভালে বিরাজে
আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে,
আধ ফণিফণা ধরি রে ।



আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা,
আধ মণিময় হার উজালা।
আধ গলে শোভে গরল কালা।
আধই সুধা-মাধুরী রে॥
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ
এক হাতে শোভে মণি-কঙ্কণ
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতূরা ভক্ষণ,[1]
আধই তাম্বূল পূরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন,
কজ্জল-উজ্জ্বল এক নয়ন,
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন
আধই সিন্দূর পূরি রে॥"

কাজেই বলিতে হয় যে, রমণীর রূপ তাহাই, যাহার দ্বারা পুরুষ রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। রমণীর রূপ তাহাই, যাহার সাহায্যে এক বহুতে পরিণত, এক আমি বহুধা বিভক্ত হইয়া সৃষ্টির বৈচিত্র্য রক্ষা করিতে পারি। তাই কবি বলিয়াছেন যে, রমণীতে জননীর জননীয়তা সম্মুয় অবস্থায় আছে—সম্পুটিতভাবে আছে, আবার জননীর মধ্যে রমণীর রমণীয়তা লুকান আছে। "রমণী জননী, জননী রমণী" তন্ত্রের এই মহাবাক্য কবির মুখে বাঙ্গালা ভাষায় চলিত হইয়া গিয়াছে। এইটুকু বুঝিয়া রাধাতন্ত্রে শ্রীমতী রাধিকার উপর মাতৃত্বের আরোপ করা হইয়াছে। তাই নারী জায়া, পক্ষান্তরে তিনি রমণী, কামিনী, বিলাসিনীও বটেন। "আত্মা বৈ

জায়তে পুত্র”—আত্মা হইতেই পুত্রের জন্ম, সুতরাং যিনি রমণী, তিনিই জননী। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, দেহের যে ভঙ্গী, যে লাবণ্যবিভা নারীকে মাতৃত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়, জননীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রশস্ত ব্যবস্থা করিয়া দেয়, তাহাই রমণীর রূপ। আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে রূপ আমার হৃদয়পটে চিত্রিত হইলে আমি মুগ্ধ হই ; পতঙ্গ যেমন অগ্নির দিকে—জ্বালামালার দিকে দিশাহারা হইয়া যায়, আমিও তেমনি মুগ্ধ হইয়া সেই রূপের অগ্নিশিখায় ঝাঁপিয়া পড়ি। আমি পুড়িয়া মরি বটে, পরন্তু আমার দাহের ফলে এক আমি বহুতে পরিণত হই, নির্দ্বন্দ্ব আমি আর একটা অবলম্বন পাই। মদনের প্রভাবে এ রূপের বর্ণ-বিকাশ, রতির স্ফুরণে ইহার লাবণ্য-বিস্তার। কিন্তু এই মদন ও রতির সাহায্যে রমণীরূপের বিকাশ ঘটিলেও উহার বিপরিণাম মাতৃত্বেই হয়। মদন ও রতি হ্লাদিনীরই কলাবিশেষ। হ্লাদিনী এক দিকে যোগাইয়া আর এক দিকের যোগাড় করেন। সৃষ্টির ইহাই প্রহেলিকা—ইহাই মহামায়া।

“দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।” (গীতা)

অথবা বলিব কি—

“যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্‌বস্তু সদসদ্‌বাসনাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা ?” (চণ্ডী)

তুমিই ত মা সব—প্রপঞ্চসার বলিতেছেন, আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গ্রা যত শক্তি, সবই তুমি। চণ্ডী বলিতেছেন, সদসৎ যা কিছু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে

বিরাজ করিতেছে, সে সকলেরই মূলীভূতা তুমি। তুমিই রমণী—তুমিই জননী।

রমণীর রূপ

জগতের সাহিত্যে রমণীর কামজ রূপেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। যে রূপে যুবক রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, যে রূপে মোহ আছে—উন্মাদনা আছে, সেই রূপের আলোচনাতেই সভ্যজাতির সাহিত্য ব্যস্ত। জীবনে তিনটি ঘটনা একরূপ অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই গ্রাহ্য। জন্ম ও মৃত্যু না থাকিলে জীবনই হয় না। এই জন্মমৃত্যুর মধ্যে বিবাহ বা নরনারীর সম্মিলন, জন্মমৃত্যুর হেতুস্বরূপ হইয়া বিদ্যমান আছে। এক আমি বহু হইব—জীবের যে এই সার, ইহা নরনারীর সম্মিলনেই সম্যক্‌প্রকারে পূর্ণ হয়। এই সম্মিলনই তাই কবিগণ মনুষ্য-জীবনের প্রধান ঘটনা বলিয়া মনে করেন। রূপের আকর্ষণেই এই সম্মিলন সম্ভবপর হইয়া থাকে। তাই কাব্যে ও সাহিত্যে এই আকর্ষণের বর্ণনা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। বরং বলিব যে, এই বর্ণনাতেই কাব্য-সাহিত্যের পর্য্যবসান ঘটে। কাব্যে রমণীর রূপ দুই ভাগে বর্ণিত হইয়া থাকে। যথা—(১) দেহজ, (২) মানস। কেবল নারীর অবয়বের বর্ণনা যাহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাই দেহজরূপবর্ণনা। নারীর হৃদয়ের রুচি-প্রবৃত্তির বর্ণনাপ্রভাবে যে কবি নারীর দেহের সুষমা ফুটাইয়া থাকেন, তাহাই নারীর মানস-রূপ। দেহজ রূপ কেবল দৃষ্টির সাহায্যে পুরুষকে আকৃষ্ট করে; একবার দর্শনে প্রাণমন টানিয়া রাখে। সে আকর্ষণে তৃপ্তি



নাই, কেবল দর্শন-আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি করে। তৃপ্তি হয় না—হইবার নহে ; তাই "লাখ লাখ জনম রভসে" যে রূপ চিন্তা করিয়া কাটাইলাম, দেখিবার সাধ কখনই মিটিল না। যত মোটা করিয়া রমণীরূপের বর্ণনা কর না কেন, কেবল দেহ লইয়া যতই ব্যস্ত থাক না কেন, প্রেম জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কাররাশিকে টানিয়া বাহির করিয়া সেরূপে অরূপের মহিমা আরোপ করিবেই। প্রকৃতির শোভার সহিত, সৃষ্টিব্যাপী মদন-শক্তির বিকাশের সহিত নারী-রূপের সামঞ্জস্য।



লেখিকা—শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্তা।

মানস-সৌন্দর্য্য

আজকাল আমাদের দেশে নারীজাতিকে লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। সকলেরই মুখে এক কথা যে, হিন্দুরমণী খন আর সেকালের সেই শান্ত, শিষ্ট, সহিষ্ণুতাশালিনী সেবাপরায়ণা—উ হৃদয়া, পরোপকার-ব্রতধারিণী নারী নহে। এখন তাহার পরিবর্ত্তে দেহমার্জ্জন-নিপুণা বেশভূষা-পারিপাট্যশালিনী, সুখ-দুঃখে অনভিজ্ঞা, রোগে শোকে অধৈর্য্যা, আত্মসুখ-অন্বেষণকারিণী, শ্রমবিমুখা নারী-মণ্ডলী হিন্দুরমণী নাম লইয়া গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন। যে হিন্দুনারী ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, সেই হিন্দুরমণীই এক্ষণে ধর্ম্ম ত পরের কথা, কর্ম্মে পর্য্যন্তও মতি রাখিতে অভিলাষিণী নহেন। এই কর্ম্ম-শৈথিল্যপ্রযুক্ত অনেক নারী তাঁহাদের স্বামিপুত্রের উপার্জ্জিত আয় অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করিয়া অনর্থক সংসারকে ঋণজালে



জড়াইয়া ফেলেন। আবার অনর্থক, অর্থাৎ দেহরক্ষা হইতেও অধিক পরিমাণে বিলাস-ব্যসনে অনুরক্তা হইয়াও অনেক নারী সংসারকে বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলেন। কতক কালধর্ম্মে, কতক আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি-পদ্ধতির খাতিরে ও গৃহলক্ষ্মীদিগের সখ-সৌখীনতা-বৃদ্ধির জন্যও হিন্দুর চিরশান্তিময় গৃহ হইতে সুখ-শান্তি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বিলাস ও ব্যসনের ক্রমবৃদ্ধির ফলে, শ্রম-বিমুখতার জন্য আধুনিক গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধা নারীজাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমধিক পরিচালনা হইতে না পারায়, স্বভাবের নিয়মলঙ্ঘনহেতু হিন্দুরমণীর শরীরে নিত্য নবীন ব্যাধি দর্শন দিয়া, তাহাকে ও তাহার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিদিগকে দিন দিন রুগ্ন ও হীনবল করিয়া ফেলিতেছে।

আধুনিক নারীসমাজের অধঃপতনের মূল কারণ বর্ত্তমান পুরুষ-মণ্ডলী। পুরুষ কর্ত্তার জাতি, তিনি যে ভাবে সংসার ও সমাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন, তদাশ্রিতা নারীজাতিও তদ্‌ভাবান্বিতা হইয়া দাঁড়াইবে। এই অসীম ঐশীর নিয়ম সর্ব্বত্র। বিধাতা পুরুষ যেমন আপনার ইচ্ছায় প্রকৃতিদেবীকে সুসজ্জিতা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার হাব-ভাব ও বেশ-পারিপাট্যে আপনিই মুগ্ধ হইয়া নিয়ত সৃষ্টির পরিস্ফুটসাধন করিয়া থাকেন, আর প্রকৃতিদেবীও সতত সেই পরমপুরুষকে মুগ্ধ করিবার জন্য চেষ্টান্বিতা হইয়া বিবিধ সজ্জায় সজ্জিতা হয়েন, তেমনি ক্ষুদ্র সংসারেও পুরুষমাত্রেই সুবেশা নারীতেই আকৃষ্টচিত্ত হন এবং সুমার্জ্জিতা নারীমূর্ত্তিই দেখিতে ভালবাসেন। সেই নীতি অনুসারেই অর্থাৎ পুরুষজাতির চিত্ত মুগ্ধ ও প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্যই তাঁহাদের

রুচি অনুসারে নারীজাতির বেশভূষা-পারিপাট্য ও বিলাস-ব্যসনের পরিবর্ত্তন। সকল দেশেই পুরুষের রুচি লইয়া নারীজাতির কারবার, তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য কোথাও নাই বা থাকিতে পারে না। এই ঐশী নীতির অনুসারেই কি সভ্য কি অসভ্য সকল দেশই পরিচালিত।

কোন্ দেশের পুরুষসমাজ জ্ঞান ও কর্ম্মরাজ্যের অভ্যন্তরে কতদূর প্রবেশলাভ করিয়াছেন, তাহা তদ্দেশীয় নারীচরিত্র হইতে বুঝা যায়। পুরুষের বুদ্ধি, বিদ্যা, প্রবৃত্তি, রুচি, আমোদ ইত্যাদির অবস্থা ধরিয়া সর্ব্বত্রই নারী-জাতির অবস্থান্তর হইয়া থাকে। যে দেশের পুরুষজাতি বিলাসরাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন, যাহাদের জ্ঞান বাহ্যস্তর বা মানস-রাজ্যেই পর্য্যবসিত, তদ্দেশীয় নারীজাতি সেই সকল বাসনামুগ্ধ, কামনালোলুপ বাহ্য বা দেহদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষজাতির রুচি অনুসারে কেনই বা হাবভাবশালিনী, রূপকামপ্রাণা, দেহ-মার্জ্জন-ঘর্ষণ-তৎপরা, বিলাসিনী না হইবেন?

এই নীতি ধরিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আধুনিক বঙ্গবালার অবস্থাবিপর্য্যয়ের কর্ত্তাই হইতেছেন পুরুষসমাজ। তাঁহাদের অবস্থা, জ্ঞান, বুদ্ধি, রুচি ও মনোরাজ্য ক্রমশঃ যে ভাবে উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের অধীনা নারীজাতিতেও সেই ভাব নিশ্চয়ই বিকসিত হইয়াছে। স্বামীর মনোরঞ্জনে অলসতা ও বিলাসিতাকে সমর্থন করিয়া তাঁহারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিবিধ কর্ত্তব্যে বঞ্চিত হইতেছেন। ইহলোক কর্ম্মের দ্বারা জয় করা যায়, আর পরলোক জ্ঞানের দ্বারা জিত হইয়া থাকে। যাঁহাদের দ্বারা সামান্য সাংসারিক কার্য্য সুশৃঙ্খলে ও



সুনিয়মে সংসাধন করিতে আশা করিতে পারা যায় না, জ্ঞান তাঁহারা কি প্রকারে আয়ত্তে আনিতে পারিবেন? কর্ম্মে পরিপক্কতা না হইলে তদ্দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তির আশা থাকে না। বঙ্গরমণীগণের সকল কার্য্যের মূলেই অহংভাব পরিস্ফুট। আত্মম্ভরিতার বিকাশে কর্ত্তব্যচ্যুতি; কর্ত্তব্য-ভ্রষ্টের জন্যই বাঙ্গালী সংসারে এত বিশৃঙ্খলার উদয়। কালধর্ম্মে পুরুষ-র অভিলাষ অনুসারে বাঙ্গালীর মেয়ে, বাল্যকাল হইতেই শুধু সাজ-সজ্জা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া থাকে। কন্যা জন্মিবামাত্রেই পিতা-মাতা তাহার বিবাহের জন্য চিন্তিত হইয়া থাকে। কিসে কন্যা সুরূপা হইবে, কিরূপ বেশভূষায় সজ্জিতা করিলে তাহাকে অধিকতর সুন্দরী দেখাইবে, কিসে লোকে তাহাকে পছন্দ করিবে, এই ভাবনায় তাহার অভিভাবকবর্গ সমধিক চিন্তিত হইয়া থাকেন। কারণ, এখন বিবাহে পাত্রই স্বয়ং নিয়ন্ত্রীকর্ত্তা হয়েন, তাঁহার পছন্দের উপরই বিবা-হের নির্ভরতা, সুতরাং বালিকার রূপের মোহনীয়তা চাই!—রূপে পাত্রকে আকৃষ্ট করিতে না পারিলে বিবাহ হওয়াই দায়!

বাল্যকাল হইতেই বালিকাকুলের সাধনা সাজসজ্জায়, ভূষণে, রূপের বাহারে। যৌবনে স্বামিসমাগমে স্বামী তাহাদের গুণগরিমা, কার্য্যকুশ-লতা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি কোন গুণেরই পরিচয় চান না, শুধু সাজসজ্জায় ও রূপজ মোহে আকৃষ্ট হইতে চান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রূপ-সাধনা, সজ্জাশোভা ছাড়া রমণীর পালনীয় কর্ত্তব্য আর কি হইতে পারে? কাজেই বাঙ্গালী-পুরুষের রুচি অনুসারেই ঘরে ঘরে বাঙ্গালী নারীর এরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। রূপচর্চ্চায় দিন কাটাইয়া হৃদয়ের



নারীসুলভ গুণ ও জ্ঞানবিস্তারের সময় ও সুযোগ তাঁহাদের মোটেই থাকে না। পুরুষের হৃদয়হীনতার জন্যই নারীসমাজে এই দুর্নীতি উপস্থিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে হিন্দু পুরুষে, পৌরুষের গুণের প্রবলতা ছিল, তাহাদের অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইত, অন্তর্দৃষ্টির প্রসারতা অন্তরে, তাই রূপ হইতে গুণই তাহাতে সমধিক পরিস্ফুটিত হয়, এজন্য পুরাকালে হিন্দু পুরুষগণ, শুধু রূপজমোহে আকৃষ্ট হইতেন না এবং নারীজাতিকে কেবল ভোগ-উপাদান বলিয়া ভাবিতেন না। পুরাকালে হিন্দু পুরুষগণ অতীব শ্রদ্ধা-ভক্তির চক্ষে নারীজাতিকে দেখিতেন, তাই তাঁহাদের অন্তর ও বাহিরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এত বিধিনিয়ম ও শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন—যাহার ফলে একদিন ভারতীয় নারীসমাজে অতুলনীয়া নারীকুলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বস্তুতঃ শুধু রূপেতেই নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিকসিত বা পর্য্যাপ্ত নহে। রূপের উচ্চাঙ্গ গুণ; ঐ গুণ যখন রূপের উপর প্রতিফলিত হইয়া উঠে, তখনই নারীজাতির প্রকৃত সৌন্দর্য্য সম্যক্ বিকসিত হয়। প্রকৃতিদেবীর রূপ যেমন নিজের ধন, নারীজাতিরও তেমনই রূপ নিজস্ব সম্পত্তি; উহাতে গুণবিকাশ করা পুরুষের কাজ, পুরুষ গুণবান্ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতিও গুণবতী হইয়া উঠেন। এক্ষণে বাঙ্গালার পুরুষজাতির কার্য্য হইতেছে, নারীজাতিকে কেবল রূপ-বিকাশের জন্য উত্তেজিত না করিয়া, যে শিক্ষা-ব্যবহারে রমণীহৃদয়ের প্রকৃত গুণাবলী বিকসিতা হইয়া উহাকে প্রকৃত রূপবতী করে, সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত উদ্দীপিত করা, সেই মহীয়ান্



অন্তর-সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া আর কোন রমণীরই ঘষিয়া মাজিয়া রূপবিকাশ করিবার প্রয়োজন হইবে না। অন্তরে বাহিরে সৌম্য শান্ত সুষমা শতচন্দ্রপ্রভায় চিত্ত-কুমুদিনী সনে আনন্দের লহর তুলিবে।



পাঠে তন্ময়।

বসুমতী প্রেস।



স্নেহময়ী

সপ্তম লহরী

স্ফোটন



লেখক—শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

স্ত্রী-শিক্ষা

মহানুভব ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ইহাঁর মত বাঙ্গালীর বন্ধু, সদাশয় ইংরেজ ভারতে অধিক আসেন নাই। ইনি বেথুন-কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালায় স্ত্রী-শিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এই সদনুষ্ঠানে বেথুনের সহায় ছিলেন। তর্কালঙ্কার সমাজের শাসনে ভীত না হইয়া আপনার দুই দুহিতা কুন্দমালা ও মালতীকে সর্ব্বপ্রথমে বেথুন-বিদ্যালয়ে পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র প্রভৃতির কন্যারাও বেথুনে পড়িয়াছিলেন। তখন বেথুন-বিদ্যালয়ের গাড়ীর উভয় পার্শ্বে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

এখন শুনিতে পাই, স্ত্রী-শিক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। তাহা কি সত্য?



কয়েকজন বাঙ্গালীর মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া উপাধি লাভ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে স্ত্রী-শিক্ষার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়াছে, এমন মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

বলা বাহুল্য, সমগ্র সমাজ ও জনসাধারণের সহিত এই উচ্চ শিক্ষার কোনও সংস্রব নাই। যে হিন্দু-কন্যাদের জন্য বেথুন-বিদ্যালয় কল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এক্ষণে এই বিদ্যালয়ে তাহাদের বিন্দুমাত্র উপকার হয় না, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিব।—সম্প্রদায়-বিশেষের পক্ষে বেথুন-বিদ্যালয় উপযোগী হইলেও, তাঁহারা—বোধ করি, সাম্প্রদায়িক শিক্ষার সৌকর্য্যের জন্য, স্বতন্ত্র বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের বালিকারাই এক্ষণে বেথুন-বিদ্যালয়ে উচ্চশ্রেণীর ফলভোগ করিতে পারে। কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের মুষ্টিমেয় হিন্দু বেথুন-বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে বালিকাদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহারা কি শিক্ষা লাভ করে? এন্ট্রেন্স স্কুলের ষষ্ঠ, বা পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া যে 'বিদ্যা' হয়, তাহাকে আমরা শিক্ষা বলিতে পারি না। এই সকল বালিকা বাঙ্গালাও শিখিতে পারে না,—সেকেণ্ড বুক, থার্ড বুক পড়িয়া চিঠির শিরোনামা পড়িবার মত বিদ্যাও তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। দশ এগার বৎসরের অধিক যাহাদের ছাত্রী থাকিবার উপায় নাই, বিদ্যালয়ে তাহাদের কি শিক্ষা হইতে পারে, আমরা ত তাহা কল্পনা করিতে পারি না। তবু যদি বিদ্যালয়ে পড়িবার কাল বারো বৎসর ধরা যায়, এবং আট হইতে বারো পর্য্যন্ত চারি বৎসর

তাহাদের মোটামুটি শিক্ষার সময় নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে, সেই শিক্ষার কাল বেথুন-বিদ্যালয়ে বা তৎসদৃশ কোনও এনট্রেন্স স্কুলের নিম্নতম শ্রেণীতে যাপন করিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য আদৌ সিদ্ধ হয় না, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। হিন্দু-বালিকার অবশ্য-পাঠ্য রামায়ণ-মহাভারতও তাহারা পড়িতে পারে না।·আর যে চতুরস্র, গভীর প্রাথমিক শিক্ষার ফলে বালিকাদের হৃদয়ে জ্ঞানের স্পৃহা ও পড়িবার বাসনা অঙ্কুরিত হইতে পারে, এই শ্রেণীর বিদ্যা-কল্পদ্রুমে সে ফলও ফলে না। বিশেষতঃ যাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন অন্তঃপুরের অন্ধকারে সম্পূর্ণ বিপরীত সামাজিক নীতি-রীতি ও ধর্ম্মানুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহাদিগের পক্ষে সুকুমার শৈশবে অন্য সমাজের আদর্শে জীবনযাপন সঙ্গত কি না, তাহাও সামাজিকগণের বিচার্য্য। সে 'আদর্শের' স্বরূপ-বিচার এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক।—আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, ভিন্ন সমাজের ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের আদর্শ যতই উন্নত ও উজ্জ্বল হউক, অন্য সমাজে যখন সে আদর্শের অনুসরণ করিবার সম্ভাবনা আদৌ নাই, তখন শৈশবে সাহচর্য্যের দ্বারা বালিকাদিগের তরুণ হৃদয়ে তাহার বীজ বুনিয়া কোনও লাভের আশা করা যায় না, বরং তাহাতে প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় যে সকল 'কারণে' ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই অল্পপরিসর ক্ষেত্রে আমরা তাহার আলোচনা করিব না।—আমরা হিন্দুসমাজের অবস্থাই বিচার করিতেছি।—বেথুন-বিদ্যালয়ে বা তৎসদৃশ কন্যাপাঠশালায় হিন্দু-কুমারীদের বিন্দুমাত্র কল্যাণের আশা নাই, তাহা বুঝিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কলিকাতার মত রাজধানীতেও হিন্দু-বালিকাদিগকে শিক্ষিত করিবার উপায় নাই, ইহা



অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য স্বর্গীয় মাতাজী মহারাণী "মহাকালী পাঠশালা"র পত্তন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার সাধুসঙ্কল্পও পণ্ড হইয়াছে। মহাকালী পাঠশালার বালিকারা স্তব মুখস্থ করে, সমস্বরে পাঠ করে এবং পিতা, মাতা, অভিভাবকবর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারে। কিন্তু শুকপক্ষীর ন্যায় এই অর্থবোধশূন্য স্তবপাঠ যে শিক্ষা নহে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিব। ইহারা বাঙ্গালা ভাষাও শিখিতে পারে না, ভবিষ্যৎ-জীবনে ধোপার হিসাবটাও করিতে পারিবে না। মধ্যে মধ্যে এই বালিকা-চমূকে টাউন-হলে সেনেট-হলে স্থবর্ণ-প্রতিমার অর্থাৎ বিত্তশালী জমীদারবিশেষের সম্মুখে স্তব পাঠ করিতে দেখিয়া আমাদের চোখে জল আসিয়াছে। মহাকালী পাঠশালার যদি পঙ্কোদ্ধার ও আমূল-সংস্কার না হয়, তাহা হইলে, এই অনুষ্ঠানে হিন্দু-সমাজের কোনও উপকার হইবে না, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

যে জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ, সে দেশের নারীদেবতা আর কতকাল অজ্ঞানের অন্ধতমসে ডুবিয়া থাকিবে? হিন্দুসমাজ আর কতদিন অন্ধ হইয়া থাকিবেন? শিক্ষার সহিত যাহাদের সংস্রব নাই, অক্ষরের সহিত যাহাদের পরিচয় নাই, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুর উপজীব্য গ্রন্থরাজির সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহাদের বুদ্ধি কখন মার্জ্জিত হয় নাই, বিচারশক্তি কখনও পুষ্ট হইবার অবকাশ পায়

নাই, উচ্চ আদর্শে যাহারা কখনও অনুপ্রাণিত হয় নাই, তাহাতেই ত হিন্দুর তপোবন, হিন্দুর নন্দন, হিন্দুর সাধনক্ষেত্র ও হিন্দুর সুখের তীর্থকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে। পূর্ব্বে কথকতায়, বারব্রতে, পুরস্ত্রীগণের উপদেশে যে শিক্ষার অবকাশ ছিল, তাহা ত কালধর্ম্মে লুপ্ত হইয়াছে। নূতন যুগের নব প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষার অবকাশ হইয়াছে, আমাদের গৃহ লক্ষ্মীদের ভাগ্যে সে শিক্ষাও ত ঘটিতেছে না। ফলে সমাজের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, গৃহাশ্রমে প্রেতলীলার সূচনা হইয়াছে। যে লক্ষ্মী হিন্দুকে রক্ষা করিতেন, তিনিই কখন উগ্রচণ্ডীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পরিবারের সুখ-শান্তি পদদলিত করিতেছেন। যে কল্যাণী সংসারে, সমাজে কল্যাণ-সুধার ধারা বর্ষণ করিতেন, তিনি আজ অন্তঃপুরে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার আলবালে তীব্র হলাহলের ধারা সেচন করিতেছেন। মা ষষ্ঠীর প্রসাদে যাঁহারা যশোদার মত পল্লীর 'মা-মরা' ছেলেকেও হৃদয়ের পীযূষে পুষ্ট করিতেন, এখন তাঁহার ছেলে আয়ার কাছে না হউক, 'খোকার ঝি'র কাছে বাড়িতে থাকে! যে হিন্দু-নারী—

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ,
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"—

আজ সেই হিন্দুনারীর স্বামী নিশাচর দানবে পরিণত হইয়াছে! পুরুষের পাপে যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। এত দিন নারীর পুণ্যে হিন্দুর ধর্ম্ম, সমাজ, গৃহধর্ম্ম ও বংশধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। কুসমাজের অর্দ্ধাঙ্গের পাপই সমাজ-নাশের পক্ষে যথেষ্ট। আমরা পুরুষ—বহু পাপসঞ্চয় করিয়া সমাজের

জীবনীশক্তির অপচয় করিয়াছি।—এখন অপর অর্দ্ধাঙ্গনারীকেও অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিয়া আমরা তাঁহাদিগকেও আমাদের উপযুক্ত সঙ্গিনীতে পরিণত করিতেছি।

নারীর পুণ্যে এখনও ভারতবর্ষ রসাতলে যায় নাই। ধর্ম্ম ভারত-নারীর সহজাত সংস্কার, Instinct। কিন্তু সে 'সংস্কার' আর থাকিবে কি? প্রত্যহ, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, পদে পদে, পারিপার্শ্বিক কারণে যে নারীর সহজাত সংস্কারকে ক্ষুন্ন করিতেছে, তাহা আর কত দিন স্বাভাবিক বিমল জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়া এই আপদ্ধর্ম্মের বিষম যুগে, কর্ত্তব্যের—ধর্ম্মের—নীতির—সুখের ও শান্তির পথ নির্দ্দেশ করিবে? যে পথে তোমার নিজের আলো নিভিয়া গিয়াছে, যে পথে পদে পদে—পুরুষ তুমি—তোমার চরণ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, নারী কি সেই দুর্গম পথে বিনা আলোকে চলিতে পারিবে? তাহা সম্ভব নহে। হে দেশবাসি! যদি হিন্দুর বংশধারা অক্ষুন্ন রাখিতে চাও, তাহা হইলে নারীদেবতার পূতমন্দিরে জ্ঞানের পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালিয়া মহাশক্তির আরতি কর, নতুবা তোমার কল্যাণ নাই।



লেখক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

স্ত্রী-শিক্ষা

যে বঙ্গমহিলা বিদ্যাবতী হন, দুর্ভাগ্যবশতঃ সমাজ তাঁহার প্রতি কটুকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন। সমাজ তাঁহাকে অশেষ দোষের আধার বিবেচনা করেন—তাঁহার চাল-চলন, ভাবভঙ্গী সকলই সমাজের ঘৃণিত,—সমাজের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা বিড়ম্বনা। আশ্চর্য্য! শিক্ষায় সমাজ, শিক্ষাকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে!—শিক্ষা—শিক্ষাই,—শিক্ষা কখনও বিড়ম্বনা হয় না, শিক্ষার অভাবই বিড়ম্বনা। আধুনিক শিক্ষা পাশ্চাত্য-শিক্ষা ব্যতীত অপর কিছুই নয়। বাঙ্গালা ভাষাও পাশ্চাত্য-ভাবে পরিপূর্ণ। বঙ্গমহিলা বাঙ্গালা বা ইংরাজী বিদ্যা যাহাই লাভ করুন, তাহাতে পাশ্চাত্য-বিদ্যালাভ করেন মাত্র। পাশ্চাত্য-বিদ্যার সহিত প্রাচ্য-বিদ্যার প্রভেদ, ধরণে—মূলে নয়। দেবী সরস্বতী শুভ্রবরণা, শ্বেতপদ্মাসনা, বীণাযন্ত্রধারিণী পূর্ব্বেও, পশ্চিমেও,—কেবল পরিচ্ছদের প্রভেদ। পাশ্চাত্য-বিদ্যার ধর্ম্ম-দীক্ষা ও

বৈষয়িক দীক্ষা স্বতন্ত্র। প্রাচ্য-দীক্ষায় বিশেষতঃ হিন্দু-দীক্ষায় এক ধর্ম্ম-দীক্ষা আছে, আর সমস্ত দীক্ষাই তাহার অন্তর্গত। পাশ্চাত্য-দীক্ষায় বঙ্গমহিলা কেবল বৈষয়িক দীক্ষাই পান, ধর্ম্ম-দীক্ষার অভাব রহিয়া যায়। এই ধর্ম্ম-দীক্ষার অভাবই লক্ষ্য করিয়া সমাজ শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন, কিন্তু বোঝেন না—অভাবের নিমিত্ত সমাজ দোষী, শিক্ষা দোষী নয়। একটু স্থিরচিত্তে বিচার করিলে, সমাজ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, হিন্দু-সমাজ-স্রষ্টা শিক্ষিতা হিন্দুমহিলার কোলে স্তন্যপান করিয়া নিদ্রা যাইতে যাইতে কৃষ্ণের সহস্রনাম শুনিয়া, শিক্ষিত ঠাকুরমার কাছে, গল্প-চ্ছলে রাম-চরিত, যুধিষ্ঠির-চরিত শ্রবণ করিয়া বলবান্ হৃদয়লাভে সমাজ-সৃষ্টি করিয়াছেন। শিক্ষিতা পিতামহী, শিক্ষিতা মাতা, শিক্ষিতা ভগিনী ও শিক্ষিতা সহধর্ম্মিণীর শিক্ষায় তিনি সমাজ-স্রষ্টা ; মাতৃ-দুগ্ধের সহিত ধর্ম্ম-শিক্ষা পাইয়া স্বেচ্ছায় কখনও অধর্ম্মকথা উচ্চারণ করিতে পারেন নাই, চেষ্টায় কখনও পর-অহিতসাধনে সমর্থ হন নাই,—স্বার্থতাড়নে পরধন অপহরণে সমর্থ হন নাই,—সঞ্চয়ী হইবার চেষ্টা করিয়াও ভিখারীকে বিমুখ করিতে সমর্থ হন নাই। ধর্ম্ম-শিক্ষা,—অস্থির সহিত, মজ্জার সহিত, শিরার সহিত, শোণিতের সহিত এক হইয়া তাঁহাকে সমাজস্রষ্টা করিয়াছে, তিনি সৃষ্টি করিব বলিয়া সমাজ সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির আদর্শে সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে। অতি কদাচারী ব্যক্তিও তাঁহার ধর্ম্মজ্যোতিঃ-প্রভাবে চরণে আসিয়া অবনত হইয়াছে, কঠোর হৃদয়ে দয়া প্রবেশ করিয়াছে, দুঃশীলা, শান্ত সহধর্ম্মিণী হইয়া কুলব্রতে নিযুক্তা। ইন্দ্রিয়-প্রবলা বিধবা তাঁহারই উচ্চ আদর্শে ব্রহ্মচারিণী। বালিকা তাঁহারই

মিষ্ট উপদেশে বাল্যচপলতা পরিহার পূর্ব্বক মাতার নিকট কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান—দীক্ষার্থী। চঞ্চল বালক, সমবয়স্কের সহিত বিদ্যানুশীলনে রত, পরস্পর কলহ করে না, প্রহারের ভয়ে নয়—অন্য কোন ভয়ে নয়,—ভয় পাছে সেই শিক্ষিতা স্ত্রী-দীক্ষিত সমাজ-স্রষ্টা মনোক্ষুণ্ণ হন। শিক্ষিতা স্ত্রী-দীক্ষার সমাজ এতদূর বলশালী। শিক্ষার অভাবই ঘৃণ্য, শিক্ষা ঘৃণ্য নয়। সমাজ অন্য কিছুই নয়, আমরা সকলে মিলিয়াই সমাজ। যদি পাশ্চাত্যশিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত সুফলপ্রদ না হয়, সে ধর্ম্মশিক্ষা বালিকাকে কে দিবে? পাঠক! যোড়হস্তে বিনয়-বচনে আপনার নিকটে নিবেদন,—আপনাদের মধ্যে কয়জন কার্পেট-জুতা-নির্ম্মাণকর্ত্রী বালিকা অপেক্ষা সত্যবাদিনী বালিকার আদর করিয়াছেন? কয়জন পিতা বিশ্রামসময়ে স্বীয় কন্যার মুখে "কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা" শ্লোক শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম বলিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন? কয় জন স্বামী স্বীয় পত্নীকে কন্যার ধর্ম্মোন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিয়াছেন? যদি নিজ নিজ গৃহে এ কার্য্য না করিয়া থাকেন, তবে একত্র মিলিয়া একজন প্রগল্‌ভা কুমারীকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। যে শিক্ষার অভাব, তাহার পূরণ করুন—শিক্ষার দোষ দিবেন না।

বহুদিন নয়, মুসলমান আসিবার কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গালা অক্ষরে, জাপানে "প্রণব" ক্ষোদিত হইয়াছে। যদি আধুনিক জাতীয় নাশকারী কুসংস্কার উপেক্ষা করিয়া, কালাপানীর ভয় পরিহারে জাপানে যান—দেখিতে পাইবেন যে, বাঙ্গালা অক্ষরেই প্রণব ক্ষোদিত বটে। ফিলিপাইন ও যাভায় বাঙ্গালীপুত্রকে চিনিতে পারিবেন, যে বাঙ্গালী এখন স্পানুসী

চড়িতে ভয় পায়। বহু দিন নয়, সিরাজদ্দৌলার আমলে বীরপুরুষ বাঙ্গালী দাম্ভিক ইংরাজসৈন্তকে স্তম্ভিত করিয়াছে; ইতিহাস তাহার সাক্ষী দিবে। বহু দিন নয়,—ইংরাজ আমলেই বাঙ্গালী—"আমি বাঙ্গালী" বলিয়া স্বদেশের আদর করিত; বহু দিন নয়, পঞ্চাশ বৎসর গত মাত্র, বাঙ্গালী-নির্ম্মিত বস্ত্রে ইংরাজ-রাজমহিলা ভূষিতা হইতেন। বহু দিন নয়, পঞ্চাশবর্ষ অপেক্ষা ন্যূন গতমাত্র, এক পল্লীতে বাঙ্গালীর পরস্পর সদ্ভাব ছিল,—একের বিপদ্ বা সম্পদে—পল্লীর বিপদ্ বা সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইত। বহু দিন নয়—বাঙ্গালী মুরুব্বি মানিত, মুরুব্বির কর্ণে হুঁকোর ধ্বনি প্রবেশ করিলে লজ্জিত হইত। বহু দিন নয়,—মৃত ব্যক্তির সৎকারের নিমিত্ত সমস্ত পল্লী অগ্রসর হইত, মৃতদেহ সৎকার আশঙ্কায় পত্নীর বা পুত্রবধূর গর্ভ-ছলনা হইত না, কিন্তু কিছুই আর নাই। বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে—বাঙ্গালীর সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

কিন্তু একটি রত্ন বাঙ্গালীর গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয় নাই,—এ রত্ন নারী-রত্ন। যাহারা পতির সহিত সহমরণে যাইত, তাহারা আজও আছে; প্রকাশ্যে পতির সহিত আইনভয়ে দগ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু পতি আর বাঁচিবে না নিশ্চয় জানিয়া বিনা রোগে বস্ত্রাচ্ছাদনে, ধরণীশয়নে মৃত্যুমুখে পতির অগ্রগামিনী হয়। অতি প্রগল্ভাও পর-পুরুষদর্শনে মস্তক অবনত করেন। ইংরাজী নভেলের 'হিরোইন' বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজিতা। যে কুৎসিত লম্পট, পত্নীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বারবিলাসিনীর গৃহে লাঞ্ছনাভাজন হইয়া বাস করে, সেও আজ-ও জানে যে, সে পত্নী তাহার প্রত্যাখ্যানে রন্ধন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ

করিতেছে বটে, তথাপি দারুণ সংক্রামক বসন্ত-রোগে আক্রান্ত হইয়া পরিত্যক্তা দুঃখিনীর নিকট আশ্রয় পাইবে, শত শত দুর্ব্যবহার করিয়া, সীতা-সাবিত্রী—আদর্শ-দীক্ষিতা দুঃখিনী পরিত্যক্তা মর্ম্মপীড়িতা রমণী যে তাহাকে আশ্রয় দিবে, এ বিশ্বাসে সন্দেহ জন্মে না,—এই নারীরত্ন বাঙ্গালীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই গৃহলক্ষ্মী সন্তাপিত হইয়াও চঞ্চলা হন না।

আশ্চর্য্য, সমাজ কালে শিক্ষা অভাবে যাহাতে সেই কুলদেবী পেতনী হন, এই চেষ্টায় তাহাকে শিক্ষা দিতে অসম্মত। পাশ্চাত্যশিক্ষায় যত দোষই থাকুক, নীতিশিক্ষাদানে পরাঙ্মুখ নহে। পাশ্চাত্য-বিদ্যা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, স্বাধীনতার পক্ষপাতী অনর্থাচারের নয়। স্বাধীনতায় উপদেশ দেয়, আপনার ভার কাহাকেও দিব না, আপনার সংসার আপনি রক্ষা করিব, আপনার সন্তানের নিমিত্ত আপনি দায়ী, আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম, ভরণপোষণ—আপনার দ্বারা নির্ব্বাহ করিব। পাশ্চাত্য-শিক্ষার এই স্বাধীনতা শেখায়। বাঙ্গালী মহিলা এ স্বাধীনতা নূতন শিখিতেছে না,—প্রপিতামহীধারাক্রমে—তাঁহার প্রপিতামহী হইতে ধারাবাহিক-ক্রমে এই স্বাধীনতা শিখিয়া আসিতেছে। সেই শিক্ষাবলে আজও দেখা যায় যে, অসূর্য্যম্পশ্যা বাঙ্গালীনারী দুর্দ্দিনে নিপতিতা হইয়া পরগলগ্রহ অবস্থাকে ঘৃণা করিয়া পরগৃহে সামান্য রন্ধনকার্য্যে নিযুক্তা। বাঙ্গালীর ঘরে গিন্নী নাই। এই একটি প্রধান অভাব। গিন্নীর কার্য্য অনেক ছিল—যাহা অদ্যাবধি কোনও সুশিক্ষিত ব্যক্তি করিতে পারেন না। গিন্নী অতি সুশিক্ষিতা ছিলেন, কত আয়ে কত ব্যয় করিতে হয়, তিনি জানিতেন। তাঁহার গুণে, চাকরী যাইলেই ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ বা জেলে যাইতে হইত

না। কি নিয়মপালনে বালক নীরোগ হইয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহা গিন্নী সম্পূর্ণ জানিতেন, গিন্নীর প্রভাবে পঞ্চাশ টাকা মাহিনার অর্দ্ধেক বা অর্দ্ধাংশ ডাক্তারকে বা ডাক্তারখানায় দিতে হইত না। গিন্নী জানিতেন, পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া কিরূপে আপনার করিতে হয়, কিরূপে স্বামীকে ভক্তি দেখাইয়া স্বামি-সোহাগিনী করিতে হয়। গিন্নী জানিতেন, কি নিয়মে দাসদাসীকে পরিবারস্থ করিয়া তাহাদের নিজ গৃহ ভুলাইয়া দিয়া, তাঁহার গৃহে গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করাইতে হয়। গিন্নীর শিক্ষায় ভৃত্য, প্রভুর নিমিত্ত প্রাণ দিতে সঙ্কুচিত হইত না। গিন্নী জানিতেন, কিরূপে নাতি-গুলিকে মানুষ করিতে হয়, কালে সেই নাতিগুলিই দশকর্ম্মান্বিত। গিন্নী শিক্ষিতা, এ শিক্ষায় যিনি শিক্ষা না বোঝেন, অক্ষর-শিক্ষা যাঁহার শিক্ষা-বোধ, তিনিও গিন্নীর সমস্ত পরিচয় পাইয়া বুঝিবেন যে, গিন্নী অক্ষর জানিতেন—বুঝিবেন যে, কর্ণ দিয়া হউক বা চক্ষু দিয়া হউক, গিন্নী অক্ষ-রের মর্ম্ম জানেন। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত তো তাঁহার কণ্ঠস্থ বটেই, এ ব্যতীত সাধুসেবায় গিন্নী ষড়্‌দর্শনে শিক্ষিতা হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন কোন্ স্থানে চাউলের কি দর, বস্ত্রের কি দর,—কখন্ চাউল কিনিলে সুবিধা—এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা, তিনি একজন ব্যবসায়ীকে দিতে পারি-তেন। দৈববিপাকে উপার্জ্জনকারীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সংসার একে-বারে নিরাশ্রয় হইত না। তিনি সাময়িক শিল্পকার্য্য সকলই জানিতেন, —চিকিৎসা-বিদ্যায় টোট্‌কা-টাট্‌কি ঔষধ ব্যবহারে তিনি সুনিপুণ বৈদ্যের সমকক্ষ। তিনি উপার্জ্জন করিতে জানিতেন, জমা-খরচ জানিতেন, বৃহৎ আয়ে সংসার চালাইয়াও ব্যয়-সঙ্কুলান পূর্ব্বক স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতি

মানভঞ্জন



"দেহি পদপল্লবমুদারম্"



দৃষ্টি রাখিয়া সুশৃঙ্খলে সংসার রক্ষা করিতে পারিতেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় অবশ্য রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি শিখায় না। কিন্তু যে বিবির অনুকরণ ঘৃণ্য বলিয়া সমাজ, শিক্ষিত বালিকাকে তিরস্কার করে, সে বিবির কার্য্য কেবল বেশভূষা নয়। যে বেশভূষা সমাজ দেখিতে পায়, তাহা বিবির নিজের নিমিত্ত নহে, স্বামীর প্রীত্যর্থে। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সুসজ্জিতা ও হাস্যমুখী দেখিবেন, এই নিমিত্ত সুসজ্জিতা হইয়া হাস্যমুখে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। এ কি রন্ধনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া? তাহা নয়। আয় বেশী নয়,—বাবুর্চ্চি নাই, তাঁহারই যত্নে স্বামীর নিমিত্ত সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। রীত্যনুসারে স্বামীর সহিত একত্রে ভোজন করেন বটে,—কিন্তু সে সময় দৃষ্টি ভোজনের উপর নয়, একত্রে বসিয়া তিনিই পরিবেশন করিতেছেন, কোন্ বস্তুর অভাব হইতেছে, কাঁটা-চাম্‌চে দ্বারা স্বামীর পাতে দিতেছেন,— ছেঁড়া ষ্টকিং তাঁহার শিল্প-কৌশলে নূতন হইয়াছে, সার্ট কাটিয়া রাখিয়াছেন, আগামী কল্য দর্জ্জির বাড়ীর অপেক্ষা সুন্দর সার্ট প্রস্তুত হইবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র বাগানে যে সকল সুন্দর ফুল ফুটিয়াছে, সাহেব দেখিবেন, তাহা কুসুমতত্ত্ববিৎ পত্নীর যত্নে। এই নিমিত্তই সাহেব বিবিকে এত সম্মান করেন; নচেৎ সাহেব একটা বাঁদর নয়,—একটা অনাচারিণী নারীর অত আদর করে না।

উপরি-উক্ত আদর্শে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য-শিক্ষা নীতি-বিরুদ্ধ শিক্ষা নয়,—কিন্তু হিন্দু-হৃদয় নীতিগঠিত নয়—ধর্ম্ম-গঠিত;—ধর্ম্মের অন্তর্গত নীতি। ধর্ম্মের ভিত্তি হৃদয়ে না থাকিলে, কেবল নীতি-শিক্ষা ফলপ্রদ

হয় না। কতক আচার-ভ্রষ্টও হয়, অনুকরণ আসিয়া পড়ে। বাহ্যিক দৃশ্যে হিন্দুর চক্ষে বিবির আচার সঙ্গত নয়; সুতরাং ইংরাজী শিক্ষায় বাঙ্গালী মহিলার ইংরাজী অনুকরণে আচার কতকটা অমঙ্গল হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে ঘৃণার কারণ নাই। যাহা অসঙ্গত, তাহা বালিকার পিতা-মাতা, যুবতীর স্বামী, সদুপদেশ ভিন্ন দেশের আচার-ব্যবহারের পার্থক্য বুঝাইয়া, আচার-ব্যবহারের উপযোগিতা বুঝাইয়া, বিজাতীয় আচারের অনুপযোগিতার দোষ বুঝাইয়া, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সুশিক্ষিতা কুললক্ষ্মী গৃহে স্থাপিত করিতে পারেন। আবার দেখিতে পান যে, শিক্ষিতা গিন্নীর অভাবে গৃহে বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে, সেই গিন্নী ফিরিয়া আসিয়াছেন,—আবার সংসার সেইরূপ সুশৃঙ্খলার আবদ্ধ। সমাজ বুঝিতে পারিবে, স্ত্রী-শিক্ষা দোষের নয়, শিক্ষার অভাবই দোষ।

বলা হইল যে, ধর্ম্মশিক্ষা বঙ্গমহিলার প্রধান শিক্ষা হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় অনুকরণাদি দোষেরও আশঙ্কা আছে। তবে সে শিক্ষা দিই কেন? বৈষয়িক শিক্ষা ও নীতি-শিক্ষার প্রয়োজন, এ কথা সকলেই বলিবেন। গৃহে ধর্ম্ম-শিক্ষা পাইলে, বৈষয়িক ও নীতি-শিক্ষায় অমৃতফল ফলিবে, বিদ্যালয়ে কন্যা সেই সকল শিক্ষা পাইতেছে, নচেৎ মহাশয়কে সেই সকল শিক্ষা দিতে হইত। পাশ্চাত্য-শিক্ষক আপনার গুরুভারের অনেক লাঘব করিয়াছে। সুযোগ্যা নীতিশালিনী বৈষয়িক গৃহিণী পাশ্চাত্যশিক্ষার ফল। গৃহধর্ম্ম-শিক্ষায় সেই ফল ঐহিক ও পারমার্থিক অমৃতদানে সক্ষম হইবে।

সমাজ, নব্য বঙ্গ-মহিলার নবপরিচ্ছদ দেখিতে পারে না। সেমিজ,

বডি প্রভৃতি সমাজে ঘৃণিত। কিন্তু কেন? তাহা বুঝা ভার! রমণী-মাত্রেই বেশভূষাপ্রিয়। যে সময়ে যেরূপ বেশভূসা প্রচলিত, তাহা পরিধানে দোষ কি? প্রপিতামহীর পরিচ্ছদে এখনকার মাতা আচ্ছাদিত নহেন; সুসজ্জিতা করিয়া কন্যাকে মাতা, জামাতার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দোষ ভাবেন না। তবে পুত্রবধূ সুসজ্জিতা হইয়া পুত্রের নিকট গেলে এতটা উদ্বিগের কারণ কি? বহু পৃষ্ঠা-ব্যাপিনী বিস্তৃত আলোচনা ব্যতীত আমরা স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক যাহা যাহা স্পর্শ করিয়াছি, তাহা সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। স্থানাভাবে আমাদের মন্তব্য সংক্ষেপে সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। শিক্ষিতা অশিক্ষিতা উভয় রমণী সুবেশা হইতে যত্ন করে, তাহা দোষের নয়, গুণের। সুবেশা রমণীর যতই দোষ দেখুন, গৃহকার্য্যে যতই আলস্য দেখুন,—সংসারে একটি পরম উপকার করিয়াছেন বুঝিতে পারিবেন। সুবেশা পুত্রবধূ--যাহার আচরণে গৃহস্বামী ক্ষুব্ধ, গৃহিণী ক্ষুব্ধা;—স্থিরচিত্তে চিন্তার দ্বারা উভয়েই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই পুত্রবধূ তাঁহার পুত্রকে দারুণ ব্যভিচারদোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে। যে গৃহস্বামী, দেবকন্যার ন্যায় পুত্রবধূ ঘরে আনিয়া, নিত্যই চক্ষের উপর দেখিতেছেন যে, পুত্র স্বীয় সুন্দরী পত্নীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রেতিনীর আবাসে যায়, অতি কুৎসিতা, কুচরিত্রার দাস, তিনি যদি তাঁহার পুত্রের সংশোধন চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পুত্রবধূটিকে সুবেশা ও শিক্ষিতা করিতে হইবে। যে প্রেতিনীর প্রেমে তাঁহার পুত্র মাসে মাসে সহস্র মুদ্রা অপব্যয় করিতেছে, সেই প্রেতিনীর ন্যায় কুরূপা গৃহস্থের গৃহে নাই। দু' একটা রসের কথা শিখিয়া বেশ-ভূষার পারিপাট্যে, সেই কুৎসিতা কুরূপা



সেই পুত্রকে পায়ে পায়ে ঘুরাইতেছে। আরও দেখিতে পাইবেন যে, পুত্র ও পুত্রবধূর নব্য আচারে গৃহিণী বিরক্ত হইয়া বার বার তাহার নিকট মনোবেদনা জানাইয়াছেন, যে পুত্রবধুর কথা তিনি প্রতিবেশীর নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, মেয়েটি ঘরে আনিয়া নিয়ত জ্বালাতন হইতেছেন, বউ নয় তো বিবি! কেবল আয়না,—বুরুস ও নভেল লইয়াই আছেন, তিনি দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার পুত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূটি বৈধব্য অবস্থায় অসতী হইবার আশঙ্কা দূরে থাকুক, দিন দিন মলিনা হইয়া পতির সহগমনে অগ্রসর হইতেছে। বিরহজনিত দারুণ পীড়ায় যদি মৃত্যুমুখে অব্যাহতি পায়, দেখিবেন, তখন আর তাহার সে বেশভূষার পারিপাট্য নাই। সুবেশা বিবি এখন ব্রহ্মচারিণী, এরূপ ব্রহ্মচারিণী তাঁহার গৃহে তিনি বহুদিন দেখেন নাই। চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বুঝিতে পারিবেন যে, পুত্রবধূটি পতিপ্রাণা। বিবিয়ানা সাজ বাহ্যিক আবরণ মাত্র ছিল। স্বামীর তৃপ্তির নিমিত্ত, স্বামীকে গৃহে রাখিবার নিমিত্ত, স্বামীর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া বিবিয়ানা ভান করিয়াছিল।

বধূ যদি এরূপ সচ্চরিত্রা, এরূপ পতিপ্রাণা, তবে পুত্রের জীবিত অবস্থায় সংসারকার্য্যে কি নিমিত্ত বিরক্তি প্রকাশ করিত? কেন, বুঝিলেই বুঝিতে পারেন যে, তাহার গৃহিণী পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া আপনার মেয়ের মত যত্ন করিতে পারে নাই। সে নিমিত্তই সে শ্বাশুড়ীকে যত্ন করে নাই। দেখিয়াছে, গৃহিণীর স্বীয় কন্যা সুসজ্জিতা হইয়া বেড়ায়। জামাই আসিলে অতি আগ্রহের সহিত গৃহিণী, কন্যা জামাতা যাহাতে অনেক সময় একত্রে সহবাস করে, তাহার নিমিত্ত উদ্যোগী,

কিন্তু সে সুবেশা হইয়া স্বামীকে গৃহে আবদ্ধ রাখিলে গৃহিণী দারুণ বিরক্তা। কন্যার সহিত ব্যবহারে এই প্রভেদ দেখিয়া পুত্রবধূটিও শ্বাশুড়ীকে যত্ন করিতে শেখে নাই। তিনি (গৃহস্বামী) বুঝিবেন যে, তাঁহার গৃহিণী আমাদের বর্ণিত গিন্নীর মত গিন্নী নয়। হিন্দুগৃহিণীর কর্ত্তব্যকার্য্যে তাঁহার গৃহিণীর অনেক ত্রুটী ছিল। পুত্রবধূটিরও এই নিমিত্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটি ঘটিত।

এদিকে আবার পুত্রকেও পর করিয়াছিলেন। সুন্দরী পত্নীকে পুত্রটি ভালবাসিত, কিন্তু নিত্য দেখিত, মা বা ভগিনী কেহই তাহাকে যত্ন করে না, গোবর নেদী দিয়া, ধোঁয়ার গন্ধ গায়ে মাখিয়া, বেশ-বিন্যাস না করিয়া, মলিন বসনে যাহাতে তাহার শয্যাপার্শ্বে আসে,—তাহার মাতা ও ভগিনীর তাহাই চেষ্টা ছিল। একখানি পুস্তক না পড়ে, একটু আমোদ-আহ্লাদ না করে, ভগিনী ও মাতার ইহাই ইচ্ছা। ত্রুটি হইলে উপদেশ নাই, কেবলই তিরস্কার। নিত্য সজল-নয়নে গভীর রাত্রে তাহার নিকট আইসে। এ সকল পুত্রের সহ্য হয় নাই। সেমিজ, বডি কিনিয়া দিয়াছে, আতর-এসেন্স কিনিয়া দিয়াছে, নভেল কিনিয়া দিয়াছে, আমোদ-উপযোগী ক্রীড়ার বস্তু কিনিয়া দিয়াছে, সুসজ্জিতা হইতে উপদেশ দিয়াছে,—মাতৃবাক্য এবং ভগিনীবাক্য তাচ্ছিল্য করিতে উপদেশ দিয়াছে। সুসজ্জিতা হইয়া তাহার নিকট নভেল পড়িতে বলে, উত্তম তাস লইয়া তাহার সহিত বিন্তি খেলে—লাজ লজ্জায় পড়িয়া কখনও গৃহকার্য্যে গেলে বিরক্তি প্রকাশ করে। এ অবস্থায় দোষ ঘটিলে চমৎকৃত হন কেন? এ সকল দোষ শিক্ষার নহে, শিক্ষার অভাবের দোষ।



স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর গৃহে স্ত্রী-পুরুষের স্বর্গীয়, সরস প্রেমালাপ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "বিষবৃক্ষে" শ্রীশচন্দ্র স্ত্রৈণ অপবাদ অখ্যাতি বিবেচনা না করিয়া সুখ্যাতিভাবে গ্রহণ করিয়া নিন্দুকের নিমিত্ত ভোজ আয়োজনের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কমলমণি রসিকা কম নন, সুবেশাও বটেন; কিন্তু দাম্পত্য প্রেমচিত্র দর্শনে এখন গৃহশূন্য পিতামহও মুগ্ধ হইবেন। সর্ব্বগুণযুক্তা বুড়ী কিরূপ রসিকা ছিলেন, তাঁহার মনে পড়িবে। পিতামহ লম্পট নন—এখন সমাজ স্ত্রৈণ বলিলেও বলিতে পারেন।

স্ত্রী-শিক্ষা যে আজকাল প্রচলিত, তাহা নহে, বহুদিন ভারতবর্ষে আছে। কবিতা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিবে। বৌদ্ধ-ইতিহাসে শিক্ষিতা স্ত্রীর কথা পত্রে পত্রে। ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্বতন পুরুষেরা আমাদের অপেক্ষা মহাহিন্দু ছিলেন, কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষায় ঘৃণা করিতেন না,—শিক্ষার অভাবই ঘৃণ্য। অশিক্ষিতা মাতা, শিশু-সন্তানকে শিক্ষিত করিতে পারে না, এই বঙ্গদেশের প্রধান বিড়ম্বনা।

পরিচ্ছদের প্রতি বিরক্তির কথা বলিতে বলিতে আমাদের একটি গল্প মনে পড়িল। কোন একটি কলিকাতাস্থ যুবক, পূর্ব্ব-অঞ্চলে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরিবার পরমা সুন্দরী, যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। যুবা যুবতীকে দেখিতে শ্বশুরালয়ে গেল। সাধ করিয়া উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কার, এসেন্স, চুলের কাঁটা যাহা কলিকাতায় চলন, সঙ্গে লইল। শ্বশুরগৃহে রজনীতে যখন লাবণ্যবতী পত্নী তাঁহার শয্যাগৃহে আসিল, তখন যুবা পূর্ব্ববঙ্গ-প্রচলিত উঁচু খোঁপা খুলিয়া, কেশ হইতে দড়ি-দড়া বাহির করিয়া,

ফিতা দিয়া স্বহস্তে কেশবিন্যাস করিয়া, সোনার কাঁটা কেশে দিয়া দিলেন ; হস্তের শঙ্খবলয় খুলিয়া সুন্দর বলয় পরাইয়া দিলেন ; স্বহস্তে সুন্দর আভরণে ভূষিতা করিলেন ; মোটা সাড়ী বদলাইয়া নূতন সৌখীন পরিচ্ছদে ভূষিতা করিলেন। একে সুন্দরী, সুন্দর বসন-ভূষণে সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। পতির এই সকল কার্য্যে সুন্দরী মৌনা। প্রাতঃকালে যুবতীর মাতা অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করিয়া কন্যার শয়নগৃহের দ্বারে উপস্থিতা। কলিকাতার জামাই, না জানি কন্যার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে। কন্যা শয়নগৃহের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। কন্যার বেশভূষার পরিবর্ত্তন দেখিয়া মাতা চমৎকৃতা ও বজ্রাহতা ; মাতা কন্যার গলাজড়াজড়ি করিয়া রোদন করিতে করিতে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ওরে লটি সাজাইয়া দিছে রে, লটি সাজাইয়া দিছে!"

উপসংহারে আবেদন, স্বামীর সহিত আলাপে স্ত্রীর, স্পষ্টাক্ষরে বলিলে দোষ হয়, বেশ্যার ন্যায় আচরণ কর্ত্তব্য। ইহাই হিন্দুশাস্ত্র ; যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী শিক্ষিতা স্ত্রীকে ঘৃণা করেন। এই শাস্ত্র-অবহেলাই বঙ্গ-যুবকবৃন্দের ব্যভিচারের কারণ। এই শাস্ত্র অবহেলনে শত শত বঙ্গযুবক, কুরূপা বেশ্যার লাঞ্ছনায় প্রেমজ্ঞানে আবদ্ধ।

প্রতীক্ষা



কার আশা-পথ চাহি—



লেখক—শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ।

শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা।

এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা কি প্রণালীতে পরিচালিত হইলে সমাজের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, আপনি তৎসম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রশ্নটির গুরুত্ব বিবেচনা করিলে ইহার উত্তর দিবার ভার কোন যোগ্যতর ব্যক্তির উপর অর্পিত হইলেই ভাল হইত। আমি দীর্ঘকাল শিক্ষা-বিভাগের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু ইদানীং স্ত্রী-শিক্ষাসম্বন্ধে যে যে উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহার কোনটির সম্বন্ধেই আমার তত অভিজ্ঞতা নাই। বিশেষতঃ গত ১৬।১৭ বৎসর আমি পরিদর্শন-কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শুধু বালকদিগের শিক্ষাদান-কার্য্যে নিরত রহিয়াছি; দেশে রাজকীয় সাহায্যে কিংবা জনসাধারণ-চেষ্টায় স্ত্রী-শিক্ষাসম্বন্ধে যে সকল অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার কোনটিরই ফলাফল সম্যক্‌প্রকারে বুঝিবার সুবিধা পাই নাই।



স্ত্রী-শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই—শিক্ষা কাহাকে বলে, তাহা জানিতে হইবে। সচরাচর লিখন-পঠনাদিই শিক্ষাপদবাচ্য ; যে মহিলা প্রাইমারী কিংবা তদূর্দ্ধ কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যিনি নাটক, উপন্যাসাদি পড়িতে পারেন, উলের কাজ জানেন, তিনিই শিক্ষিতা বলিয়া পরিগণিতা। তাঁহার যদি ইংরাজী জানা থাকে, কিংবা বাঙ্গালায় কবিতা রচনার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে ত সোনায় সোহাগা। শিক্ষাশব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত রমণীই এতকাল অশিক্ষিতা ছিলেন এবং অতি অল্পদিন হইল, হিন্দুসমাজ তাঁহাদের শিক্ষাবিধানে ব্রতী হইয়াছেন।

পূর্ব্বে দেখা যাইত, পল্লীবাসিনী নিরক্ষরা গৃহস্থরমণীরা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণ সম্মার্জ্জন করিতেন, প্রত্যেক গৃহে গোময়-মিশ্রিত মৃত্তিকার প্রলেপ দিতেন, শিশুদিগের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিতেন। মাধ্যাহ্নিক রন্ধনের আয়োজন করিয়া স্নানে যাইতেন, জলাশয় হইতে পানের ও রন্ধনের জল বহন করিয়া আনিতেন, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিজনকে ও অতিথি-অভ্যাগতদিগকে আহার করাইতেন, উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি স্বহস্তে মার্জ্জন করিতেন, বৈকালে বিশ্রামচ্ছলে কাঁথা সেলাই করিতেন বা রামায়ণ-মহাভারত-পাঠ শুনিতেন। প্রদোষে দীপ রচনা করিতেন এবং রাত্রিকালে পুনর্ব্বার রন্ধনাদি সমাপনপূর্ব্বক পাঁচ ছয় ঘণ্টার জন্য নিদ্রা যাইতেন। তাঁহারা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া শিরঃপীড়া অনুভব করিতেন না ; অল্পদোষে অকাল-বার্দ্ধক্যেও আক্রান্তা হইতেন না। তাঁহাদের মুখমণ্ডলে নিয়ত স্বাস্থ্য ও শান্তির দিব্যচ্ছটা



বিরাজ করিত। তাঁহারা লিখিতে পড়িতে জানিতেন না বটে, কিন্তু দেশের পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতির সহিত সুপরিচিতা হইতেন, মুখে মুখে সীতা, সাবিত্রী, চিন্তা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি বীরাঙ্গনার অপূর্ব্ব চরিত্র বর্ণন করিতে পারিতেন। তাঁহারা উলের কাজ জানিতেন না বটে, কিন্তু গৃহস্থের কল্যাণকর সূচিকার্য্যে নিপুণা ছিলেন, চিত্রশিল্পেও পারদর্শিনী ছিলেন। এবংবিধ অন্নপূর্ণা, কমলা গৃহলক্ষ্মীদিগকে কি আমরা অশিক্ষিতা বলিব? বেশীদিনের কথা নয়, বঙ্গদেশে সচরাচর এই শ্রেণীর রমণীই দেখা যাইত। যাঁহারা সামান্য পড়িতে জানিতেন, তাঁহারাও অবসরকালে রামায়ণাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠেই নিয়োজিত হইতেন। তখন সৌভাগ্যক্রমে—উপন্যাসাদির এত প্রয়োজন হয় নাই, কাজেই পাঠাভিলাষিণীদিগের পক্ষে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। অনেকে এ সমস্ত এত আগ্রহের সহিত আয়ত্ত করিতেন যে, তাঁহারা কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থও আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন এবং পরিণতবয়সে সংসারের সুখ-দুঃখের মধ্যে এই সমস্ত হইতে অবলীলাক্রমে কবিতা আবৃত্তি করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। "শিক্ষা" শব্দের এখন যে ব্যাখ্যা করা যায়, তদনুসারে ইহাঁদিগকেও কি অশিক্ষিতা বলিতে হইবে না? ইহাঁরা পদার্থ কয় প্রকার, তাহা জানিতেন না; বিড়ালের পায়ে কয়টা নখ, তাহাও বলিতে পারিতেন না, ইহাঁরা কুন্দ-নন্দিনীর পরিচয় পান নাই, কথায় কথায় অহিফেন-সেবনে আত্মহত্যা করিবার উপযোগিতাও উপলব্ধি করেন নাই!



উপরে যে চিত্র দেখাইলাম, অমার্জ্জিত হইলেও আমার বিবেচনায় তাহা প্রকৃত শিক্ষার আদর্শস্থল। শিক্ষার যাহা উদ্দেশ্য—চিত্তের স্থৈর্য্য ও চরিত্রের মাধুর্য্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মে মতি, অপরকে সুখী করা ও নিজে সুখী থাকা, এ সমস্তই ঐ চিত্রে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এখন আর সচরাচর এরূপ আদর্শ দেখা যায় না। এখন যাঁহার একটু অবস্থা ভাল এবং যিনি ভদ্রনামে পরিচিত হইতে ব্যগ্র, তাঁহারই গৃহে পাচক-পাচিকার ও দাস-দাসীর ব্যবস্থা। কাজেই রমণীরা আলস্যপরায়ণা ও রুগ্না; তাঁহারা—অসার গ্রন্থ পাঠে কিংবা বৃথা আমোদপ্রমোদে ও পরচর্চ্চায় সময়ক্ষেপণ করেন, গৃহকার্য্যসম্বন্ধে ভৃত্যদিগের উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। বলা বাহুল্য, বঙ্গরমণীগণের এ দুর্দ্দশা পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরেই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। কাজেই বালিকারা, বিশেষতঃ নগরবাসিনী বালিকারা, শিক্ষার যাহা প্রধান অঙ্গ—গৃহে মা, খুড়ী, মাসী, পিসীর সঙ্গে থাকিয়া ধর্ম্মোপদেশ লাভ করা, গৃহকার্য্যে নিপুণা হওয়া—তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। তাহারা এখন শিবপূজা শিখে বিদ্যালয়ে গিয়া; সেলাই শিখে দরজীর কাছে।

আমার মনে হয়, যত দিন আমরা বালিকাদিগের জন্য গৃহে সুশিক্ষা-লাভের ব্যবস্থা না করিতে পারিব, তত দিন তাহাদিগকে কোন বিদ্যালয়ে গুরু-মার হস্তে সমর্পণ করিয়া কোন সুফল পাইব না, বরং কুফলই পাইব। তবে বিদ্যালয়ের যে উপযোগিতা নাই, তাহা বলিতেছি না; সেখানে দশজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হয়, কাজেই সামাজিকতা জন্মে, পরস্পর প্রতিযোগিতাও হইয়া থাকে; কিন্তু এই গুণদ্বয় বালকদিগের



পক্ষেই অধিক প্রয়োজনীয়। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বালিকারা যদি প্রতিদিন পাঁচ ছয় ঘণ্টা বিদ্যালয়ে অবরুদ্ধ থাকে এবং আর ৩।৪ ঘণ্টা গৃহে থাকিয়া সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি আবশ্যক ও অনাবশ্যক বিষয়ের পাঠ অভ্যাস করে, তাহা হইলে তাহাদের ক্ষীণদেহ ক্ষীণতর হইবে, স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইবে। এই ত কর্ম্মের সন্ধ্যা; কিন্তু ইহারই মধ্যে মেয়েমহলে চশমার ব্যবহারটা কত চলিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

আমি বালিকাদিগকে নিরক্ষর রাখিতে বলিতেছি না। তাহাদিগকে একটু সাহিত্য পড়াইতে হইবে, যাহার সাহায্যে তাহারা রামায়ণাদি গ্রন্থ বুঝিতে পারে; তাহাদিগকে একটু অঙ্ক শিখাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা ধোপার ও গোয়ালার হিসাব রাখিতে পারে, এবং বাজার-খরচ লইয়া ভৃত্যদিগের নিকট প্রতারিত না হয়। তাহাদিগকে একটু ভূগোল শিখাইতে হইবে, যাহার সাহায্যে তাহারা তীর্থক্ষেত্র নির্ণয়, কোথায় কোন্‌টি ইত্যাদি বুঝিতে পারে; তাহাদিগকে একটু স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখাইতে হইবে, যাহার সাহায্যে তাহারা তনয়া, সোদরা, পত্নী বা জননীভাবে উত্তরকালে রোগীর শুশ্রূষা ও শিশুপালনে নিপুণা হইবে। তাহাদিগকে একটু ইংরাজী শিখাইতে হইবে, যাহার সাহায্যে তাহারা নোটের নম্বর ও মূল্য, চিঠির ঠিকানা ইত্যাদি লিখিতে পারিবে। তাহাদিগকে একটু চিত্রাঙ্কন অর্থাৎ Drawing শিক্ষা দিলেও ভাল হয়। তাহাদিগের হস্তলিপি সুন্দর করিতে হইবে। এই গেল বিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতদতিরিক্ত বিষয় অর্থাৎ কল্পনা ও শূচিকার্য্য, ধর্ম্মকথা ও গুরুজনসেবা এ সমস্তের জন্য গৃহেই ব্যবস্থা করিতে

হইবে, বিদ্যালয়ে বৃত্তিভুক কর্ম্মচারীদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।

আমি যাহা বলিব. প্রথম শিক্ষাসম্বন্ধে। ঔষধ শিক্ষা অর্থাৎ যাহার বলে রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া বিদুষী বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্যাতীত। হিন্দুর মেয়ে ১০।১১ বৎসরেই বিবাহিতা হয় এবং তখনই সে সামাজিক রীতির অনুরোধে গুরু-মার সংস্রব ত্যাগ করে, কাজেই বেল পাকিলে যেমন কাকের লাভ নাই, দেশে শত শত উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও তেমনি হিন্দুর মেয়ের কোন লাভ নাই। তবে যখন বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইবে, এবং হিন্দুর সমাজ নূতন আকার ধারণ করিবে, তখনকার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু সে দিন এখন সুদূর-ভবিষ্যৎ।

হিন্দুর বালিকাদিগের সাধারণ শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থার কথা বলা হইল, তাহা স্বল্পব্যয়সাধ্য। আমি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য পুরুষ-শিক্ষকের পক্ষপাতী নহি; কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় পুরুষ-শিক্ষক অপরিহার্য্য। একটি বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক থাকিলেই চলিবে। তিনি পনর ষোলটি বালিকার শিক্ষাদান করিবেন। এ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ইহা অপেক্ষা অধিক ছাত্রী রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। বিদ্যালয়ের কার্য্য দুই বেলা অর্থাৎ সকাল বৈকাল। সম্ভবপর না হইলে শুদ্ধ অপরাহ্নে একটা হইতে চারিটা কিংবা পাঁচটা পর্য্যন্ত হইলে যথেষ্ট। দশটা চারিটা অতি ভয়ঙ্কর সময়। গো-গ্রাসে গিলিয়া রুদ্ধশ্বাসে স্কুল আফিসে ছুটিতে ছুটিতে বাঙ্গালী জাতি মরিতে বসিয়াছে। যাঁহারা এই জাতির শক্তিস্থানীয়া, তাঁহাদিগকে



ার এ যন্ত্রণা দেওয়া কেন? আর এক যন্ত্রণা পরীক্ষা। বালিকাদিগকে যেন পরীক্ষা-যন্ত্রে নিষ্পেষিত করা না হয়।

চেষ্টা করিলে এবং মাস মাস যথারীতি বেতন পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে অনেক ভদ্রমহিলা ও বিশেষতঃ বিধবা এই বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে পারেন, কারণ, ইহাতে যত্নের ও আগ্রহের যত উপযোগিতা, পাণ্ডিত্যের তত নহে। যদি এ অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ বালিকা বিদ্যালয়ে পুরুষ-শিক্ষকের নিয়োগ হয় ত সম্পূর্ণরূপেই অনাবশ্যক হইবে।

অভিমান



"রাগে গালে লাল ফোটে"

বসুমতী প্রেস।

উপহারে



'বধু হে, প্রিয় হে, লও ধর উপহার।'



লেখক—শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

মা

মাতৃত্বে স্ত্রী-জন্মের সার্থকতা। যিনি স্ত্রী হইয়া মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন না; গীতার কথায় 'মোঘং পার্থ সা জীবতি' অর্থাৎ তাঁহার জীবনধারণই বৃথা, তিনি ভগবদ্দ্রোহিণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সৃষ্টি ভগবৎলীলা বা কোন মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই কল্পিত হউক—সৃষ্টি-রক্ষাই সর্ব্বত্র সভ্য-সমাজের চরম ও পরম লক্ষ্য। মাতাই সৃষ্টির প্রধানা কর্ত্রী। তিনি সন্তানকে জন্ম দিবেন, পালন করিবেন, রক্ষা করিবেন এবং সর্ব্বতোপরি সেই সন্তান যাহাতে সৃষ্টি রক্ষা করিতে পারে, তাহার উপায়-বিধান করিবেন। আমাদের জননীগণ গর্ভধারণ করেন—সন্তান প্রসব করেন, কিন্তু সেই সন্তানগণ যাহাতে সংসারের কল্যাণ-ব্রতে ব্রতী হয়, সেই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যে একান্ত উদাসীন। শাস্ত্রকারগণ সুসন্তান প্রসবের জন্য কত না ব্যবস্থাই করিয়াছেন; কিন্তু এই ভোগৈকলক্ষ্য বর্ত্তমান যুগে



আমরা সেই সমস্ত নিয়মের কোনই সার্থকতা আছে, এরূপ মনে করি না। সাধারণের সংস্কার যে, কূটনীতিবিশারদ চাণক্য কোনও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন না; কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন—যেমন কামচক্ষু চক্ষুর পীড়া উৎপাদন করে মাত্র, সেইরূপ কুসন্তান ধরণীর ভারবৃদ্ধি ব্যতিরেকে আর কিছুই করে না। আমাদের শক্তিরূপিণী কাত্যায়নী কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় বীর্য্যবান্ এবং গণেশের ন্যায় বিদ্যাবান্ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান প্রসূতিগণ পুত্রের বীর্য্য বা বিদ্যাবত্তার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া, কোনরূপে তাঁহাদিগকে স্বল্পায়াসসাধ্য জীবিকার্জ্জনে সমর্থ দেখিলেই কৃতকৃতার্থা হন। ভারতের ললনাগণ কখনই এরূপ আদর্শ লইয়া সন্তান প্রসব করেন নাই। আজ যে আমরা পতঙ্গজীবন যাপন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছি, আজ যে আমরা আরামশয্যায় সুখ-শয়নে, বিঘ্ন আশঙ্কা করিলেই প্রমাদ গণনা করি, আজ যে আমরা আহারে বিহারে, কার্য্যে চিন্তায় পররুচিচিকীর্ষু, সে কেবল আমাদের মাতৃত্বের আদর্শ-ভ্রংশের অবশ্যম্ভাবী কুফল। যদি আবার হিন্দুরমণীগণ গণেশজননীর ন্যায় অগণন কার্ত্তিকেয়-গণেশ প্রসব করিয়া ধরা-অঙ্গ সুশোভিত করিতে কৃতসংকল্প না হয়েন, তাহা হইলে আমাদিগের মানুষ হইবার চেষ্টা সর্ব্বদা বিফল হইয়া যাইবে।

অষ্টম লহরী

তুলন



লেখক—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

রমা ও মা ।

মানুষমাত্রেরই, কেবল মানুষ বলিয়া, কতকগুলি সামান্য ধর্ম্ম আছে। দেশ-ভেদে, কাল-ভেদে, সভ্য-অসভ্য-ভেদে, স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে কিংবা শিশু-বৃদ্ধ-ভেদে এই সামান্য ধর্ম্মের বিশেষ কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। য়ুরোপের লোকেরাও মানুষ, ভারতের লোকেরাও মানুষ; য়ুরোপের পুরুষেরাও পুরুষ, ভারতের পুরুষেরাও পুরুষ; য়ুরোপের স্ত্রীলোকেরাও আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগেরই মতন স্ত্রীলোক; সাধারণ মানুষ-ধর্ম্মে বা পুরুষ-ধর্ম্মে বা স্ত্রী-ধর্ম্মে ইহাদের মধ্যে একটা অতি বৃহৎ সমতা আছেই আছে। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য স্ত্রী-চরিত্রের ও নারীজীবনের আদর্শের তুলনায় বিচার আলোচনা করিবার সময়ে সর্ব্বদা এই মূল কথাটা মনে রাখিতে হইবে।



মানুষ বলিয়াই যে আমাদের একটা সামান্য ও সার্ব্বজনীন মানুষ-ধর্ম্ম আছে, তাহা আমাদের শরীর-মনের মূল গঠনের ভিতর দিয়াই, মোটের উপরে ফুটিয়া উঠে। হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, এ-সকল সমকল মানুষেরই আছে। এই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়াদির প্রকৃতি এবং কার্য্যও সকলেরই সমান। হাত দিয়া সকলেই ধরে; পা দিয়া সকলেই চলে, চোখ দিয়া সকলেই দেখে, কান দিয়া সকলেই শোনে। চক্ষুর সঙ্গে রূপের, কানের সঙ্গে শব্দের, ত্বকের সঙ্গে স্পর্শের, রসনার সঙ্গে রসের সম্বন্ধ সকলেরই সমান। তবে বিকাশের তারতম্য বা অনুশীলনের কিংবা শিক্ষার বেশ-কম-নিবন্ধন দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-কার্য্যের সূক্ষ্মতার বা স্থূলতার, সতেজতার বা জড়তার তারতম্য হইয়া থাকে। এই সকল ইন্দ্রিয়, সকলের মধ্যেই, তাহাদের নিজ নিজ যে প্রাণবস্তু, তাহারই সেবায় নিযুক্ত হইয়া তাহাদের জীবনের সার্থকতা-সম্পাদনের সাহায্য করিতেছে। জীবন-ধারণ এবং বংশরক্ষণ, এই দুইটি জীবের মনুষ্যত্ব-ধর্ম্ম, এই সাধারণ ও মুখ্যতম জীব-ধর্ম্ম সকল মানুষেরই সমান। এ সকল বিষয়ে পূর্ব্বে পশ্চিমে কিংবা প্রাচীনে নবীনে কোনও বৈষম্য নাই।

বাঁচিয়া থাকিতে সকল মানুষেই চায়, সকলেই সুখে ও আরামে বাঁচিয়া থাকিতে চায়; আর সকলেই নিজ নিজ বংশ-রক্ষা করিতে চায়। জীবন-ধারণ, সুখান্বেষণ এবং বংশক্রম-রক্ষা, এ তিনটি জীব-মাত্রেরই জীবনের প্রত্যক্ষ এবং সার্ব্বজনীন লক্ষ্য। এই জন্যই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হইয়াছে। ব্রততী যেমন আপনার আভ্যন্তরীণ জীবনের প্রেরণাতেই শূন্য আকাশে আশ্রয় খুঁজিতে যাইয়া ছোট ছোট আঙ্গুলের



মত আপনার কচি কচি ডগাগুলোকে বাহির করিয়া দেয়, সেইরূপই সচেতন জীব সকলও এই জীবনের প্রয়োজনেই আপনার ইন্দ্রিয়সকলকে ভিতর হইতে ফুটাইয়া তোলে। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি ইন্দ্রিয়ের মুখ্য লক্ষ্য—জীবের জীবন-রক্ষা, রূপ-রসাদির আস্বাদন নহে। ইতর জন্তুদিগের, বিশেষতঃ বন্যপশুদিগের মধ্যে এখনও এই সকল ইন্দ্রিয়ের এই মুখ্য অভিপ্রায়টি প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। চক্ষু দূর হইতেই অনাগত অথচ আসন্ন বিপদের দর্শন পায়, কান দূর হইতেই অদৃশ্য আশঙ্কার সন্ধান পায়, নাসিকা দূর হইতেই শত্রু-গাত্রের গন্ধ লাভ করে। আর এই ভাবেই এ সকল ইন্দ্রিয় এই শরীর-দুর্গের পথে দিবানিশি খাড়া পাহারা বসাইয়া আততায়ীর আগমন-সংবাদ দিয়া থাকে। এইটিই ইহাদের মুখ্য কর্ম্ম। কিন্তু যখন জীবের জীবন কতকটা নিরাপদ্ হইয়া উঠে, বন্যপশু যখন পালিত পশু হইয়া যায়, সমরশীল বর্ব্বর মানুষসমাজ যখন অপেক্ষাকৃত সভ্য হইয়া উঠে এবং প্রত্যেক মানুষকে আর সর্ব্বদা শত্রুভয়ে সচকিত থাকিতে হয় না, তখন এই সকল ইন্দ্রিয়ও আপনাদের মুখ্যকর্ম্ম হইতে অবসর পাইয়া শুদ্ধ রূপ-রসাদির অনুশীলনরূপ গৌণকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যায়। আদিতে যাহারা জীবনের রক্ষক ছিল, তাহারাই সেই রক্ষিকার্য্য হইতে অবসর পাইয়া, সৌখীন প্রভুর সখ-সাধনে নিযুক্ত হয়। চক্ষু-কর্ণাদি এখন বেশীভাগে আমাদের এই সখই সাধন করিতেছে। কিন্তু আদিতে ইহারা জীবন-দুর্গের প্রহরিরূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, ইহারা সেই মুখ্যকর্ম্মই সাধন করিয়া থাকে।

এই যে জীবন-ধারণ এবং বংশানুক্রম-রক্ষার প্রয়োজন, ইহাই জীবের

সর্ব্ববিধ বৈশিষ্ট্যের মুখ্য হেতু। জীব এই জগতে জন্মিয়াই কতকগুলি বাহিরের অবস্থার ও ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়া যায়। এই নিসর্গের আব-হাওয়া, তাহার চারিপাশের অপরাপর জীব, এ সকলের মধ্যেই জীবকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। আর বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই তাহাকে হয় এ সকল অবস্থাকে জয় কিংবা ইহাদের সঙ্গে নিজের একটা সমন্বয়-সাধন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। আপনার চারিদিকের প্রতিকূল অবস্থা ও ব্যবস্থাকে জীব যদি হয় পরাভব, না হয় অনুকূল করিয়া তুলিতে না পারে, তাহা হইলে তার বাঁচিয়া থাকা দায়; এমন কি, একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে, এইরূপে নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আপনাদিগকে মিলাইয়া মিশাইয়া চলিতে না পারিয়াই এই পৃথিবীতে অনেক প্রাচীন জীব-বংশ একেবারে বিলোপ পাইয়াছে। যারা নির্ব্বংশ হয় নাই, তাহা-দেরও, এই কারণেই পুরাতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ও আদিম প্রকৃতির অশেষ প্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এ সূত্রেই জীব-বিশেষের সাধারণ ধর্ম্মের মধ্যেই আবার ভিন্ন ভিন্ন জীবের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে। পণ্ডিতেরা কহেন যে, ব্যাঘ্র আর মার্জ্জার একই জাতীয় জীব। পশুরাজ সিংহও এই বংশেরই অবতংস। কিন্তু এই সাধারণ সমতার মধ্যেই আবার বাঘে বিড়ালে কতই পার্থক্য দেখি। এই প্রভেদ কেবল তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল। মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়া, তার ঘরে থাকিয়া, পাতের খাইয়া, বিড়াল সভ্য হইয়াছে। নিয়ত শত্রুপুরীমধ্যে থাকিতে হয় না বলিয়া তার শৌর্য্য-বীর্য্য সে হারাইয়াছে। আর বাঘ বনে থাকে, প্রতিদিনের খাদ্য তাহাকে শীকার করিয়া আনিতে হয়, অপরাপর বন্যজন্তুর

আক্রমণ হইতে সর্ব্বদাই আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে হয়, এই সকল কারণে তার শৌর্য্য-বীর্য্যাদি এখনও প্রবল রহিয়াছে। কিন্তু এই বৈষম্য সত্ত্বেও আমাদের ঘরের বিড়াল যে ঐ বনের বাঘেরই সগোত্র, ইহা তার দেহ-গঠন, শীকার করিবার ধরণ-ধারণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যনিবন্ধনই মূলে বাঘে বিড়ালে এই পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু এখন, বহুকাল ধরিয়া এই বিশিষ্ট ধর্ম্মগুলি পুরুষানুক্রমে অনুক্রমিত হইয়া, এই বৈশিষ্ট্যটাই ইহাদের মূল প্রকৃতির মতন হইয়াছে। বিড়ালের ছানাকে বনে ছাড়িয়া দিলে সে বন-বিড়াল পর্য্যন্ত হইতে পারে, বাঘ হইয়া উঠিতে পারিবে না। আর বাঘের ছানাকেও দুধ-ভাত খাওয়াইয়া ঘরে আনিয়া পালন করিলেই তার ব্যাঘ্রত্বের বিলোপ হইবে না।

একই জাতির জীবের মধ্যে আমরা আজিকালি যে সকল বৈষম্য প্রত্যক্ষ করি, তাহা মূলে ও আদিতে, কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার তারতম্য হইতে উৎপন্ন হইলেও, এখন অনেক স্থলেই এগুলি তাহাদের বৈজিক-ধর্ম্মভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিন বাঘে বিড়ালে সমানই ছিল, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, আজ যে বাঘে বিড়ালে বিশাল বৈষম্য দেখি, তাহাকে কেবল পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা ব্যবস্থারই ফল বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। এখন বিড়াল একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এখন বিড়ালী বিড়াল-ছানাই প্রসব করে, বিড়ালের পেটে বাঘের ছানা জন্মায় না। সেইরূপ আদিতে সকল মানুষই এক ছিল, আর সেই মৌলিক একত্ব হইতেই বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা

ও ব্যবস্থারই ফলে তাহাদের বর্ত্তমান ভেদাভেদ ফুটিয়া উঠিয়াছে; ইহা সত্য হইলেও, এই সকল বৈশিষ্ট্যই এখন ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যশ্রেণীর মৌলিক প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে জড়াইয়া গিয়া, তাহাদের স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে। যেমন বাঘ বিড়াল এক গোত্র হইয়াও একটি বনে থাকিয়া ব্যাঘ্রত্ব, আর অপরটি ঘরে থাকিয়া মার্জ্জারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ ইংরেজ ও ভারতবাসী মূলে একই সাধারণ মনুষ্য-প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়াও, একটি য়ুরোপের বিশিষ্ট নৈসর্গিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার এবং য়ুরোপীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়া ইংরেজের বিশেষত্ব আর অপরটি ভারতের বিশিষ্ট নৈসর্গিক ও সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার এবং ভারতীয় ইতিহাসের ধারার আশ্রয়ে বিকসিত হইয়া, ভারতবাসী লোকচরিত্রের বিশেষত্বটা পাইয়াছে। মূলে যাহাই থাকুক না কেন, এখন ইংরেজ ইংরেজ, য়ুরোপীয় য়ুরোপীয়, আর হিন্দু হিন্দু, ভারতবাসী ভারতবাসী হইয়াছে। এখন এ সকল বৈষম্য ও বিশেষত্বকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

এমন কি, এই সকল বৈশিষ্ট্য বৈষম্য যে কেবল সমষ্টিগত সামাজিক জীবনেই দেখিতে পাই, তাহা নহে; ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত জীবনেও এগুলিকে লক্ষ্য করিয়া থাকি। একই সমাজের একই পরিবারের, এই পিতামাতার সন্তানসন্ততিদিগের মধ্যেও এ সকল ব্যক্তিগত পার্থক্য রহিয়াছে। সকলের দেহগঠন এক হইলেও, আকৃতি ঠিক হয় না। আকৃতি মোটের উপরে এক হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রকৃতি বিভিন্ন হয়। তাহাদের দেহ-গঠন এক, বর্ণ এক, গোত্র এক,



ভাষা এক, ধর্ম্ম এক, কর্ম্ম এক, সভ্যতা ও সাধনা, শিক্ষা ও দীক্ষা—এ সকল পর্য্যন্ত এক ; তাহাদের এ সকল ঐক্য সত্ত্বেও ব্যক্তিগত চরিত্রের কতই না অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। রামের ও শ্যামের পায়ের উপাদান, গঠন, আকৃতি সমান ; অথচ রাম যখন হাঁটে, তখন তাহার যেরূপ পায়ের ধ্বনি হয়, শ্যামের সেরূপ হয় না ; যারা রাম ও শ্যামকে ভাল করিয়া চিনে, তারা দূর হইতে ঐ পায়ের শব্দ শুনিয়া রাম আসিতেছে কি শ্যাম আসিতেছে, ইহা বুঝিতে পারে। এইরূপ ইহাদের কণ্ঠনালীর বা রসনার বা তালুর বা দন্তের বা নাসিকার উপাদান এবং গঠনও মোটের উপরে একইরূপ, অথচ এই কণ্ঠনালী, রসনা, দন্ত, তালু ও নাসিকাদির সাহায্যে ইহারা যে সকল ধ্বনি করে এবং এই ধ্বনিগুলি মিলাইয়া যে সকল শব্দ উচ্চারণ বা সঙ্গীত গান করে, তার স্বর বা সুর ঠিক এক হয় না ; রামের গলা শুনিয়া শ্যামের গলা বলিয়া প্রায়ই কোন ভ্রম হয় না। কেবল শরীর-ধর্ম্মেই যে এ সকল বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহা নহে, মানব-ধর্ম্মেও এরূপ ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। রাম ও শ্যাম একই প্রকারের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা একই বিষয়ের যখন জ্ঞানলাভ করে, তখনও তাহাদের নিজেদের জ্ঞানেতে আপন আপন মানস-প্রকৃতির এক একটা ছাপ পড়িয়া ইহাদের দুজনের চিন্তার ধরণ ও ভাবের স্বভাবকে পৃথক্ করিয়া রাখে। একই প্রত্যক্ষ বিষয় বা ঘটনা ইহাদের দুজনকে দুই ভাবে অভিভূত করিতে পারে। একই ছাগশিশুকে কালীবাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া রামের হয় ত লোভের আর শ্যামের কারুণ্যের উদয় হইতে পারে। এ সকল বৈষম্য বা বৈশিষ্ট্য যে

কখন্, কোন্ সূত্রে, কি কারণে উৎপন্ন হইয়াছে, কেহই জানে না। আজি পর্য্যন্ত এ সমস্যার নিঃশেষ মীমাংসা হয় নাই, হইবার কোনও আশা আছে বলিয়া বোধ হয় না। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যের নিদান নির্ণয় করিতে পারি বা না পারি, লোকচরিত্র বা সমাজচরিত্রের বিচারে ও আলোচনায় এইগুলিকে মানিয়া লইয়াই চলিতে হয়; নতুবা কোনও সামাজিক সমস্যারই মীমাংসা হয় না। তবে সম্যক্ থাকুক বা না থাকুক, এ সকল বৈশিষ্ট্য যে বহুল পরিমাণে হয়, বৈজিক অনুক্রমের কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার ফল, আর এই বৈজিক অনুক্রম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাও যে জীবের মূল উদ্দেশ্য, যে আত্ম-রক্ষা ও বংশ-রক্ষা তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ভিন্ন ভিন্ন জীবে বা বিভিন্ন সমাজে এই সকল বৈশিষ্ট্য ও বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব।

এই মৌলিক ও সার্ব্বজনীন দৈব প্রয়োজনেই মনুষ্য-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটা দৈহিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে। হয় ত জীবানুক্রমের কোনও অতি দূরাৎ—সুদূরের অজ্ঞাত যুগে জীবের মধ্যে বংশধারা রক্ষা করিবার জন্য এরূপ কোনও পুং-স্ত্রী-বিভাগ ছিল না। বিকাশ-সোপানের অতিশয় নিম্নতমরূপে এখনও এমন সকল জীব আছে, যারা আপনাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়াই স্বজাতীয় বহু জীবের সৃষ্টি করিয়া থাকে। বাল্যকালে স্কুলপাঠ্য পুস্তকে যে পুরুভুজের কথা পড়িয়াছিলাম, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু বর্ত্তমান জীব-জগতে প্রায় সর্ব্বত্রই এ বিভাগ এখন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষতঃ যে সকল জীব জননীর জরায়ুগর্ভে সঞ্চারিত হইয়া, কোন নির্দ্দিষ্টকাল সেইখানেই বাস করে ও



তাহারই ভিতরে বাড়িয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে এই সন্তান-ধারণের প্রয়োজনে স্ত্রীপুরুষের দেহ-গঠন এবং শরীর-চেষ্টা সম্বন্ধে কোনও কোনও বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই সন্তান-ধারণের প্রয়োজনেই মনুষ্য-মণ্ডলীতে পুরুষ ও স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির মধ্যে বহুকাল হইতেই কতকগুলি বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকের কমনীয়তা ও পুরুষের পরুষতার মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, ইহাই তাহার মূল হেতু। আবার এই কমনীয়তা নিবন্ধনই সমাজ-ব্যবস্থাতেই সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সর্ব্বত্রই সংসারের কঠোর ও শ্রমশীল কর্ম্মে পুরুষের এবং অপেক্ষাকৃত কোমল ও স্বল্পায়াসসাধ্য কর্ম্মে স্ত্রীলোকের অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে। সন্তান-ধারণের জন্যই স্ত্রীগণকে মাঝে মাঝে ঋতুমতী হইতে হয়। এই সময়েই স্ত্রীদেহ সন্তানধারণের উপযোগী একটা বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন বিশ্রাম ও সর্ব্বপ্রকারে মানসিক উত্তেজনা হইতে বিমুক্ত থাকা স্ত্রীগণের নিজের স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সন্তানের বিকাশের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক হয়। তার পরে স্ত্রীলোককে গর্ভস্থ সন্তানের কল্যাণের জন্য কঠোর শারীরিক পরিশ্রম বা দুর্ব্বিষহ দুশ্চিন্তাদি হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন। এই সকল কারণেই অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াসসাধ্য ও অনুদ্বেগকর গৃহকার্য্যেই, সকল সভ্য-সমাজে স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ অধিকার জন্মিয়া গিয়াছে; অপেক্ষাকৃত আয়াসসাধ্য বাহিরের কার্য্যেই পুরুষেরও একটা বিশেষ স্থান লাভ হইয়াছে। অতিশয় আদিম অবস্থায় সমাজ যখন আত্মরক্ষার জন্য প্রায়ই প্রতিবেশি-সমাজের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহাদিতে নিযুক্ত থাকিত এবং সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষেরা প্রায় সকলেরই যখন ক্ষাত্র-



বৃত্তি অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক ছিল, তখন শুদ্ধ গৃহকার্য্য নয়, কিন্তু আপন আপন গ্রামে বা গোষ্ঠীদলমধ্যে বেচা-কেনা প্রভৃতি বৈশ্যকর্ম্মও স্ত্রীলোকদিগকেই করিতে হইত। আমাদের দেশে অনেক অর্দ্ধসভ্য পার্ব্বত্য-জাতির মধ্যে এখনও এই প্রথাটা দেখিতে পাওয়া যায়। যে প্রয়োজনে পুরুষেরা সকলে ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিংবা দস্যুবৃত্তি-সহায়ে বাহিরে বাহিরে বনে জঙ্গলে কিংবা পর-গোষ্ঠীর আবাসস্থানে যুদ্ধবিগ্রহাদিতে নিয়ত নিযুক্ত থাকিত বলিয়া সমাজের বৈশ্যকর্ম্মটা স্ত্রীগণের উপরেই অর্পিত হয়, হঠাৎ উচ্চতর সভ্যতা ও রাষ্ট্র-শাসনাধীনে আসিয়া সে প্রয়োজনটা নষ্ট হইয়া গেলেও, প্রাচীন রীতিটা চলিয়া যায় না। তাই খাসিয়া, মণিপুরী প্রভৃতি সমাজে আজিও স্ত্রীলোকেরা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, আবার ঘরের কাজও করে; পুরুষেরা একরূপ অলসভাবেই দিন কাটায়। ক্রমে যখন সমাজে ক্ষাত্রবৃত্তির প্রয়োজন নষ্ট হইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে বড় বড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়া, যাহারা পূর্ব্বে নিজেদের বাহুবলের দ্বারা সমাজকে আততায়ীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত, নিত্য যুদ্ধ-জয় না করিয়া তাহাদের সে কর্ম্ম এক প্রকার লোপ পাইতে আরম্ভ করিত, তখন তাহারাই ধনোপার্জ্জনে নিযুক্ত হইয়া, বৈশ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল। আর বেতনভোগী সেনাদল তাহাদের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে আপনাদিগের বেতন পাইয়া প্রয়োজন-মত রাষ্ট্ররক্ষার ভারগ্রহণ করিয়া ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিল। এইরূপে সমাজে যখন বৈশ্য-ভাব প্রধান হইয়া পড়ে, তখন বৈশ্যবৃত্তিটাই সংগ্রাম-বিভীষিকাযুক্ত সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর ও কষ্টসহিষ্ণু কর্ম্ম হইয়া উঠে এবং এ অবস্থায়,



স্ত্রীলোকেরা সেই পূর্ব্বকার কারণেই, অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে সন্তানধারণ ও সন্তানপালন করিয়া সমাজধারাকে রক্ষা করিবার জন্যই, বৈশ্যকর্ম্ম হইতেও অবসর পাইয়া শুধু গৃহকর্ম্মে আবদ্ধ হন, কিন্তু বৈশ্যবৃত্তি-প্রধান সমাজে, আর কোনও কোনও স্থলে ক্ষাত্রবৃত্তি-প্রধান সমাজেও, যাঁহারা দেশরক্ষার কিংবা ধনাগমের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিবে, তাহাদিগের দৈনন্দিন জীবিকাধারণের প্রয়োজনে যে সকল কায়িক শ্রম আবশ্যক, তাহা হইতে মুক্তি দিবার জন্য, দাস্যবৃত্তি বা শূদ্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা হয়। এই সকল দাস-দাসীরা যখন সংসারের সমুদয় কায়িক পরিশ্রমে নিযুক্ত হইয়া, গৃহস্বামিনী-দিগকে গৃহ-কার্য্য হইতে স্বল্প-বিস্তর অবসর প্রদান করে, তখন সর্ব্বপ্রকারে সুকুমার কলাবিদ্যার অনুশীলন এবং এই সকল কলাবিদ্যার কৃতিত্বের দ্বারা যাঁহারা সমাজের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষাত্রবৃত্তি কিংবা তার ধনাগারের পন্থা প্রশস্ত করিবার জন্য বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে, সেই সকল যোদ্ধা বা বণিক্‌দিগের মনোরঞ্জন-কর্ম্মই স্ত্রীগণের একটা প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। এই ভাবেই মানবসমাজে ক্রমে মা হইতে রমার বিকাশ হইয়াছে। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, সকল সমাজের সভ্যতা এবং সাধ-নার ইতিহাসেই, স্ত্রীপ্রকৃতি ও স্ত্রীচরিত্রের এই বিকাশের ক্রমটি লক্ষ্য করিতে পারা যায়। আধুনিক জগতের স্ত্রীচরিত্রের আলোচনায় এটি একটি মূল সূত্র বলিয়াই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভারতে এবং ইয়োরোপে উভয়ত্রই এই বিকাশ-ক্রমটি দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের ও ইয়োরোপের স্ত্রী-চরিত্রের আদর্শের মধ্যে এই দুইটি ভাব বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতের স্ত্রী-চরিত্রে মা'র ভাব, আর



ইয়োরোপের স্ত্রী-চরিত্রে রমার ভাবই সমধিক পরিস্ফুট। নারী সর্ব্বত্রই মা! সর্ব্বত্রই আবার তিনি রমণীও। যে সন্তানধারণ নারীজীবনের বিশেষত্ব, যাহাতে নারীর নারীত্ব, স্ত্রীর স্ত্রীত্ব, যার দরুণে স্ত্রী-চরিত্র সর্ব্ব-বিষয়ে, প্রকৃতির নিয়মেই, পুরুষের চরিত্র হইতে পৃথক্ হইয়া আছে, সেই সন্তানধারণের প্রয়োজনেই নারী রমণীও হইয়া আছেন। আগে তিনি রমা, তার পরেই মা। আদর্শ-স্ত্রী-চরিত্রে রমাত্ব ও মাতৃত্ব দুয়েরই অপূর্ব্ব সমাবেশ থাকে। প্রথমটি না হইলে দ্বিতীয়টি সম্ভবে না; দ্বিতীয়টি না হইলে প্রথমটি পরিপূর্ণ হয় না। 'রমা' ফুল, 'মা' ফল। ফুল না হইলে ফল হয় না; আবার ফল না হইলে ফুলেরও সার্থকতা হয় না। ফুল ও ফলের মতন, রমা ও মা একে অন্যের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ, অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে আবদ্ধ। সুতরাং যেখানেই রমা, সেইখানেই মা। যেইখানেই মা ফুটি-য়াছে, সেইখানে রমাও আছে। কিন্তু রমা ও মা দুই এক হইলেও, কোন সভ্যতায় ও সাধনায় বা নারীর রমা ভাবটার উপরেই বেশী ঝোঁক পড়ি-য়াছে। কোথাও বা আবার মা ভাবের উপরেই ঝোঁকটা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সংকীর্ণ অর্থেই,ইয়োরোপীয় সভ্যতা এবং সাধনা বহুকাল হইতে নারীকে রমারূপেই বিশেষভাবে ভজিয়াছে; আর ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনা তাঁহাকে মা-রূপেই পূজিয়াছে, এই কথাটা বলা যাইতে পারে। নতুবা সে দেশে যে কেবল রমণীই ছিলেন বা আছেন, জননী ছিলেন বা নাই; আর এ দেশে যে কেবল চিরদিনই নারী জননী হইয়াই ছিলেন,রমণী কখনও হন নাই; কিছুতেই এমন কথা বলা যায় না। এটা যে ভাবে বা ভাবিবে, সে ইয়োরোপকেও চিনিবে না, ভারতকেও জানে না ও বুঝে না।



ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। আমাদের, বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা দেশের সাধনাতে একদিকে যেমন জগদম্বাকে, সেই-রূপ অন্য দিকে শ্রীরাধিকাকে দেখিতে পাই। জগদম্বা পরিপূর্ণ মাতৃমূর্ত্তি। শ্রীরাধিকা পূর্ণতমা রমা-মূর্ত্তি। জগদম্বা আদ্যাশক্তি, কারণরূপিণী, মাতৃ-স্বরূপা; বীজ-গর্ভে যেমন বিশাল অশ্বত্থ থাকে, তেমনি তাঁর গর্ভে এই বিশাল বিশ্ব লুকাইয়াছিল; তাঁরই বিসৃজনের ফলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বিশ্বমাতৃকা, বিশ্বপালিকা। বৈদান্তিক সিদ্ধান্তে এই সৃষ্টি-শক্তি, মায়া-শক্তি। এই জন্য জগদম্বা পরমপুরুষের সদসদাত্মিকা, অনির্ব্বচনীয়া অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াপ্রকৃতি। বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শ্রীরাধি-কার কোনওরূপ সৃষ্টি-সম্বন্ধ এবং মায়াগন্ধ নাই। তিনি পরম পুরুষের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি নহেন। বৈষ্ণবেরা কহেন,—এই

বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥

আর— রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
* * * * *
হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরমাকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি॥



আর এই জন্যই শ্রীরাধিকা মা নহেন, শুদ্ধ রমা, কেবল আনন্দ-আধার, শুদ্ধ রসাত্মিকা, পূর্ণসুখ-হেতু, অন্য হেতুর আশ্রয় তাঁহার মধ্যে নাই। আর অতি প্রাচীনকাল হইতেই সমষ্টীভূত হিন্দু সাধনা এই দুই ভাবেই নারী-বস্তু ও নারী-তত্ত্বকে দেখিয়া আসিয়াছে। সুতরাং হিন্দুর সাধনায় নারী কেবল মা নহেন, তিনি রমাও। নারীকে আমরা কেবলই মাতৃ-রূপে দেখি নাই, রমণীরূপেও ভজিয়াছি। তবে হিন্দুর সাধনাতে মা ও রমা দু'ই সমভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, সামাজিক জীবনে ও সামাজিক আদর্শে হিন্দুর দৃষ্টিটা রমা অপেক্ষা মার উপরেই যে বেশী পড়িয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতের সভ্যতা ও সাধনায় যেমন মা ও রমা দুই আদর্শই স্বল্পবিস্তর ফুটিয়াছিল, সেইরূপ য়ুরোপীয় সভ্যতা এবং সাধনাতেও এই দুইটি ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের জগদম্বার মতন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বে বা ধর্ম্ম-সাধনে কোনও কিছু নাই। আমাদের শ্রীরাধিকার মতনও কিছু নাই। পরম তত্ত্বকে খ্রীষ্টীয়ান্ চিন্তা ও খ্রীষ্টীয়ান্ সাধনা পুরুষ-প্রকৃতিরূপে কোনও দিন দেখে নাই। আমাদের পুরুষ, জগদতীত, নিত্য সত্তা। খৃষ্টীয় সাধনায় এই তত্ত্বকে ফাদার বা পিতা বলে। এই পিতাই তাঁহাদের তুরীয় তত্ত্ব। আর আমরা যে তত্ত্বকে তান্ত্রিক সাধনাতে বা বেদান্তমতে আদ্যা-শক্তিরূপে এবং বৈষ্ণব সাধনা ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে ভগবানের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি শ্রীরাধিকারূপে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি, খৃষ্টীয়ান সাধনা তাহাকে পুত্ররূপে দেখিয়াছে। মূলতঃ ও তত্ত্বতঃ, মোটের উপরে, আমাদের শিব ও কৃষ্ণ, খৃষ্টীয়ানদের ফাদার; আর আমাদের মহামায়া ও শ্রীরাধিকা,



তাঁহাদের পুত্র। এই পুত্রই যিশুখৃষ্ট। এই দিক্ দিয়া, পরমতত্ত্বের অন্বেষণে যাইয়া, খ্রীষ্টীয়ানেরা তাহার মধ্যে শিবশক্তি কিংবা কৃষ্ণ-রাধার মতন কোন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন নাই; সুতরাং আমাদের ভক্তি-সাধনে,—কি তন্ত্র-মতে, কি বৈষ্ণবমতে—যে সকল রসোচ্ছ্বাস দেখিতে পাই, তাহা ঠিক খ্রীষ্টীয়ান ভক্তি-সাধনে পাওয়া যায় না। মাতৃভক্তিরও সে উচ্ছ্বাস, মাধুর্য্যেরও সে উন্নত উজ্জ্বল রস-শ্রী সেখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু তথাপি সাধনার রাজ্যে যীশু-মাতা মেরীর উপাসনার ভিতর দিয়া আদি খ্রীষ্টীয়ান-সমাজে ও আধুনিক ক্যাথলিক খ্রীষ্টীয়ান-সম্প্রদায়-মধ্যে রমণীর মাতৃভাবটা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রোমান ক্যাথলিক দেশে, বিশেষতঃ ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে, এই মেরী-পূজার আশ্রয়ে লোকচরিত্রের মধ্যেও একটা অপূর্ব্ব কোমলতা ফুটিয়াছে। মেরী যীশুর মাতা, মেরীর পূজাতে প্রকৃতপক্ষে যীশু ও তাঁর মাতা উভয়েরই পূজা এক সঙ্গে করিতে হয়। যীশুকে ছাড়িয়া মেরীর ধ্যান ও ভজনা হয় না, আর মেরীকে ছাড়িয়াও যীশুর ভজনা হয় না। মেরী এই জন্য কতকটা আমাদের দেশের গণেশ-জননীর মতন। মেরীর মূর্ত্তিতে সর্ব্বদাই তিনি শিশু যীশুকে কোলে করিয়া আছেন, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য ক্যাথলিক দেশে ও ক্যাথলিক সাধনাতে রমণীর মাতৃভাবটা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সাধারণ খ্রীষ্টীয়ান-সমাজ ও সভ্যতা, বিশেষতঃ বিগত চারি পাঁচ শত বর্ষে যে প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ান সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এ ভাবটা বিশেষ প্রবল হইতে পারে নাই, বরং মধ্যযুগ হইতেই খ্রীষ্টীয়ান-সমাজে

পুরুষের শৌর্য্য-বীর্য্য-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে রমণীর রমা ভাবটাই বেশী ফুটিয়াছে।

আধুনিক যুগ বলিয়া আমরা খ্রীষ্টীয়ান সভ্যতার ইতিহাসের যে যুগকে নির্দ্দেশ করি, একভাবে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জন্ম হইয়াছে। আদিতে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম সন্ন্যাস-প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতার ভোগবিলাসের সঙ্গে সঙ্গে রসের আদর্শ ও অনুশীলনকে, এমন কি, যে সকল সহজ জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধন করিয়া গ্রীস ও রোম জগতে এক সময় এতটা বরেণ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে পর্য্যন্ত আদি খ্রীষ্টীয়ানেরা অত্যন্ত হেয় চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। কিন্তু পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে ক্যাথলিকসঙ্ঘের কঠোর শাসন-মুক্ত হইয়া, য়ুরোপীয় সাধনা পুনরায় গ্রীস ও রোমের লুপ্ত-আদর্শের অনুশীলনে নিযুক্ত হয়। ইহার ফলে য়ুরোপীয়সমাজে একটা অভিনব রূপলালসা ও কলানুশীলন-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। এই রূপ-লালসা ও কলানুশীলনের ফলে, য়ুরোপীয় রমণীর রমা ভাবটাকে অতি-মাত্রায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই সকল কারণে আমাদের দেশে যেমন রমণীর মাতৃভাবটাই বিশেষ পরিস্ফুট দেখিতে পাই, অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেইরূপ য়ুরোপে তাহার রমা-ভাবটাই বিশেষ পরিস্ফুট দেখা গিয়াছিল। মোটের উপরে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার চক্ষে তিনি রমণী হইয়া বিশেষভাবে বিরাজ করিতেছেন।

আমরা এই জন্য অপরিচিত নারীকে প্রায়ই "মা" বলিয়া সম্বোধন করি। য়ুরোপীয়েরা সে স্থলে "কুমারী" বা "মিস্" বা "মেডেমোজেল"



বলেন। ফলতঃ ইংরেজি মেইড বা মেইডেন, বা মিস্, কিংবা ফরাসীর "মেডেমোজেল" শব্দের খাঁটী বাংলা কুমারী কি না, তাহাও বলা সহজ নয়। "কুমারী" বলিতে আমাদের চক্ষে গৌরীর ছবি ভাসিয়া উঠে। "গৌরী"—জগদম্বা; "উমা" মার পূর্ব্বাবস্থা। মিস্ বা মেইড, বা মেইডেন বা মেডেমোজেল মার পূর্ব্বাবস্থা নহে, পত্নীর অপরিণীতাবস্থা। দুইটা ভাবেতে বিস্তর প্রভেদ আছে। কুমারী বলিতে ক্রমে যে মা হইবে, তাই আমরা ভাবি। মিস্ বা মেইডেন বলিতে ক্রমে যে কারো পত্নী বা রমণী হইবে, তাই আমরা বিশেষরূপে ভাবি, তাঁর ভবিষ্যতেও মাতৃত্বের কথা আমাদের চিন্তাতে উদয় হয় না। মিস্ বা মেইডেনকে কত সাধিয়া ভজিয়া পত্নীরূপে পাইতে হয়। সুতরাং তাঁর সঙ্গে সকল সম্বন্ধের মধ্যেই ঐ রমণীভাবটা লুকাইয়া থাকে। য়ুরোপীয়েরা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে সকল সৌজন্য ব্যবহার করেন, তাহার ভিতরে ভিতরে এই সাধনা, এই ভজার ভাবটা থাকে ও আছে। বিশ্লেষণ করিলেই তাহা ধরা পড়ে। কিন্তু মার সঙ্গে আমাদের ভক্তির, মমতার সম্বন্ধ। মাকে সাধিতে হয় না, মা আমাদের নিত্যসিদ্ধ বস্তু। মাকে ভজিতে হয় না, আজন্ম তাঁর অযাচিত স্নেহে আমরা লালিত-পালিত। সুতরাং মার জন্য সন্তান একদিকে প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু অন্যদিকে মার গামছাখানা হাত হইতে পড়িয়া গেলে অকারণে তাহা তুলিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠে না। মার সঙ্গে সন্তানের ব্যবহারে একটা খোলাখুলি; একটা সরল, সহজ, শিশুর মতন অকৈতব ভাব সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হয়। এ জগতে আর কোনও সম্বন্ধেতে এ ভাবটা দেখা যায় না।



এই দুই ভাবে, মা-রূপে ও রমা-রূপে নারীচরিত্রের আলোচনা করিলেই ভারত কোন্ চক্ষে আর য়ুরোপ কোন্ চক্ষে নারীকে দেখিয়াছে, ইহার মূল সূত্রটি ধরিতে পারা যায়। উভয় দেশের সভ্যতা, সাধনা, সাহিত্য, সমাজ সকলই এই মূলসূত্রের ভাষ্য হইয়া আছে।



লেখক—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বিলাতী ও ফরাসী রূপ

বিলাতী রূপের কথা—বিবিদের সভ্যতা, ফ্যাসান, আদব-কায়দার কথা—আমাদের সঙ্গে তুলনা ক'রে, যথাযথ লত্য বর্ণনের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেই দেশপূজ্য চিন্তাশীল মনীষী স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমাজের সূক্ষ্মদর্শনের কথা স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। স্বামীজী মহারাজ তদীয় গভীর চিন্তাপ্রসূত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"ইউরোপের সভ্যতার উন্মেষ শক্তিপূজার অভ্যুদয়ে।—এ শক্তি-পূজা কেবল কাম নয়। যে শক্তিপূজা আমাদের তীর্থস্থানে ক্ষণমাত্র হয়, সেই পূজা এদের দিনরাত—বারমাস। পাশ্চাত্যের ধর্ম্মই শক্তিপূজা। আধা বামাচার রকমের—পঞ্চমকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে। "বামে বামা দক্ষিণে পানপাত্রং, অগ্রে ন্যস্তং মরীচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসম্।



কৌলো ধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।" প্রকাশ্য, সর্ব্বসাধারণ শক্তি-পূজা, বামাচার, মাতৃভাবও যথেষ্ট। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চস্থান, আদর, খাতির। এ যে সে স্ত্রীলোকের পূজো, চেনা অচেনার পূজো, ভদ্রকুলের ত কথাই নাই। রূপসী যুবতীর ত কথাই নাই। * * *

"স্ত্রী-সম্বন্ধী আচার পৃথিবীর সর্ব্বত্রে সেই একরূপ অর্থাৎ পুরুষমানুষের অন্য স্ত্রীসংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাটায় মুস্কিল। * * আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য্য বিনা তা কেমনে হয় বল? এদের উদ্দেশ্য ভোগ, ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক তত নাই; তবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব-নাশ হ'লে ছেলেপিলে জন্মায় না এবং সমগ্র জাতির ধ্বংস। কাজেই—সকল দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর বিশেষ আগ্রহ। * * *

"ইংরেজ আমেরিকান্‌রা কথাবার্ত্তায় বড় সাবধান মেয়েদের সাম্‌নে। ঠ্যাঙ্গ বল্‌বার যো নাই, মলমূত্রের নামটি আন্‌বার যো নাই। ফরাসীরা আমাদের মত মুখখোলা; জার্ম্মান, রুষ প্রভৃতি সকলের সামনে খিস্তি করে। * * *

প্রেম-প্রণয়ের কথা অবাধে মায়-ছেলে ভায়ে-বোনে তা চলেছে। বাবা মেয়ের প্রণয়ীর (ভবিষ্যৎ বরের) কথা নানা রকমে ঠাট্টা ক'রে মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছে; ফরাসীর মেয়ে অবনতমুখী, ইংরেজের মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিণের মেয়ে চোটপাট জবাব দিচ্ছে। চুম্বন, আলিঙ্গনটা পর্য্যন্ত দোষাবহ নয়, অশ্লীল নয়। আমেরিকার পরিবারের পুরুষবন্ধু'ও আত্মীয়তা হ'লে, বাটীর যুবতী মেয়েদের সেকহ্যাণ্ড স্থলে চুম্বন

করে। আমাদের দেশে প্রেম-প্রণয়ের নামগন্ধটি পর্য্যন্ত গুরুজনের সাম্‌নে হ'বার যো নাই। * * *

"এদের ফ্যাসান কাপড়ে। আমাদের ফ্যাসান গহনায়; এখন কিছু কিছু কাপড়েও হচ্ছে। ফ্যাসানটা কি না ঢঙ্গ; মেয়েদের কাপড়ের ঢঙ্গ প্যারিস সহর থেকে বেরোয়, পুরুষদের লণ্ডন থেকে। আগে প্যারিসের নর্ত্তকীরা এই ঢঙ্গ ফেরাতো। একজন বিখ্যাত নটী যা পোষাক পোর্‌লে, সকলে অমনি দৌড়ুল তাই কত্তে, এখন দোকানির ঢঙ্গ করে। কত ক্রোর টাকা যে, এই পোষাক কর্ত্তে লাগে, প্রতি বৎসর তা আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারি নি। এ পোষাক গড়া এক প্রকাণ্ড বিদ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ মেয়ের গায়ের চুলের রঙ্গের সঙ্গে কোন্ রঙের কাপড় সাজন্ত হবে, কার শরীরের কোন্ গড়নটা ঢাকৃতে হবে, কোন্‌টা বা পরিস্ফুট কর্‌তে হবে, ইত্যাদি অনেক মাথা ঘামিয়ে পোষাক তৈরী হয়। তার পর, দুচার জন উচ্চপদস্থ মহিলা যা করেন, বাকী সকলকে তাই পর্‌তে হয়, না পর্‌লে জাতি যায়! * * *

"ঠাণ্ডাদেশ, এজন্ত সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গ না ঢেকে কারুর সাম্‌নে বেরুবার যো নাই। বিলাতে ঠিক ঠিক পোষাকটি না পরে ঘরের বাহিরে যাবার যো নাই; পাশ্চাত্যদেশের মেয়েদের পা দেখান বড়ই লজ্জা, কিন্তু গলা, বুকের খানিকটা দেখান যেতে পারে। আমাদের দেশে মুখ দেখান বড়ই লজ্জা; কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে সাড়ী কোমরে উঠেন উঠুন, তায় দোষ নাই। রাজপুতানা ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখান। * *

"পাশ্চাত্য দেশের নর্ত্তকী ও বেশ্যারা লোক ভুলাইবার জন্ত

অনাচ্ছাদিত। এদের নাচের মানে তালে তালে শরীর অনাবৃত ক'রে দেখান। আমাদের দেশের আদুড় গা ভদ্রলোকের মেয়ের, নর্ত্তকী বেশ্যা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। * *

"পাশ্চত্যের ডাক্তারেরা পূর্ণবয়স্কের জন্যও একপোয়া দুধ আস্তে আস্তে আধঘণ্টায় খাওনোর বিধি দেন; কচিছেলেদের জন্য ফিডিং বটল ছাড়া উপায়ান্তর নাই। আমাদের দেশে মা ব্যস্ত কাজে, দাসী একটা ঝিনুকে কোরে, ছেলেটাকে চেপে ধরে, সাঁ সাঁ দুধ খাওয়াচ্ছে!! লাভের মধ্যে এই যে রোগা-পটকাগুলো আর বড়, বড় হচ্ছে না। তারা ঐখানেই জন্মের মত দুধ খাচ্ছে! * *

"আর পাশ্চাত্যেরা বড় আমোদপ্রিয়। কোনও বড় সামাজিক ব্যাপার নর্ত্তকীর নাচ না হ'লে সম্পূর্ণ হয় না।—এদের নাচটা আমাদের চক্ষে অশ্লীল বটে, তবে এদের সয়ে গেছে। নেংটী নাচ সর্ব্বত্রে,গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়।"* *

স্বামীজীর এই প্রামাণ্য উক্তি হইতে বিলাতি বিবিদের চরিত্রের বেশ একটা মোটামুটী আভাস পাওয়া যায়। আমিও আর দুএকটি কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির রমণী-সৌন্দর্য্য সেই সেই দেশের পুরুষের রুচি অনুসারে কথিত হয়। একটু বড় করিয়া বলিলে, পুরুষের দ্বারাই নারীর রূপ বিচারিত হয়, যে দেশের পুরুষের যেমন রুচি, তাঁহারা সেই ভাবেই রমণীর সৌন্দর্য্য কল্পনা করিয়াছেন। সুবদনা সুনয়না গৌরাঙ্গী ভারতকামিনী, ধবলাঙ্গী মার্জ্জারাক্ষী পট্টকেশী পাশ্চাত্য-রমণী, স্থূলাঙ্গী, স্থূলোষ্ঠী, ক্ষুদ্রকেশী ক্ষুদ্রনয়না ঘোর কৃষ্ণাঙ্গী কাফ্রি-রমণী এবং অন্যান্য



দেশের কথা পুরাণে, ইতিহাসে ও গল্পে যাহা কিছু পাঠ করা যায়, তাহাতে যাঁহাদের রূপ, তাঁহারাই বিচারকর্ত্তা, ইহাই বুঝিয়া লইতে হয়। রমণীর সৌন্দর্য্য যে কেবল গাত্রবর্ণে, নয়নে, বদনে, বাহুতে কুন্তলে সুসংবদ্ধ আছে, এরূপ মনে করা ভুল। বাহ্যদর্শনটি কেবল কল্পনার ফল, তাহাতে সারার্থ অতি অল্প। হৃদয়ের রূপ, যে রূপ অন্তরে নিহিত, সেই রূপের গৌরব অগৌরব বিচার করাই নিরপেক্ষ বিচারকের কর্ত্তব্য কার্য্য। সকল দেশের রমণীতে সেই অন্তর-সৌন্দর্য্য কি ভাবে বিরাজিত আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন।

ইয়োরোপখণ্ডে ইংরাজ একটি নূতন জাতি, সেই নূতন জাতি এ দেশের সর্ব্বত্রে নূতন রুচি ও নূতন সভ্যতা প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা রমণী-সৌন্দর্য্যের আদর করেন, পরস্পরা সম্বন্ধে রমণীগণের চরণ পূজা করেন, করতলে নারীচরণ ধারণ করিয়া যান হইতে অবতরণ করান, তাঁহাদের কাছে নারীজাতির বহুমান। নারীগণকে সেই মান তাঁহারা দেন বলিয়া ভারতকামিনীগণকে, সূক্ষ্ম কথায় বঙ্গকামিনীগণকে অন্তঃপুরে বন্দিনী দাসী বলিয়া নিন্দা করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা ইংরেজের গৌরবের এই সূক্ষ্মতত্ত্বটি ভাল বুঝি না, বুঝিতেও পারি না।

ইংরাজ আপনাদের প্রণীত পুস্তকে—সভাবিশেষে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতায় ও সামাজিক মজলিসে নারীরূপের অপরিসীম যশ কীর্ত্তন করেন, নারীগণের মহিমা-কীর্ত্তনের সময় তাঁহাদের মুখে লাল পড়ে, নারীর অবাধ্য হইয়া চলিলে, সভ্য ইংরাজপুরুষের নিন্দা হয়, সমাজে তাঁহাদের মান-মর্য্যাদা কমিয়া যায়। নারী মুখরা, কলহপ্রিয়া, স্বেচ্ছাচারিণী হইলেও করযোড়ে


সৌন্দর্য

স্বামীকে তাঁহার পদানত অনুগত হইয়া থাকিতেই হয়। এ ব্যবহারটা তাঁহাদের পক্ষেই ভাল। ঘাগরা-ঢাকা শুভ্রবদনা শ্বেতাঙ্গিনীগণের বাহ্যরূপ দেখিতে দেখিতে ইংরাজের মনে বোধ করি, কিছু অরুচি জন্মিয়াছে, ইংরাজ জগতের নূতন জাতি, সুতরাং নারীরূপের নূতনতত্ত্বদর্শনে তাঁহাদের অভিলাষ জন্মিয়াছে; বসনাবৃত ললনাগণের আবরণ মোচন করিয়া উলঙ্গিনী মূর্ত্তি দর্শন করা তাঁহাদের অতিশয় প্রীতিকর বোধ হইতেছে, ইহা যে কেবল কৌতূহলেরই উপদেশ, এ পদ্ধতি যে কেবল ইংরাজের দ্বারাই অনুষ্ঠিত, এমন কথা আমরা বলি না। প্রাচীনকাল হইতে গ্রীক, রোমান ও ফরাসী সম্ভ্রান্ত ধনবান্‌গণেব নাচঘরে এবং সৌখীন লোকের বৈঠক-খানার ভিত্তিগাত্রে Refined testএর সুচিত্রিত উলঙ্গিনী নারীমূর্ত্তি নয়ন-মনোহারিণী শোভা বিস্তার করিত; কেবল ইহাই নহে, ফরাসী ও ইংরাজ লম্ফে লম্ফে অনেক দূর উচ্চে উঠিয়াছেন; ছবিগুলিই নির্জ্জীব, সেই জন্য সজীব সুন্দরী রমণীগণকে তাঁহারা বিবস্ত্রা দর্শন করিতে বড়ই ভালবাসিতে শিখিয়াছেন। ইংরাজী ফরাসী নৃত্যসভায় যাঁহারা নৃত্য করেন, লজ্জা তাঁহাদের নিকটে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। একে তো স্ত্রী, পুরুষ একত্রে কোলাকুলি করিয়া নৃত্য করা ঐ সকল নৃত্যের রীতি, তাহার উপর স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই সামাজিক লজ্জা-পরিবর্জ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়। লজ্জা পরিহার করিয়া তাঁহারা যে কিছু অপ্রতিভ হন, এমন কথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। বিলক্ষণ সপ্রতিভ—বিলক্ষণ প্রমোদিত, দ্রাক্ষারস-রক্তবদনে অট্ট-অট্ট হাস্য!

নর্ত্তকী বিবিগুলিকে তাঁহারা উলঙ্গিনী সাজাইয়া আসরে বাহির

করেন। বিবিলোকের অঙ্গে এক প্রকার বসনাবরণ থাকে, ইংরাজীতে সে বসনকে 'Ball dress' বলে ; কি চমৎকার যে সেই বল-ড্রেস, চিত্র করিয়া তাহা বুঝাইয়া দেওয়া আমাদের অসাধ্য ; বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও ঘৃণা ও লজ্জা তদ্‌বিষয়ে আমাদিগকে বাধা দেয়। বাঙ্গালী পাঠকেরা আমাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঢাকাই বসন দর্শন করিয়াছেন, সে বসনেরও বরং মান আছে, কিন্তু ইংরাজী বিবিদের বলড্রেসগুলির পা থাকিলে তাহারা আমাদের সূক্ষ্ম ঢাকাই বস্ত্রগুলির মাথায় দাঁড়াইয়া নৃত্য করিত। যাঁহারা সেই সকল ড্রেস পরিধান করেন, তাঁহারা স্ব স্ব গৌরবের গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া সভ্যতার জয়-ঢক্কা বাজান। নাচের সময় অঙ্গে বস্ত্রের ছায়ামাত্র থাকে কি না, দর্শক অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াও তাহা নিরূপণ করিতে পারেন না। ফরাসী ও ইংরাজ নিভৃত রঙ্গকক্ষেও রমণীর প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চরিতার্থ হন।

ভারতবর্ষের উন্নতিকামুক যুবকদল এই নূতন সভ্যতার অনুকরণে ব্যতিব্যস্ত। সত্য যদি উহার নাম সভ্যতা হয়, তবে আমি দূর হইতে উহাকে শত শত নমস্কার করি, সময়ান্তরে আবার দেখা হইবে।



লেখক—ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক।

বিভিন্ন দেশীয় সৌন্দর্য্য।

চীন-সৌন্দর্য্য।

চীনদেশের সৌন্দর্য্য-বিচার পা দেখিয়া হয়, যার পা যত ছোট, সে তত সুন্দরী। বিবাহের পূর্ব্বে মেয়ের কেমন গড়ন, কেমন রঙ, এ সব প্রশ্ন উঠে না। লোকে জিজ্ঞাসা করে, "তার পা কত বড়?" পা তিন ইঞ্চি হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী হয়। সেই কারণ শিশুকাল হইতেই পায়ের আঙ্গুল কয়টি মুস্‌ড়াইয়া দিয়া পায়ে ছোট জুতা পরাইয়া দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য স্বাভাবিক নিয়মে পা বাড়িতে না পারে। ইহাতে শিশুর যন্ত্রণার একশেষ হয়। কতদিন ধরিয়া কষ্টে অধীর হইয়া তাহারা অহরহঃ কাঁদে, কখনও কখনও আঙ্গুলগুলি পচিয়া খসিয়া পড়ে। পা এত ছোট করে বলিয়া চীন-স্ত্রীলোকেরা ভাল করিয়া চলিতে পারে না।

পুত্র প্রসব না করিলে স্ত্রীর আদর নাই, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে



ইচ্ছামত ত্যাগ করিতে পারে। বহুবিবাহ চীনদেশে নিষিদ্ধ। চীনদেশে স্ত্রীলোকদিগকে আত্মহত্যা করিতে প্রায়ই শুনা যায়। শাশুড়ীর অত্যাচার তাহার একটি প্রধান কারণ। বিধবা স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইবার নিয়ম নাই। তবে দরিদ্রলোকের গৃহে বিধবা-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। যদিও বিধব-বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু উপপত্নীভাবে অন্যের সঙ্গে থাকিবার নিয়ম আছে। গলায় দড়ি দিয়া সহমরণ-প্রথাও প্রচলিত।

চীন-স্ত্রীলোকেরা সরল, বিনয়-নম্র, লজ্জাশীলা, করুণার্দ্রহৃদয়া, সন্তান-স্নেহবৎসলা; মুখে হাসি নাই, উচ্চকথা নাই, নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া সন্তানকে যত্ন করেন, স্তন্যদুগ্ধ ঈষৎ গরম ক'রে শিশুকে পান করায়। সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য দরিদ্রগণ শিশুকন্যা জলে ডুবাইয়া মারে, যাহাতে জলে ডুবাইয়া শিশুকন্যা হত্যা করা না হয়, তার জন্য খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকেরা সদাই সচেষ্ট। বাজারে কেহ ছোট ছেলে-মেয়ে বিক্রয় করিতে আনিলে তাহাদিগকে কিনিয়া লন ও নিজেরা লালন-পালন করেন।

প্রায় সকল নৌকাই চীনের স্ত্রীলোক দ্বারা পরিচালিত। হাল ধরিয়াছে স্ত্রীলোক, দাঁড় টানিতেছে স্ত্রীলোক। স্বাধীনভাবে সানন্দচিত্তে নৌকায় দিবারাত্র বাস হেতু স্বাস্থ্যের যে প্রফুল্লতা জন্মে, তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যেক হাবভাবে জানা যায়। নীল পোষাকের উপর চীন-রমণীর সাদা রঙের পূর্ণবিকাশ—ঠিক যেন, ছবির মত দেখায়। প্রাতঃকালীন সূর্য্যরশ্মি সেই সকল মুখের উপর পড়িয়া, স্বচ্ছসরোবরে শ্রেণীবদ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ন্যায় শোভা পায়। চীনদেশের স্ত্রীলোকের



বীণাবাদিনী।

1

সরলতার তুলনা নাই। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সঙ্গে এক টেবিলে বসিয়া আহার করেন না। চীনদেশে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত নাই। চীন-রমণী বড়ই সঙ্গীতপ্রিয়। চীনের বংশীরব করুণরসব্যঞ্জক। অভিনয়ে পুরুষই স্ত্রীলোক সাজে। স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা এতই বেশী যে, দশজনের সাম্‌নে রঙ্গমঞ্চের উপর চাহিয়া প্রকৃতিদত্ত স্ত্রী-মর্য্যাদা হানি করা চীনেরা বর্ব্বরতা মনে করে।

চীনে স্ত্রীজাতির শিক্ষাদীক্ষা ও অবস্থার উন্নতি অতি দ্রুতধারায় চলিতেছে। পা ছোট করার প্রথা, অবরোধ ও অশিক্ষা এখন রুচি-বহির্ভূত।

ব্রহ্মের রমণী।

ব্রহ্মদেশের স্ত্রীলোকের প্রভুত্ব অত্যধিক। তাঁহারাই কাজকর্ম্ম করিয়া থাকেন, দোকান রাখেন ও কেনাবেচা করেন। লাল রেসমের লুঙ্গী পরিয়া মুখে ঘন করিয়া "তা—না—খা" অর্থাৎ চন্দন-কাষ্ঠের গুঁড়া মাখিয়া সুস্থশরীরে হৃষ্টচিত্তে কেনা-বেচা করেন। অল্প কারণেই তাঁহারা বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারেন। ব্রহ্মের অনেক আফিঙসেবী অলস পুরুষ ঘরে বসিয়া থাকেন, কতক কতক গৃহকর্ম্ম করেন, রাঁধেন, ঘর ঝাঁট দেন। আসল কাজের ভিতর কেবল স্ত্রীর খাবারটি দোকানে পৌঁছাইয়া দেওয়া। ব্রহ্মদেশের স্ত্রী-লোকের গোলগাল সুগঠিত দেহ, পুরুষের অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ। বর্ম্মায় স্ত্রীলোকের ক্ষমতা এত অধিক যে, বিবাহের পর জামা-তাকে অন্ততঃ কিছুদিন শ্বশুরঘর করিতেই হয়। স্ত্রীলোকের এত স্বাধীনতা সত্ত্বেও বর্ম্মায় বহুবিবাহ প্রচলিত।



স্ত্রীলোকের গায়ে গহনা নাই। যা কিছু আছে, কানে, হাতে ও মাথায়। অধিকাংশ স্ত্রী-লোকই চটী জুতা পায় দেয়। সকলেরই ঢলঢলে পোষাক পছন্দ। কাপড়চোপড়েই তাহাদের সজ্জার বেশীভাগ দৃষ্টি। স্তনের উপর আঁটিয়া লুঙ্গী পরে বলিয়া স্বাধীনভাবে চলাফেরার ব্যাঘাত হয়। সেই কারণেই বর্ম্মাজাতির স্ত্রীলোকের চলা ও নাচা সরলভাবে হয় না—কত-কটা আড়ষ্ট আড়ষ্ট ভাব।

পিনাং-রমণী।

স্ত্রীলোকদের তেমন অবরোধ-প্রথা নাই, মাথায় কাপড় অবধি দেয় না। স্ত্রীলোকেরা চুল লইয়াই ব্যস্ত। তাহারা পরিপাটী করিয়া খোঁপা বাঁধে এবং সেই খোঁপাটি অনাবৃত রাখে এবং মরালগ্রীবাটি সকলকে দেখাইতে ভালবাসে।

কোরিয়া-রমণী।

কোরিয়া দেশে প্রায়ই স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী বয়সে বড় হইয়া থাকে। বিবাহের প্রথাও অতি চমৎকার।

।

ইউরোপীয় ও চীনমিশ্রিত কতকগুলি জাতি পূর্ব্বদ্বীপে বাস করে। ইউরোপীয়দিগের মত ইহাদের নাসিকা উন্নত ও চীনের মত গালের হাড়ও উঁচু। ইহারা চীনে স্ত্রীলোকদিগের মত ইজের ও চায়না-কোট বা বিবি-দের মত গাউন কিছুই পরে না। তাহাদের পোষাক—পরণে পশমের লুঙ্গী, গায়ে এক গা গহনা। ইহারা "পান," সুপুরি ও চুরুট খায় এবং চা পান করে।



লেখক—শ্রীহরিপদ অধিকারী।

জাপানী সুন্দরী

জাপানে যে সুন্দরীর চক্ষু অর্দ্ধ-নিমীলিত ও নাসিকা অত্যন্ত চ্যাপ্টা, তিনিই সুন্দরী বলিয়া গণ্য। জাপান-রমণী বীর-জননী। শোকে ধৈর্য্যশীলা, শ্রমশীলা, কঠোর-কর্ত্তব্যপরায়ণা, সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তা এমন হাস্যময়ী রমণী পৃথিবীর অন্য জাতিতে দুর্ল্লভ। স্বাধীন দেশে স্বাধীনা রমণী হইলেও তাঁহারা লজ্জাশীলা, মধুরভাষিণী এবং জ্ঞানসঞ্চয়ে তৎপরা। স্বামীকে অপর রমণীতে আসক্ত দেখিলে, তাঁহারা সেই রূপসী যুবতীকে গৃহে আনিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করেন। প্রফুল্ল-মুখে স্বামীর এবং তাঁহার উপপত্নীর সেবা করেন। স্ত্রীর সম্মুখে স্বামী অকুতোভয়ে জাপানী বার-বিলাসিনী গেইসা নাচওয়ালীদিগকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করেন। স্ত্রী তাহাতে বিমর্ষ হয় না; বাধা দেয় না। জাপান-রমণী হঠাৎ মর্ম্মাহত

হইয়াও স্বামীকে রুষ্টবাক্য বলেন না। তাঁহাদের ক্ষমাগুণ জগতের অনুকরণীয়।



জাপানী রমণী প্রচণ্ড শীতের দিনেও অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহকার্য সারিয়া, সামান্য আহার করিয়া, শিশু-সন্তানটিকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফ্যাক্টারিতে কার্য্য করিতে যায়। সেখানে শ্রমে ও সাধ্যে, কৌশলে ও নৈপুণ্যে পুরুষ

শ্রমজীবিগণকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করে, দিবাবসানে স্মিত-মুখে গৃহে ফিরিয়া স্বামিসেবায় আত্মনিয়োগ করে ; আবার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে দীর্ঘ রাত্র জাগিয়া স্বামীর ক্লিষ্ট মস্তকে ব্যজন করে। জাপানের পুরুষ ও রমণীর পরিচ্ছদ প্রায় একই রকমের। স্ত্রীলোকের কিমোনোর হাতার একটু কাটা, পুরুষদিগের একটু ঝুলন আছে, স্ত্রীলোকের কোমরে রেশ-মের বুনা একটু মূল্যবান্ কোমরবন্ধ প্রায়ই নিজেদের প্রস্তুত। পুরুষদের কোমরে পাতলা চাদর, ইহাই পার্থক্য। জাপানী রমণীরা হাত ও গলা কাটা সুচিকণ নাইট গাউন পরিয়া ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি নিমীলিত করিয়া, ছোট উঁচু গাল ভরিয়া হাসিয়া হাসিয়া, যখন সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া পড়েন, কেশরাশি এলাইয়া দেন, আগুল্ফ-লম্বিত কেশরাশি খর্ব্বাকৃতি জাপানী রমণীদিগের পাদমূল চুম্বন করে, সে শোভা অতীব মনোরম। জাপানী রমণী বড়ই পুষ্পপ্রিয়। গৃহপ্রাঙ্গণ আলো করিয়া বিবিধ আভাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পরাশিশোভিত ক্ষুদ্রোদ্যান জাপানী রমণীর বিচিত্র পারিপাট্যের নিদর্শন। বসন্ত-উৎসবে রমণীগণ ফুলসাজে সাজিয়া, ফুলের হাসি হাসিয়া, ফুল-সৌরভে মদিরার নেশার মত বিহ্বল হইয়া যখন ঢলিয়া ঢলিয়া নাচিতে থাকেন, সে চিত্র বড়ই সুন্দর !

মৃত্যুতে জাপান-রমণী কাতরা হন না। শিশু-সন্তানের মৃত্যুতে জননী অধীরা হয়েন না। কিছুমাত্র শোক প্রকাশ না করিয়া, চির-বিদায়ের সমারোহ-সমাধির ব্যবস্থা স্মিতমুখে করেন। অকস্মাৎ বিপৎপাতে জাপান-রমণী অবিচলিত। তাঁহাদের মুখের প্রফুল্লতা কিছুতেই দূর হয় না। কত জন্মজন্মান্তর সাধনায় তাঁহারা যে এই ঐশী শক্তি লাভ করিয়াছেন, বলিতে



পারি না। সেবা-ধর্ম্মে জাপ-রমণী অদ্বিতীয়া। এমন অতিথি-বাৎসল্য আর কোন দেশে নাই। জাপানের হাঁসপাতাল-সমূহে ধনবতী যুবতীগণ স্বেচ্ছায় রোগিসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সাধ্যমত প্রয়াসে রোগীর মনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করেন।

মিতব্যয়িতায় ও গৃহকার্য্য-নৈপুণ্যে জাপ-রমণীর তুলনা নাই। গৃহখানিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া, মাজিয়া ঘষিয়া, রূপ তুলিয়া—বিচিত্রবর্ণ কাগজাদি মারিয়া একখানি নূতনত্বপূর্ণ অপূর্ব্ব চিত্রিত ছবি করিয়া রাখে। আর গৃহের প্রত্যেক আবর্জ্জনা, এমন কি, ছিন্ন কেশটিকে পর্য্যন্ত অতি যত্নে গুছাইয়া নানারূপে সদ্‌ব্যবহার করে। এই মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-রূপিণী রমণীগণের যত্নে স্বামী অর্থকষ্ট বুঝিতে পারেন না—গৃহে চির-শান্তি ও সদা হাস্য-তরঙ্গের পরিমল-প্রবাহ ছুটিতে থাকে। অথচ ইহাদের দেশের বিবাহ-পদ্ধতি আমাদের মত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নহে।

জাপ-রমণীর পরিচ্ছন্নতা ও পরিচ্ছন্নতার রুচি সমধিক প্রশংসনীয়—কিন্তু তাহাতে বিলাস-লালসা নাই।

জাপান-রমণীদের একটি রীতি আমাদের চোখে দূষণীয়। জাপান-রমণীরা পুরুষের সহিত একই স্নানাগারে এবং স্থানবিশেষে একই টবে বা চৌবাচ্ছায় বিবস্ত্রাবস্থায় স্নান করেন। এই স্নানাগারে বিভিন্নশ্রেণীর লোক-সমাগম হয়। আজকাল শিক্ষালোকে সামান্য স্বাতন্ত্র্য হইয়াছে বটে, তথাপি নগ্নস্নানের সময়েও পুরুষেরা যুবতী পরিচারিকার সাহায্য লাভ করেন। জাপ-রমণীরা তৈল-ভক্ষণ ও মর্দ্দন অত্যন্ত ঘৃণিত মনে করেন,



কিন্তু কেশের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের জন্য সুগন্ধি তৈল, এমন কি, কাঁচা ডিম পর্য্যন্ত ব্যবহারেও ঘৃণা বোধ করেন না।

অনেকের মতে জাপ-রমণী অত্যন্ত স্বার্থপর; কিন্তু আমি সে সদাহাস্য-ময় কর্ম্মরত বদনে স্বার্থপরতার কঠোর রেখা অন্য জাতি অপেক্ষা বিশেষভাবে প্রকটিত দেখি নাই;—তবে দৃঢ়চিত্ততার বিচিত্রবিকাশ দেখিয়াছি।

আজ জাপান যে জগতের সোৎসুক চক্ষুর সম্মুখে কর্ম্মের—লক্ষ্যের—ত্যাগের—ঐক্যের—প্রতিভার সুবর্ণ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তাহা কেবল মূর্ত্তিমতী ধৈর্য্যশালিনী জাপ-রমণীর আদর্শ-চরিত্রে।

সৌন্দর্য্য।

বন্দি তোমায় সর্ব্বজয়ী
কবির চক্ষু মোদের দাও।
তোমার ভিতর যাহা আছে
মোদের তাহা দেখিয়ে দাও।
গোপন তোমার আবরণটি
বারেক তুমি সরিয়ে দাও।

বিশ্বপতি



নবম লহরী

চিত্রণ



কবি—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

নারী

তোমারে কি দিব নারী আমি চিরঋণী,
কাঙ্গাল সর্ব্বস্বহারা নিত্য নিঃসম্বল ;
দেবী তুমি, রাণী তুমি, আমি ভাল চিনি—
অজস্র রতনে পূর্ণ তোমার অঞ্চল !
হেরিনু বিশ্বের আলো তোমারি অঙ্কেতে,
প্রফুল্ল তরুণ আঁখি বিস্ময়-বিহ্বল !
তুমি স্নেহ মোহ-হাস্যে, অঙ্গুলি-সঙ্কেতে
আনন্দ সৌন্দর্য্যরাজ্যে খুলিলে অর্গল।
তব প্রেমরশ্মি-জালে ফুল্ল এ হৃদয় ;
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, প্রেমে, পুণ্যে তুমি উদ্ভাসিতা,
নিত্য নব অস্ত তব, নিত্য নবোদয়,
প্রেমের প্রণব তুমি—সৌন্দর্য্যের গীতা।
বন্দী করি রাখ তুমি ঋণী-অপরাধী,
তোমার মহিমা-মাঝে লভুক সমাধি।



লেখক—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

রূপ-সাধনা

বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, আর জয়দেব, ইহাঁরাই বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবিকুল গুরুগণের অগ্রণী। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাঁদের পদাবলী অবলম্বন করিয়া গভীর ভক্তিরস সম্ভোগ করিতেন। পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাগণ ইহাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই আপন আপন ললিত পদাবলী রচনা করিয়াছেন। এই তিন জনই মাধুর্য্য-রসের উপাসক ছিলেন, মাধুর্য্যের বর্ণনাতেই ইহাঁরা সিদ্ধহস্ত। আর এই তিন জনের রস-সাধনই একান্ত বস্তুতন্ত্র হইল। বিদ্যাপতি শিবসিংহ নৃপতির সভাকবি ছিলেন। আর শিবসিংহ-ভূপতির পত্নী লছমী দেবী বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রেমার আশ্রয় ছিলেন। এরূপ

কিংবদন্তী আছে যে, লছমী দেবীকে না দেখিতে পাইলে বিদ্যাপতি ঠাকু-রের কবিতার স্ফুরণ হইত না। লছমী দেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতি ঠাকুরের কেবলমাত্র চাক্ষুষ সম্বন্ধই ছিল। উভয়ের মধ্যে কখনও কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত হইত কি না সন্দেহ। বিয়োত্রিস্ যেমন ইতালীয় কবি দান্তের কবিপ্রতিভার প্রেরণা ও আশ্রয় ছিলেন, লছমী দেবীও কতকটা সেইরূপ বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রেমার আশ্রয় হইয়াছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই কোনও শারীরিক সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু এই লছমী দেবীকেই বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁর ভজনায় শ্রীরাধিকার বিগ্রহ করিয়াছিলেন। আর ইহাঁকে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়াই, বিদ্যাপতি ঠাকুর কখনও বা কৃষ্ণ-সখা সুবলাদির, কখনও বা রাধা-সখী ললিতা-বিশাখাদির ভাবভাবিত হইয়া, আপনি কামগন্ধশূন্য হইয়া তাঁর মধুর পদাবলী রচনা করিয়াছেন। চক্ষু রূপের বাহিরটাই বেশী দেখে। আর যেখানে রূপ কেবল চক্ষুকেই তৃপ্ত করে, সর্ব্বাঙ্গকে সাক্ষাৎভাবে অধিকার করিবার অবসর পায় না, সেখানে প্রণয়ীর লোভের আবেগটা সম্ভোগের গভীরতা অপেক্ষা সর্ব্বদাই বেশী থাকে। দর্শনটা প্রত্যক্ষ, সম্ভোগটা এখানে কল্পিত, কল্পিত সম্ভোগে একটা ভাবুকতাও জাগে, একটা idealismও ফোটে, যাহা কখনও কখনও সাক্ষাৎ সম্ভোগে ফুটিয়া উঠে না। বিশিষ্টকে সার্ব্বভৌমিক করিয়া তোলাই কল্পনার ধর্ম্ম। কল্পনা যেখানে বস্তুতন্ত্র হয়, সেখানে এই সার্ব্বভৌমিকতাটা লাভ করে বটে, কিন্তু যেখানে বস্তু-আশ্রয় ক্ষীণ কিংবা একেবারেই নাই, সেখানে এই সার্ব্বভৌমিকতাটার ভাবোচ্ছ্বাস বেশী হইতে পারে। বিদ্যাপতি ঠাকুরের কবিতায় এটিও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এই জন্য

সৌন্দর্য্য

বিদ্যাপতির রমণীরূপের চিত্র একই সঙ্গে নিতান্ত দেহাশ্রিত, অন্য দিকে এই রূপের সম্ভোগোচ্ছ্বাসটা অত্যন্ত তীব্র বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ রূপ বস্তুটাই দেহাশ্রিত। নিরাকারের রূপ সম্ভবে না। আর প্রত্যেক বস্তু যখন আপনার পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখনই তার শ্রেষ্ঠতম রূপ ফুটিয়া উঠে। এই সংসারটা যেন একটা বিচিত্র চিত্রপট। বিধাতা পুরুষ নিজ হাতে আপনার মনের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভাবনা করিয়া, সেই ভাবনাটাকেই নানা ভাবে, কোথাও বা আংশিকরূপে, কোথাও বা পূর্ণতর, কোথাও বা পূর্ণতমরূপে অঙ্কিত করিতেছেন। চিত্রকরের মনোগত সৌন্দর্য্যের ছবি যেমন তাঁর চিত্রে ফুটিয়া উঠে, বিধাতা পুরুষের মনোগত বিশ্বছবি সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডপটে ফুটিয়া উঠিতেছে। যে বস্তুতে ঐ ছবি সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাই তত সুন্দর হইয়া থাকে। মানুষের রূপও তাই। বিধাতা মনে মনে মানুষের যে ছবি ভাবিয়া রাখিয়াছেন, সেটি যে পাত্রে যেমন পরিস্ফুট হয়, সেইটি তেমন সুন্দর হইয়া থাকে। রমণীর রূপ তিনি তিলে তিলে এইরূপ গড়িয়া তোলেন। চক্ষু দিয়াই দেখি বটে; কিন্তু বিধাতা স্বয়ং তাঁর অন্তরে তাঁর নিজের রসাস্বাদনের জন্য যে নিত্য রূপটি ফুটিয়া আছে, তারই ছায়ার ছায়ার ছায়া অতি ক্ষীণভাবে নারীদেহে ফুটিয়া উঠিয়া, সেই দেহকে এমন সুন্দর করে। এই জন্য রূপের যেমন একটা দেহাশ্রয় সর্ব্বদাই থাকে, সেইরূপ আবার তার মধ্যে সর্ব্বদাই দেহের অতীতও একটা শুদ্ধ আনন্দ-রস জাগিয়া রহে। এই যে দেহাশ্রিত অথচ দেহাতীত আনন্দ-রস, তাহাকেই আমরা লাবণ্য বলিয়া থাকি। এই লাবণ্য-বস্তু আকাশে বা শূন্যে থাকে



না, দেহেরই মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটা নিগূঢ় সঙ্কেতের ভিতর দিয়াই এ বস্তু উছলিয়া পড়ে, অথচ প্রকৃত পক্ষে দেহের পরীক্ষা বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপ করিয়া, তার কোনও প্রকারের কালি করিয়া কেহ কোনও দিন এ বস্তুকে ধরিতে পারে না। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রে এই লাবণ্যই শ্রীরাধিকার অঙ্গের মুখ্য উপকরণ, বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলী পড়িয়া, মনে হয় যে, যদিও তাঁরা শ্রীমতীর অঙ্গ-গৌরবের বিস্তর বর্ণনা করিতেছেন সত্য, কিন্তু মূল বস্তু এখানে ঐ "লাবণ্য," এই রক্ত-মাংস নহে। রাধার দেহ, ফলতঃ প্রাকৃত রমণীর মত কেবল রক্তমাংসের বস্তু নহে।

প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেম-বিভাবিত।
রাধা প্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন॥
তাহে সুগন্ধ দেহ, উজ্জ্বল বরণ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ লজ্জা-শ্যাম-পট্ট শাটী পরিধান॥
কৃষ্ণ অনুরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী, প্রণয় চন্দন।
স্মিতকান্তি কর্পূর,তিল অঙ্গে বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর॥



প্রচ্ছন্নমান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস।
ধীরাধীরত্বগুণ অঙ্গে পট্টবাস ॥
রাগ তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব-ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥
সৌভাগ্যতিলক চারু-ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্ত্য রত্ন হৃদয়ের তরল ॥
নিজাঙ্গসৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক।
তাতে যদি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ-সঙ্গ ॥
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ অবতংস কানে।
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ প্রবাহ প্রাণে ॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ-প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ-পূর্ণ কলেবর ॥

এই যে ভাবলীলার আশ্রয় বস্তু, তাহাকেই বৈষ্ণব মহাজনগণ শ্রীরাধা বলিয়া জানিতেন। ধ্যানযোগে, যথাসাধ্য এই বস্তুর সাক্ষাৎকার পাইয়াই, তাঁরা আপন আপন পদাবলীতে তারই যথাসম্ভব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।



ভক্তিমতী।



এই যে রূপ, ইহা কেবল চক্ষে দেখা যায় না ; চক্ষু যে রূপ প্রত্যক্ষ করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া এই রূপ কবি ও সাধকের চিত্তেই ফুটিয়া উঠে। বিদ্যাপতি ঠাকুর যে শ্রীমতীর রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, এই জন্য তাহা একই সঙ্গে চাক্ষুষ ও অচাক্ষুষ। এই রূপের চাক্ষুষ উদ্দীপনা তিনি লছমী দেবী হইতেই পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁর চিত্তে যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা লছমী দেবীর ঐ রূপকে অনন্তগুণে ছাড়াইয়া গিয়াছিল ও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীরাধার রূপের নিজস্ব প্রকৃতিটি যে কি, তাহা ঠাকুর মহাশয় তাঁর "রাধা-বন্দনা"তে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই বিদ্যাপতির রমণীরূপের মূল আদর্শ ও কষ্টিপাথর।

দেখ দেখ রাধা-রূপ অপার।
অপরূপ কে বিহি আনি মিলাওল
খিতিতলে নবনি সার॥
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ মুরছায়ত
হেরয় পড়ই অধীর।
মনমথ কোটি মথন করু যে জন
সে হেরি মহী মাহ গীর॥
কত কত লখমী চরণতলে নেউছয়
রঙ্গিণি হেরি বিভোরি।
করু অভিলাষ মনহি পদপঙ্কজ
অহোনিশ কোরে আগোরি॥



রমণীরূপ বিদ্যাপতি ঠাকুর কি চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এই পদে তার সন্ধান পাওয়া যায়। অন্যত্র তিনি শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের চক্ষে দেখিয়াছেন, বা তাঁহার সখীদের চক্ষে দেখিয়াছেন, যে সকল স্থলে কৃষ্ণের মাধুর্য্য বা সখীদের সখ্য সে রূপকে আপনার রঙে সাজাইয়াছে। কিন্তু এখানে কবি নিজের চক্ষে এই রূপ দেখিয়াছেন। অথচ এ চক্ষু কেবল তাঁর নিজেরও নহে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয়ে যে রূপ-পিয়াসা জাগিয়া আছে, সকল মানুষ রূপে রূপে যে বস্তুটিকে খোঁজে, বিদ্যাপতি রাধা-বন্দনায় সেই নিখিল বিশ্বের বাসনার বস্তুটিকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ "উর্ব্বশী" নামক কবিতায়,

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী

বলিয়া যে আদর্শ বা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, যে রূপকে সম্বোধন করিয়া, সর্ব্বশেষে তিনি বলিয়াছেন,—

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উর্ব্বশী
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী!
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর কালিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিরসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার,
অতি লঘুভার
অখিল মানস-স্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী
হে স্বপ্নসঙ্গিনি!



সেই বস্তুকেই বিদ্যাপতি ঠাকুর এই রাধার বন্দনায় আঁকিতে চাহিয়াছেন। যতদিন বিদ্যাপতির এই "রাধার বন্দনটি" চক্ষে পড়ে নাই, ততদিন ভাবিতাম, রমণীরূপের যে ছবি 'উর্ব্বশী'তে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন, তার চাইতে বুঝি শ্রেষ্ঠতর কোনও কিছু নাই। কিন্তু বিদ্যাপতির "রাধার বন্দনা"র নিকট রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী কতই হাল্‌কা, কতই ছায়াময়ী বলিয়া ঠেকে। বিদ্যাপতির রাধার রূপও মানস-বস্তু বটে; কিন্তু মানস-বস্তু হইয়াও তাহা শূন্যগর্ভ নয়, কেবল কল্পনাময় নয়, তাহাতে আমাদের সকল অঙ্গকে ছুঁইয়া, ধরিয়া মাড়িয়া, নিংড়াইয়া, তার সারটুকু বাহির করিয়া ঐ ধ্যানগম্য ধ্যানলভ্য বস্তুর মধ্যে মিশাইয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী পড়িয়া শরীর-মন-প্রাণ-হৃদয়-আত্মা, সকল নড়িয়া চড়িয়া উঠে না। কিন্তু বিদ্যাপতির এই "রাধা-বন্দনা" পড়িয়া আমাদেরো, পদকর্ত্তার সঙ্গে সাধ যায়

—মনহি পদপঙ্কজ
অহোনিশ কোরে আগোরি।

মনের মর্ম্মে ঐ পদপঙ্কজ দিবানিশি ক্ষেরে জড়াইয়া রাখি।

অথচ এ রূপ-বর্ণনাতে রক্ত-মাংসের কথা কিছুই নাই। জগতের সকল লাবণ্যের সার মিলাইয়া কোন্ বিধি এই অপরূপ রূপের সৃষ্টি করিয়াছে? এ রূপের প্রতি অঙ্গ দেখিয়া অনঙ্গ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এখানে অনঙ্গ শব্দের তাৎপর্য্য অতি নিগূঢ়। অনঙ্গ শব্দে মোটামোটি লোকে কামই বুঝিয়া থাকে। কামের কোনও অঙ্গ নাই, কিন্তু আমাদের অঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই কাম আপনাকে তৃপ্ত করিতে চাহে। কিন্তু রাধার অঙ্গ

এমনি অপরূপ যে, অঙ্গ দিয়া তাহাকে ধরা যায় না, অঙ্গ তার লাগাইল যে পায় না ; সে প্রয়াসে নিষ্ফল হইয়া, কাম আপনার কামনাতেই কাতর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, যিনি আপনার অদ্ভুত ও অলৌকিক আকর্ষিণী শক্তিতে মন্মথকে পর্য্যন্ত মথন করেন, সেই যে সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যাকর শ্রীভগবান্, তিনি পর্য্যন্ত এই রূপ দেখিয়া ধরণীমধ্যে পতিত হন। ঐ রূপলোভেই তিনি এই নিখিল বিশ্বের রূপে আপনার রূপকে ঢালিয়া দেন। কত কত লক্ষ্মী সমান শোভা ও ঐশ্বর্য্যের আধার বলিয়া যাঁহাকে শ্রী বলে, তারা পর্য্যন্ত এই রঙ্গিণী শ্রীরাধাকে দেখিয়া বিভোর হইয়া তাঁর চরণতলে নির্ম্মঞ্ছিত হইয়া রহে। এমন অপরূপ রূপের আধার যে শ্রীরাধিকা, তাঁর পদপঙ্কজযুগল দিবানিশি আপনার সর্ব্বাঙ্গ ও সর্ব্বহৃদয় দিয়া কোলে আগলাইয়া রাখিবার বাসনা কার না হয় ?

এই বিশ্ব কলকাঠীটি বাসনার হাতে করিয়াই কেবল বিদ্যাপতি ঠাকু-রের নহে, সমুদয় বৈষ্ণবকবিকুলগুরুজনের রমণীরূপের মর্ম্মটি উদ্‌ঘাটিত করিতে যাইতে হয়।

ফলতঃ বিদ্যাপতির প্রায় প্রতি পদেই এই অঙ্গ ও অনঙ্গের, এই দেখা ও না দেখার, এই ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের, এই সত্য ও কল্পনার অপূর্ব্ব মিশামিশি দেখিতে পাই। শ্রীরাধার সাক্ষাৎ দর্শনে মাধব কহিতেছেন—

আজ দেখল জত কে পতিয়া এত
অপরুব বিহি নিরমাণ রে।



বিধাতা কি যে অপরূপ রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম, কিন্তু তার কথা বলিলে কেই বা বিশ্বাস করিবে,

কামিনী কোলে গঢ়লী
রূপ সরূপ মোহি কহইতে অসম্ভব
লোচন লাগি রহলী।

এই কামিনীকে কে গড়িল? তার রূপের স্বরূপ-কথা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব, কারণ, (আমার দেখাই শেষ হইল না), চক্ষু তাহাতে লাগিয়াই আছে।

বিদ্যাপতি যদিও বাহির হইতেই যেন শ্রীমতীর রূপের বর্ণনা করিতেছেন এবং তারই জন্য এই বর্ণনার মধ্যে এমনভাবে অঙ্গ-অনঙ্গে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে বলিয়া, এই সকল রূপ-চিত্রে শারীরিক অপেক্ষা অধ্যাত্মিক রসই বেশী ফুটিয়া উঠে, তথাপি তিনি যে সকল অঙ্গশোভা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বত্রই অত্যন্ত বস্তু-তন্ত্র হইয়াছে। কিন্তু যে সকল স্থলে আধুনিক রুচি একটু শিহরিয়া উঠে, সে সকল স্থলেও প্রকৃত পক্ষে হিন্দুর অন্তরে, কোনও কামোদ্দীপনার আশঙ্কা নাই বলিলেও চলে। আমাদের দেশের কি সংস্কৃত, কি বাংলা সকল কবিতাতেই রমণীরূপের বর্ণনায় "পীন পয়োধর" ও "গুরু নিতম্বের" কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই দুইটিই রমণীরূপের নিজস্ব বস্তু, বিশিষ্ট বিশেষত্ব, এই কথাও তো অস্বীকার করা যায় না। রমণীর পূর্ণতা জননীতে। বিধাতা সন্তানধারণের জন্য রমণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতেই রমণীর সার্থকতা। আর "পীন পয়োধর" ও "গুরু নিতম্ব" রমণীর এই সন্তানধারণের ক্ষমতাটাই

বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যার যেটি বিশিষ্টতা, যার জন্ম যে বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সৃষ্টি-প্রয়োজনেই তার দেহাদিও গঠিত হইয়াছে। আর ঐ সকল প্রয়োজনসাধন যেমন তার জীবনের লক্ষ্য ও তাহাতেই তার জীবনের সার্থকতা, সেইরূপ ঐ লক্ষ্য সাধনোপযোগী অঙ্গ-গঠনেই তার শ্রেষ্ঠতম রূপেরও বিকাশ হইয়া থাকে। এই জন্যই পয়োধর আর নিতম্ব রমণীরূপের সার ও বিশেষ উপাদান। আমাদের আধুনিক রুচি রমণীর রমণীত্ব, মায়ের মাতৃত্ব যাহাতে, তাহাকেই অশ্লীল বলিয়া চাপিয়া রাখিয়া, রমণীর যে সকল অঙ্গমাধুরী কেবল অনঙ্গসম্পর্কেই মধুর হয়, তার চক্ষের চাহনি, রঙের বাহার, নাসিকার গঠন, কেশের গৌরব, এ সকলকেই রমণীরূপ-বর্ণনায় বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলি। এ দেশের প্রাচীন কবিগণ তাহা করেন নাই। অথচ পয়োধরের বর্ণনায় যে তাঁরা তাঁদের পাঠকের চিত্তে কখনও হীনভাবের উদ্রেক করিতেন, এমনও মনে হয় না। বিদ্যাপতি প্রায় সর্ব্বদাই শ্রীরাধার রূপবর্ণনায় পীন পয়োধর-শোভার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই দেখি যে, প্রায় সর্ব্বদাই তিনি ঐ পয়োধরের সঙ্গে সঙ্গে "সীম গজমতিহার" যুক্ত করিয়া নানা ভাবে সুরধুনী-ধারার সঙ্গে তার উপমা করিয়াছেন এবং এই রূপে যাহা সহজেই প্রাকৃত জনের কামোদ্রেক করিয়া থাকে, তাহাতেও পবিত্র ও বিশুদ্ধভাব জাগাইতে চাহিয়াছেন।

সজনি অপরূপ পেখলু রামা
কনক-লতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণীহীন হেম-ধামা॥



নয়ন-নলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই
ভাঙ বিভঙ্গি বিলাস।
চকিতে চকোর জোর বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ॥
গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিত
গীম গজমোতিম হারা।
কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনীধারা॥
পয়সি প্রয়াগে জাগয়ত জাগই
সো পাওয়ে বহু ভাগী।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল-নায়ক
গোপীজন-অনুরাগী॥

অপরূপ পেখল আই।
কনক-গিরি অবৈধ মুখে
চাঁদকে গরাসে জাই॥
অন্তর পেখল কুচযুগ-মাঝে
লোলিত মোতিম-হারে।
কনক-মহেশ কামহি পূজল
জানি সুরনদীধারে॥



আর একটি পদে মাধব রাধার রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন ;—

অধর সুশোভিত বদন সুছন্দ।
মধুরী কুশহ হু হু অরবিন্দ॥
তহু তুঁহু সুললিত নয়ন সামরা।
বিমল কমলদল বইসল ভমরা॥
বিশোখি না দেখবি এ নিরমণি রমণী।
সুরপুর সঞো চলি আইলি গজগমনী॥
গিম সঞো লাবল মুকুতা হারে।
কুচযুগ চকোর চরই গঙ্গাধারে॥

সখীতে সখীতে যখন পরস্পরের নিকটে শ্রীমতীর রূপ-বর্ণনা করিতেছেন, তখনও এ সকল দেহ-লাবণ্যের বর্ণনাতে সর্ব্বদাই একটা পূজার ভাব জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অথবা চেষ্টা করিয়াছেন বলাও বিহিত নহে, স্বাভাবিক ভাবেই এ সকল কবিতায় আপন আপন অন্তরের বিশুদ্ধ-রতিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সখীর প্রতি উক্তি যথা—

ধনি মুখমণ্ডল চান্দ বিরাজিত
লোচন খঞ্জন ভাঁতি।
মদন-চাপ জিনি ভোঁহ লগযুগ
দশনহি মোতিম পাঁতি॥
সখি হের রমণ-মোহিনী রাই।
কত কত বিদগধ হেরিতেছি মুরছিত
মদন পরাভব পাই॥



কনক-বিরোচি মণিহার বিলম্বিত
অধরহি বিম্বু অতোরা।
নব উরচ পর মোতি বিরোচিত
সুমেরু সুরসারিধারা॥

শ্রীরাধিকাকে স্নানকালে দর্শন করিয়া মাধব তাঁহার যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও এই দৈব-সম্পর্কটা নষ্ট হয় নাই।

কামিনি কর এ সনানে
হেরিতহি হৃদঅ হনএ পঁচবাণে।
চিকুর গরঐ জলধারা।
জান মুখশশী ডরে রোঅএ মন্দারা॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিঅ কুল মিলত আনি কোনে দেবা॥
তেঁ সঙ্কাএে ভুষা পাসে।
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত আকাসে॥

এই স্নানকালে দর্শনেরই আরো সুমধুর বর্ণনা আছে।

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা
কামিনি পেখল সনানক বেলা।
চিকুর গলয় বালধারা
সেহ বরিস জান মোতিম হারা॥

অন্যত্র আছে—

কেশ নিঙ্গারইত বহু জলধারা।
চামরে গলয় জানি মোতিম হারা॥



অলকহি তীতাল তহিঁ অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নীরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূরে মণ্ডিত জনি পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর রহ পয়োধর সীমা।
কনক বেল জনি পড়ি গেল হীমা॥
ও নুকি করতহি চাহে কিয় দেহা।
অবহি ছোড়ব মোহি তেজব নেহা॥
ঐসন রস নহি পাওব আরা।
ইথে লাগি রোই গলয় জলধারা॥

বিদ্যাপতির রমণীরূপ-বর্ণনায় একদিকে যেমন এই রূপের বাহিরটাই বেশী দেখিতে পাই, সেই প্রকার ইহাতে প্রাচীন ও মানুষী উপমারও অত্যন্ত বাহুল্য দেখি। এই জন্য বিদ্যাপতির এ সকল কবিতায় একজাতীয় কবিত্বের উচ্ছ্বাস যতটা অনুভব করিতে পারা যায়, সে পরিমাণে তাহা প্রকৃত পক্ষে মর্ম্মস্পর্শী হয় না। এ বিষয়ে বিদ্যাপতির সঙ্গে চণ্ডিদাসের একটা বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।

লছমী দেবী যেমন বিদ্যাপতির প্রেমার প্রত্যক্ষ আশ্রয়, রজকিনী রামী রামমণি সেইরূপ চণ্ডিদাসের প্রেমের আশ্রয় ছিলেন। লছমী দেবীর সঙ্গে বিদ্যাপতির কেবল চক্ষের সম্বন্ধ ছিল; রামমণির সঙ্গে চণ্ডিদাসের পরিপূর্ণ নায়কনায়িকার সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। রামমণি চণ্ডিদাসের সাধনের প্রত্যক্ষ অবলম্বন ছিলেন। এই জন্য চণ্ডিদাসের প্রেম কেবল



চক্ষের সম্বন্ধেই আবদ্ধ ছিল না, সকল দেহকে আশ্রয় করিয়া সেই দেহকে ছাড়াইয়া বিশুদ্ধ রসবাষ্পে যাইয়া পৌঁছাইয়াছিল। এই কারণে চণ্ডিদাসের শ্রীমতীর রূপের বর্ণনায় এমন একটা সম্পূর্ণ সত্য ও অসাধারণ প্রাণতা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা বিদ্যাপতির পদাবলীতে মিলে না। বিদ্যাপতির শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনা পড়িলেই মনে হয়, যেন কেতাবের বাঁধা বুলিগুলি সম্পূর্ণ কলাকুশলতা সহকারে গাঁথিয়া গাঁথিয়া এই ছবিটি রচনা করিয়াছেন; আর চণ্ডিদাসের রূপ-বর্ণনা পড়িলেই বুঝি যে, এটা ধার করা নয়, কবির প্রাণের ভিতরকার বস্তু।

তড়িত-বরণী হরিণ-নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা-মাঝে।
কিবা বা দিঞা অমিয়া ছানিয়া
গড়িল কোন বা রাজে॥

সই কি সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে
বড়ই রসের কূপ।

সোনার কটোরি কুচযুগ গিরি
কনক-মন্দির লাগে।
তাহার উপরে চূড়াটি বসালে
সে আর অধিক ভাগে॥



কে এমন কারিগর বসাইল ঘর
দেখিতে নারিনু তারে।
দেখিতে পাইতুঁ শিরোপা করিতুঁ
এমতি মন যে করে॥
হৃদয়ে আছিল, বেকত হইল
দেখিতে পাইনু সে।
ঐছন মন্দিরে শয়ন করে যে
সে মেনে নাগর কে॥
হিয়ার মালা যৌবনের ডালা
পসারী পসারল যেন।
চাকুতে কাটিয়া, চাক সে করিয়া
তাহাতে বসাইল হেন॥

অধর-সুধা পড়িছে জুদা
দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয় এমতি করয়
তাহাতে যাইয়া পশি॥

অন্যত্র—

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী,
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
তথাহি উদয় ভেল॥



সই জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিণ ঘন সে চাহনি
গলে সে মোতিমহারি॥

অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন
কামন ঝাঁপয়ে তাই॥

মনের সহিতে সরম কৌতুকে
সখীর কান্দেতে বাহে।
হাসির চাহনি: দেখাল কামিনী
পরাণ হারানু তাহে॥

চলন ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী
চাপটিল জীবন মোর।
অঙ্গুলীর আগে, চাঁদ যে ঝলকে
পড়িছে উছলি জোর॥

চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়ে
বিঁধিলে বাণ যে মোর॥



অন্যত্র—

বেলি অবসানে দেখিনু ভালে
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন-যুগল
চিনিতে নারিনু কে॥
সই রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা, বসন-শোভা
পাসরিতে নারি তারে॥

* * * *

নীল শাড়ী মোহনকারী
উছলিছে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সোঁপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ॥

আর একটি পদে—

চম্পক-বরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র বেণী দুলিছে ফণী
কাঁপিলা চামর পারা॥
সঙ্গে যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগত-মোহিনী হরিণনয়নী
ভানুর ঝিয়ারি বটে॥



হিয়া জরজর খসিল পাঁজর
এমতি করিল বটে।
চলল কামিনী বঙ্কিম চাহনি
বিঁধিল পরাণ তটে॥
না পাই সমাধি কি হইল বেয়াধি
মরম কহিব কারে।
চণ্ডিদাস কয় ব্যাধি সমাধি হয়
পাইবে যবে তারে॥

বিদ্যাপতি স্নানকালে রাধার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। চণ্ডিদাসও করিয়াছেন, কিন্তু দু'এতে কি প্রভেদ!

সজনি ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা গৌরী নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন কৈরাছে আসন
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচমূলে হেমহার দোলে
সুমেরু-শিখর জানি॥



সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব-তটিতে
পড়েছে চিকুররাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি॥

* * * *

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ দহিতে মোর।

এই শেষ পদের তুলনা কোথাও মিলে না। বিদ্যাপতি শ্রীমতীর সদ্য-স্নাতরূপ যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি বেশ আছে। আর সে অভিজ্ঞতার সঙ্গে নানা উপমাযোগে একটা কবি-কল্পনাও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চণ্ডিদাসের এ অভিজ্ঞতাটি সাধারণ নহে, বিশিষ্ট। তিনি স্বচক্ষে এরূপ দেখিয়াছেন, দশজনে যেমন দেখে. তেমন ভাবে নহে। এ একটি বিশিষ্ট রমণীকে বিশিষ্ট ভাবে, বিশেষ কালে, বিশেষ অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়া তার বর্ণনা করিয়াছেন, এইজন্য এইটি অত্যন্ত বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, আর ভাবের আবেগ, রসের উচ্ছ্বাসও এখানে যতটা, বিদ্যাপতিতে তার শতাংশের একাংশও নাই।

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ দহিতে মোর—

বিদ্যাপতির কোথাও এমন মর্ম্মতলস্পর্শী ভাববেগ দেখা যায় না। পরবর্ত্তী—বৈষ্ণব কবিগণ প্রায় সকলেই শ্রীমতীর রূপ-বর্ণনায় বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।



মোটের উপরে বৈষ্ণব কবিদিগের রমণী-রূপের আদর্শে পার্থিব ও অপার্থিব, দেহ ও আত্মা, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে লিখিয়া গিয়া, বিশ্বসাহিত্যে ইহার একটা অপূর্ব্ব বিশিষ্টতার সৃষ্টি করিয়াছে। এ জিনিস, একই সঙ্গে এমন দেহাশ্রিত ও দেহাতীত, আর কোথাও পাওয়া যায় বলিয়া জানি না।



লেখক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

রূপগৌরব

রূপ, রূপ, রূপ! জ্ঞানের উন্মেষ হইতে আজ পর্য্যন্ত কেবল শুনিয়া আসিতেছি, রূপ, রূপ, রূপ! সারা জগৎটা যেন রূপের জন্য পাগল হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ইতিহাসে, দর্শনে, কাব্যে, সাহিত্যে, সর্ব্বত্রই এই রূপের লীলা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই লোকে আগে দেখে তাহার রূপ। বিবাহের পাত্রী দেখিতে গেলে আগে তাহার রূপটাই যাচাই করিয়া লইতে হয়। পাত্রেরও গুণটাই প্রধান দ্রষ্টব্য হইলেও রূপও নিতান্ত উপেক্ষিত হয় না। নববধূ রূপের রাশি লইয়া গৃহে আসিলে অনেক স্থলে তাহার পৈতৃক দারিদ্র্য বা কার্পণ্যদোষ উপেক্ষিত হইয়া থাকে। রূপবতী গৃহিণীর কুটিল ভ্রূকুটি ভীতি বা বিরক্তির পরিবর্ত্তে অনেকেরই মনে যে প্রীতি উৎপাদন করে, ইহা সর্ব্বত্রই বিদিত। সর্ব্বত্রই রূপের জয় জয়কার।



সৌন্দর্য্য

রূপ যে শুধু সাধারণ মানুষকেই পাগল করে, তাহা নহে ; কি কবি, কি দার্শনিক, কি ঐতিহাসিক, সকলেই এই রূপ লইয়া উন্মাদ। এই রূপের স্তুতি করিয়া কবি কখন বিভোর-প্রাণে গাহিতেছেন—

"চিত্তে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।"

কখন বা রূপের প্রভায় উন্মাদ হইয়া বলিতেছেন—

"তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।"

কোন কবি আবার যমুনার 'বিমলতটে রূপের হাটে নীলকান্ত মণিকে' লইয়া কেনাবেচা করিতেছেন। আবার কেহ বা আজীবন রূপের সাধনা করিয়া অবশেষে অতৃপ্তপ্রাণে গাহিতেছেন—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।"

এই তো গেল কবিদের অবস্থা। তার পর দার্শনিক—যাঁহারা এত বড় জগৎটাকেই মায়াময় বলিয়া ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারাও রূপের মোহ হইতে নিস্তার পান নাই। তাঁহারা রূপকে ভূতবিকার, সুতরাং অনিত্য বলিয়া উড়াইয়া দেন, আত্মার অনুসন্ধান করিতে গিয়া রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জাসমন্বিত দেহটাকে ঘাঁটিয়া তন্ন তন্ন করেন, এবং অনিত্য রূপে পরিতৃপ্ত না হইয়া, শেষে 'সত্যং শিবসুন্দরং' বলিয়া নিত্য রূপের স্তুতিগান করেন।

ঐতিহাসিকেরাও বাদ যান না। তাঁহারা ইতিহাসের কঠোর সত্যের



মধ্যেও কোমল রূপকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে ক্ষান্ত হন না। তাঁহারা অতীতের ভগ্নস্তূপের মধ্যে রূপের কত বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করেন, রূপের আগুনে কত দেশ, নগর, জনপদ ভস্মীভূত হইয়াছে; কত বীর, কত ধার্ম্মিক, কত কর্ম্মী পুরুষ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, তাহার বাস্তব চিত্র দেখাইয়া রূপের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

ফল কথা, রূপের ভক্ত সকলেই। রূপে যাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়, সে হয় অন্ধ, অথবা তাহার প্রাণ মরু অপেক্ষা নীরস। অতি বড় নিষ্ঠুর দস্যু যে, রূপের নিকট সেও মস্তক অবনত করে; বড় বড় সংযমী ঋষির সুদৃঢ় সংযমের বাঁধ রূপের প্লাবনে এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যায়।

কেবল মানুষ নহে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি বড় বড় দেবতারাও রূপের মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। ইন্দ্র, চন্দ্র রূপের মোহে যতটা পাগল হইয়াছিলেন, মানুষে ততটা হইতে পারে কি না সন্দেহ। যোগেশ্বর শিব নাকি মোহিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং', সেই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধার পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়াছিলেন।

রূপের যখন এত গৌরব, তখন এই রূপের অধিকারিণী যাঁহারা, তাঁহারা যে রূপের গর্ব্বে মাটীতে পা দিবেন না, ইহাই স্বাভাবিক। বাস্তবিক ঘটিয়াও থাকে তাহাই; রূপসীরা অনেক সময়ে রূপের দেমাকে ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া থাকেন, এবং নাসিকার আকুঞ্চন-প্রসারণে স্বামী মহাশয়কে পর্য্যন্ত তটস্থ করিয়া দেন। কিন্তু আমি বলি, তাঁহাদের এই রূপের গর্ব্ব নিতান্তই অস্বাভাবিক। কেন না, রূপ যদি প্রকৃতপক্ষে

বস্তুগত হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের অহঙ্কার-প্রদর্শনের কতকটা কারণ থাকিতে পারিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রূপ বস্তুগত নহে, দর্শকের মনোগত, রুচিগত। দ্রষ্টার রুচি যাহাকে সুন্দর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে, তাহাই রূপ, অন্যথা রূপের কোনই সার্থকতা নাই। বিজ্ঞান বলে, পতঙ্গের মনোহরণের জন্যই কুসুমের সৌন্দর্য্য-বিস্তার। তেমনই দর্শকের সানুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণেই রূপবতীর রূপের সার্থকতা।

কিন্তু মানুষের অন্যান্য বিষয়ে যতই সাম্য থাক, রুচি-বিষয়ে বিষম বৈষম্য বর্ত্তমান। সকলেরই রুচি ভিন্ন ভিন্ন; দুই জনের রুচি প্রায় এক হইতে দেখা যায় না। এই জন্যই আমার দৃষ্টিতে যাহা সুন্দর, তোমার দৃষ্টিতে তাহা কুৎসিত; আবার তুমি যাহাকে সুন্দর বলিয়া প্রশংসা কর, আমি তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাই না। যে দীর্ঘগ্রীবা নীলনয়নার সৌন্দর্য্যে ইংরাজ যুবক মুগ্ধ, আমরা তাহাকে বিড়ালাক্ষী বলিয়া উপহাস করি। আবার যে ভারতীয় ললনার স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্য আমাদের দৃষ্টিতে 'অমৃত বর্ষণ করে, বিদেশীয়ের নিকট তাহার কোনই মূল্য নাই। যে নৈশপ্রকৃতির স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের লীলা-দর্শনে ভাবুকের চিত্ত বিমুগ্ধ হয়, তাহাই অপরের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়। সুতরাং কেমন করিয়া বলিব, রূপ বস্তুগত এবং তাহা রূপের অধিকারিণীর স্থায়ী সম্পত্তি? যাহা অপরের রুচির উপর নির্ভর করে, তাহার মূল্য কতটুকু? অতএব হে রূপসীবৃন্দ! এই পরপ্রত্যাশিত রূপের গর্ব্বে গর্ব্বিত হওয়া তোমাদের অনুচিত।

তাই বলিয়া রূপের কি কোনই মূল্য নাই? অবশ্যই আছে।



'যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি', সুন্দর আকৃতির মধ্যেই গুণাবলীর বাস। যেখানে রূপ, সেইখানেই গুণ। কিন্তু রূপ বলিতে যাঁহারা কেবল চম্পক-বিনিন্দিত বর্ণই বুঝিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত আমার মতের মিল না হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণবর্ণের মধ্যেও রূপের উজ্জ্বল প্রভা দেখিতে পান, শ্যামাঙ্গীর শ্যাম-বর্ণে সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস দর্শনে বিমুগ্ধ হন, তাঁহারা এ কথাটা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। রূপ কথার কথা নহে ; উহা ঈশ্বরের দান, জন্মান্তরের সুকৃতির ফল। সুতরাং রূপ জিনিসটা ব্যর্থ নহে। প্রকৃত রূপে মোহ আসে না, আনন্দ আসে ; অতৃপ্তি আসে না, তৃপ্তি আসে। রূপ গর্ব্বের বস্তু না হইলেও গৌরবের জিনিস। এই জন্যই জগৎ রূপের স্তাবক, রূপের চরণে অবনতমস্তক। তাই ক্ষণস্থায়ী রূপে তৃপ্তি না পাইয়া বিশ্ব সেই বিশ্বরূপের ধ্যানে আত্মহারা। এই বিশ্বরূপের অংশ রূপের চরণে আমার শত শত নমস্কার।



লেখক—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

রমণীর মন

"O Woman ! in our hours of ease
Uncertain coy and hard to please
And variable as the shade
By the light quivering aspen made ;
When pain and anguish wring the brow
A ministering angel thou !" Scott.

রমণী সংসারের সার, গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রধান অবলম্বন। রমণী ভিন্ন পুরুষ পূর্ণাঙ্গ হয় না। যিনি যত বড় প্রতিভাশালী পুরুষ হউন না কেন, যিনি সংসারযাত্রায় নারীকে জীবনের সঙ্গিনী করেন নাই, তিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। তাই হিন্দুর স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী। সেই জন্যই শাস্ত্রকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—



"পাটিতোঽয়ং দ্বিজাঃ পূর্ব্বমেকদেহঃ স্বয়ম্ভুবা
পতয়োঽর্দ্ধেন চার্দ্ধেন পত্ন্যভূবন্নিতি শ্রুতিঃ
যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।"

"সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা একটি পূর্ণ মানবদেহ গঠিত করিয়া, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করেন; তাহার এক অর্দ্ধে পুরুষ ও অন্য অর্দ্ধে স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা বেদবাক্য। পুরুষ যে পর্য্যন্ত বিবাহ না করে, সে পর্য্যন্ত আধখানা মানুষ থাকে, পূর্ণমানুষ হইতে পারে না।" নারীর দৈহিক শক্তি ও গুণ পুরুষকে পূর্ণতা দিতে পারে না, তাহার মানসিক শক্তিই মানুষকে পূর্ণতা প্রদান করে। আমি নারীজাতির সেই মানসিক শক্তির বৈশিষ্ট্যের কথাই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

নারীজাতি স্বভাবতঃই ভাবময়ী। পুরুষের মানসিক শক্তির সহিত নারীর মানসিক শক্তির বৈষম্য এইখানেই। পুরুষ প্রধানতঃ বুদ্ধিপ্রধান। পুরুষ সকল কাজে লাভলোকসানের জমা-খরচ করে, পরার্থ বাদ দিয়া নিজের স্বার্থের ঘরে কত জমা থাকে, তাহার খতিয়ান করে। যে পুরুষের যেমন বিচারশক্তি, সে তদনুসারে ফলাফল চিন্তা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু নারী তাহা করে না। সংসারে নারী লাভ-লোকসানের জমা-খরচ লইয়া স্বার্থের ঘরে কিছু সঞ্চয় রাখিয়া কাজে প্রবৃত্ত হয় না। ভাবময়ীরা ভাবের দৃষ্টিতে সকল বিষয় দেখিয়া থাকেন, ভাবের প্রবাহে ভাসিয়া সকল কাজ করিয়া বসেন। স্ত্রীজাতিরা ঠিক আমাদের দৃষ্টিতে সকল বিষয় দেখেন না বলিয়া আমরা স্ত্রীলোকদিগকে "বামা" "বামলোচনা" "প্রতীপদর্শিনী" প্রভৃতি বলিয়া থাকি। আসল কথা, আমরা স্বার্থের দৃষ্টিতে



কোন কোন বিষয় যেরূপ দেখি, নারীরা ভাবের দৃষ্টিতে সে সকল বিষয় সেরূপ দেখেন না, তাই এই দৃষ্টিবৈষম্য।

মানুষের ভাব (.Sentiment) অনেক। তবে তাহা সাধারণতঃ দুইটি পর্য্যায়ে পড়িতে পারে, যথা অনুরাগ ও বিরাগ। ভালবাসা, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া, মমতা, মোহ, আত্মম্ভরিতা, বিশ্বাস প্রভৃতি অনুরাগ-পর্য্যায়ভুক্ত বলিলে বিশেষ দোষ হইবে না। বিদ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাব হইতে উদ্ভুত। স্ত্রীদিগের মন সাধারণতঃ উভয় ভাবেই অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই ইংরাজ কবি বলিয়াছেন,—

"Woman's at best a contradiction still."

নারী প্রেমময়ী। প্রেমের প্রভাবে নারী সবই করিতে পারে। প্রেমিককে তাহার অদেয় কিছুই নাই। যে তাহার প্রেমাস্পদের দোষ দেখিতে পায় না,– প্রেম তাহার দয়িতের সকল দোষ ঢাকিয়া লয়। তাই দম্পতির মধ্যে নারী যেরূপ পুরুষকে ভালবাসিতে—প্রাণমন সঁপিয়া ভালবাসিতে পারে, পুরুষ তাহা কখনই পারে না। নারীর প্রেমই পুরুষকে প্রেমিক করে। পুরুষের প্রথম প্রেম প্রায়ই স্বার্থপূর্ণ ও কামগন্ধী হইয়া থাকে, নারীর তাহা হয় না। নারীর ভালবাসা তাহার সর্ব্বস্ব, পুরুষের প্রেম তাহার জীবনের শত ভাবের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র ভাবমাত্র। তাই কবি বাইরণ বলিয়াছেন ;—

"Man's love is of man's life a thing apart.
'T is woman's whole existence."

সৌন্দর্য্য

প্রণয় নারীকে তন্ময় করিয়া তুলে। কৃষ্ণপ্রেমিকা গোপিকারা কৃষ্ণ-বিরহে ত্রিভুবন যেমন কৃষ্ণময় দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রেমময়ী নায়িকা নায়কের অদর্শনে তাঁহার চিন্তাতেই বিভোরা থাকেন, অন্য কিছুই দেখিতে পান না। তাই সাবিত্রী সত্যবানের জন্য যে প্রকার ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, সত্যবান্ সাবিত্রীর জন্য সে প্রকার ত্যাগস্বীকার কখনই করিতে পারিতেন না, পারেন নাই। নল-বিরহে দময়ন্তীর যে দশা হইয়াছিল, দময়ন্তীবিরহে নলের সেরূপ দশা হয় নাই। রাম-বিরহে সীতা একেবারে যেন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সীতা-বিরহী রাম একটা যুদ্ধের কল্পনা ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যুদ্ধে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। এডোনিসের বিরহে ভিনাস, কামের বিরহে রতি কেবল কাঁদিয়া মাটী ভিজাইয়াছিলেন। ইন্দুমতীর বিরহে অজের বিলাপ, শকুন্তলার বিরহে দুষ্মন্তের বিলাপ প্রভৃতির সহিত মন্মথ-বিরহে রতির বিলাপ এবং রামের বিরহে বনবাসিনী সীতার বিলাপ এই উভয়ের পার্থক্য অনেক। প্রেমিক রামচন্দ্র সমাজের হিতার্থ কর্ত্তব্যবোধে জানকীকে বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বিনা অপরাধে বর্জ্জিতা সীতা তাঁহার প্রেমাস্পদের উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া কেবল বলিয়াছিলেন,—

"সাহং তপঃ সূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টি-
রূর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ॥"

"তুমি আমার উপর অবিচার করিয়াছ সত্য, তথাপি জন্মান্তরে



তোমাকেই পতিরূপে পাইবার জন্য আমি কঠোর তপস্যা করিব," এ কথা কোনও পুরুষ তাঁহার স্ত্রীকে বলিতে পারেন না। রামচন্দ্র সীতাবিরহে তুষারবর্ষী সহস্রচন্দ্রের ন্যায় সবাষ্প হইয়াছিলেন, পরে অন্তরের শোক অন্তরে নিগ্রহ করিয়া কর্ত্তব্যপালনে মন দিয়াছিলেন।

তাই বলি, প্রেমই নারীজীবনের সর্ব্বস্ব। যাহা তাহার প্রেমের অনুকূল,—প্রেমাস্পদের অনুকূল—তাহাই তাহার দৃষ্টিতে সুন্দর। যাহা প্রতিকূল, তাহাই কুৎসিত। নারীজাতি যে সৌন্দর্য্যের বিচার করিতে পারে না, তাহা নয়; বরং তাহারা পুরুষ অপেক্ষা অনেক সময় সৌন্দর্য্য-দৃষ্টির প্রখরতাই দেখাইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে তাহাদের প্রেম-প্রীতি-স্নেহ ভক্তির আস্পদ, সেইখানেই তাহারা আর সৌন্দর্য্যের দোষ ধরিতে পারে না, সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি পক্ষপাতশূন্য রাখিতে পারে না। জননী আপনার পুত্র-কন্যাকে যত সুন্দর দেখেন, জগতের আর কিছুই তত সুন্দর দেখেন না, সাধ্বী আপনার পতিকে যেরূপ সুন্দর দেখেন, অন্য পুরুষকে সেরূপ দেখেন না; শিষ্যা আপনার গুরুকে যেরূপ ভক্তি করেন, শিষ্য সেরূপ করিয়া উঠিতে পারেন না। ফলে ভাবময়ীদিগের মন সর্ব্বদা ভাবেই বিভোর থাকে। ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহারা সকল বস্তু দেখিয়া থাকেন।

অনুরাগ সম্বন্ধে যেরূপ, বিদ্বেষ সম্বন্ধেও স্ত্রীজাতির ঠিক সেইরূপ। স্ত্রী-জাতি যাহাকে দেখিতে পারেন না, তাহাতে কোন গুণই খুঁজিয়া পান না। স্ত্রী-জাতির বিদ্বেষ সহজে প্রশমিত হয় না। তাই স্ত্রী-জাতির দ্বারা সংসারে অনেক অনর্থ জন্মে। রামের উপর সূর্পণখার বিদ্বেষই স্বর্ণলঙ্কা

ছারেখারে দিয়াছিল। নারী প্রেমে যেমন দেবী, বিদ্বেষে তেমনই দানবী। প্রেমাস্পদ, স্নেহভাজন, ভক্তির পাত্রকে দেখিলে রমণীর মানস-উৎস হইতে যেরূপ সুধার ধারা উচ্ছ্বসিত হয়, বিদ্বেষ বা বিরাগের পাত্রকে দেখিলে তাহার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রচণ্ডবেগে হলাহল নির্গত হইয়া থাকে। স্বল্প কারণে যদি কাহারও উপর নারীর মনের ভাবের বিপর্য্যয় ঘটে, অমনই তাহাদের বিচারের কাঁটাটি এক দিক্ হইতে অন্য দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। সেই জন্য কবি বলিয়াছেন,—

"Woman's at best a contradiction still."

সেই জন্য স্ত্রীলোকের ভালবাসাতে বিপদ্‌ও আছে।

"Alas ! the love of woman ; it is known
To be a lovely and a fearful thing."

নারীজাতিই সৌন্দর্য্যের উপাসক। তাই তাহারা নিজে সুন্দরী সাজিতে ভালবাসে; তাই তাহারা সহজেই বিলাসিনী হয়। নারী-জাতি কুৎসিত দেখিতে পারে না, তবে তাহাদের স্বতঃ উচ্ছ্বলিত প্রেম-সুধা অনেক সময় অহেতুকভাবে অনেক কুৎসিতকেও সুন্দর করিয়া লয়। তাই মনে হয়, নারীর মন পাওয়া ভার। সৌন্দর্য্য ভালবাসে বলিয়াই নারীরা আমোদ-প্রমোদ চাহে। ইহারা সদাই আনন্দময়ী হইয়া থাকিতে বাসনা করে। বোধ হয়, সংসারে আনন্দ বিলাইবার জন্য বিধাতা ইহাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই ইহারা আনন্দ চাহে, সোহাগ চাহে, যত্ন চাহে, ভালবাসা চাহে। ইহারা আপনার প্রেম দিয়া অন্যের প্রেম আকৃষ্ট করে এবং সেই সন্ধুক্ষিত প্রেমের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখে। যদি



কোনও রূপে সেই প্রেমে ভাটা পড়িবার লক্ষণ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে, সোহাগের, ভক্তির বা শ্রদ্ধার একটু ত্রুটি দেখিতে পায়, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকে না। অভিমান উথলিয়া উঠিয়া আঁখি-পথে নায়াগ্রার সৃষ্টি করে, আর সেই নায়াগ্রার প্রবল প্রবাহে অনেকের আনন্দ ভাসিয়া যায়। তাই মনে হয়, স্ত্রীজাতির মন সদাই চঞ্চল। কিন্তু বাস্তবিক উহা যত চঞ্চল বলিয়া মনে হয়, তত চঞ্চল নহে। ব্যাত্যাতাড়িত তরঙ্গসঙ্কুল নদীর উপরে নোঙ্গরে বাঁধা নৌকা যেরূপ চঞ্চল বটে, কিন্তু নোঙ্গরের রশির সীমা ছাড়াইয়া যায় না, স্ত্রী-জাতির চাঞ্চল্যও সেইরূপ চঞ্চল। কিন্তু সে প্রেমের শিকল ছিন্ন করিবার মত চাঞ্চল্য সহজে প্রকাশ করে না ; সে প্রেমের দরিয়ায় ডুবিয়া মরিবে, তথাপি শিকল ছিঁড়িবে না।

সুখের সময় রমণী যতই চঞ্চল হউন, দুঃখের সময় সে বোঝাই নৌকার মত অচল ও অটল থাকে, তাই সেবায়, শুশ্রূষায় রমণী অদ্বিতীয়া। সাধ্বী স্ত্রী যেমন আপনার সমস্ত সুখ-শান্তি তুচ্ছ করিয়া,সকল ক্লেশ ভুলিয়া স্বামীর সেবা করেন, স্নেহময়ী জননী যেমন নিঃস্বার্থতার অবতার হইয়া সন্তানের সেবা করেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। ফলে স্ত্রী-জাতিই এই সংসার-মরুমাঝারে পুরুষের মরুনন্দন। স্ত্রীর মন প্রণয়-পীযূষধারায় ক্লমক্লিষ্ট পুরুষকে সদাই সজীব ও সতেজ রাখে। স্ত্রী-জাতির হৃদয় হইতেই সংসারে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়। তাই স্ত্রী-জাতি সংসারে দেবী বলিয়া কথিত। স্ত্রী-জাতির মনেই সৌন্দর্য্য, দেহে নহে। পুরুষ যখন তাহার মানসিক সৌন্দর্য্যের সন্ধান পায়, তখন আর তাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করে না। জগতে যদি কিছু সুন্দর থাকে, তাহা হইলে তাহা স্বার্থকলুষশূন্য সুচরিত্রা



স্ত্রীলোকের মন। সেই মন বা হৃদয় হইতে দয়া-দাক্ষিণ্য, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা, নিষ্ঠা, ধর্ম্মশীলতা প্রভৃতি প্রবাহিত হইয়া পুরুষের কলুষরাশি ভাসাইয়া লইয়া যায়, তথায় পাপের লেশমাত্র নাই। তাই কবি বলিয়াছেন,—

"O woman ! lovely woman ! nature made thee
To temper man, we had been brutes without you.
Angles are painted fair to look like you.
There is in you all that we believe of heaven.
Amazing brightness, purity and truth.
Eternal joy and ever lastinglove."

কিন্তু যেখানে সুধা, সেইখানেই গরল। যে সাগর-মন্থনে সুধা উঠিয়াছিল, তাহা হইতে গরলও উঠিয়াছিল। বিশেষ যে জিনিস যত উত্তম, তাহা বিকৃত হইলে ততই অধম হয়; রমণীর মনও তাই। উহা বিকৃত হইলে একেবারে গরল হইয়া পড়ে, তাই সংসারে নারীরূপিণী রাক্ষসীও দেখা যায়। এই সংসারে স্বর্গ নরক একসঙ্গে থাকে, সুধাবর্ষী সোমই গরলের সহোদর।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস



লেখক—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভাব-বিকাশে সৌন্দর্য্য

কমলাকান্ত বলিয়াছেন,—"হে রূপ! হে বাহ্যসৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট! কাছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না, কেন না, দেখা কেবল নয়নে নহে। সংস্পর্শ বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না—আমরা সর্ব্বশরীরে দেখিয়া থাকি। মন হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে।"

এই রূপ-লালসা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু রূপ কি কেবল রমণীর? তাহা ত নহে।

"স্ত্রী-জাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রকলাপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রকলাপ ময়ূরের আছে; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর

নাই। যে ঝুঁটীতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষ-সকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চশ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে মূল বিদ্যাসুন্দরকার! তোমার মনে কি এই তত্ত্বটি উদিত হইয়াছিল? এই জন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক্ না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে?"

কথাটা বড়ই সত্য। তাই পুরুষ রমণীর কমনীয় কোমলতায় মুগ্ধ হয়, আর রমণী পুরুষের কঠোরতায় মুগ্ধা হয়। সে কথা প্রসিদ্ধ লেখক কিংসলী বুঝাইয়াছেন। রমণী যতই কেন পুরুষ-ভাবাপন্না হউন না, পুরুষের পৌরুষের প্রভাব রমণীকে অনুভব করিতেই হইবে। ইংরাজ কবি টেনিসন তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত 'প্রিন্সেস' কাব্যে তাহাই বুঝাইয়াছেন, আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ রমণীকে দিয়া বলাইয়াছেন—

"তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন
আপনি অটল রবে আপনার পরে
স্বতন্ত্র উন্নত; তবে ত আশ্রয় পাব
আমরা লতার মত তোমাদের শাখে!

*　　*　　*　　*



তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময়, কিছু
উদাসীন ; কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত ;
সহস্র পাখীর গৃহ, পান্থের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয়।"

* * * *

পুরুষের যাহা অসম্পূর্ণতা, রমণী তাহাই সম্পূর্ণ করেন। সে—কোমলতা দিয়া। কবি স্কট বলিয়াছেন,—রমণী, আমাদের সুখের সময় তুমি সহজে তৃপ্ত হও না—তখন তুমি লজ্জাতুরা, ছলনাময়ী, কিন্তু—

"যাতনা তাড়িত যবে, ব্যথিত যখন ;
দেবীমূর্ত্তি হেরি তব, রমণী তখন।"

রমণীর রূপ পুরুষের নয়নে ভুবনবিমোহন! যাহা ভালবাসি, তাহা নানা ভাবে—নানা রূপে দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না ; বলিতে ইচ্ছা হয়—

"জনম জনম হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

বৈষ্ণব কবির এ কথার যাথার্থ্য কে না স্বীকার করিবে ?



স্কটের কথা—

"গোলাপ সুন্দরতম ফোট ফোট করে যবে ধীরে ;
আশা সমুজ্জ্বলতম ভীতি হ'তে মুক্তিপথে তার ;
গোলাপ মধুরতম সিক্ত যবে প্রভাত-শিশিরে ;
প্রেমিকা সুন্দরীতমা—নেত্রে যবে শোভে অশ্রুভার।"

আর প্রেমিকের ত কথাই নাই। সেকৃসপিয়র বলিয়াছেন—প্রেমিক পাগলেরই মত, মৈশরীর ভ্রূবিলাসে তিলোত্তমার সৌন্দর্য্যও সন্দর্শন করেন। কালিদাস বিরহী পত্নীবর্ণনায় বলাইয়াছেন—সে আমার—

তন্বী শ্যামা, সুদশনা, ওষ্ঠাধর পক্ক বিম্বফুটি ;
ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি, চকিতহরিণী আঁখি ছুটি ;
শ্রোণীভার মন্দগতি, স্তনভারে ঈষৎ আনতা,
প্রথমা প্রমদা যেন সযতনে সৃজিলা বিধাতা।"

সেই 'হিমে কমলিনী"র মত বিরহতাপতপ্তার কথা মনে করিয়া আষাঢ়ের মেঘালোকে যক্ষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। আর উশীরানুলিপ্ত স্তনাগ্রভাগ, শিথিল মৃণালবলয়, বিরহতাপক্লিষ্টা শকুন্তলা, সেও কি কম সুন্দরী ? এই ত বিরহে ;—কিন্তু কি বিরহে, কি মিলনে প্রিয়তমার রূপ-রাশি যে সর্ব্বদাই হৃদয় আলোকিত করিয়া রাখে—

"হৃদয়ে রয়েছ ত অবিরত মদির আঁখি ;
হিয়া তোমারি কাছে বাঁধা আছে জান না তা কি ।

বিরহ-চিন্তা

যদি আরেক তর মনে কর, বলি লো শুন-
একে অতনুরে আছি ম'রে, মরিব পুন ।"



রমণী সর্ব্বদা সুন্দরী। রমণী যখন কোপ-প্রেম-গর্ব্বস্ফুরিতাধরা, তখনও সুন্দরী, যখন বিষাদাবনতমুখী, তখনও সুন্দরী। রমণী প্রেমে সুন্দরী—রমণী মানে সুন্দরী। সে মাধুরীতে যখন ঔজ্জ্বল্য মিশে, তখনও সৌন্দর্য্য উছলিয়া উঠে—"যখন নৈশ নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে, মিশে; যখন সুন্দরীর সজলনীলেন্দীবরলোচনে বিদ্যুৎখচিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন স্বচ্ছ নীলসরোবরশায়িনী উন্মেষোন্মুখী নলিনীর দলরাজি বালসূর্য্যের হেমোজ্জ্বল কিরণে বিভিন্ন হইতে থাকে, নীলজলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালার উপরে দীর্ঘ রশ্মিসকল নিপতিত হইয়া পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুকে জ্বালিয়া দিয়া, জলচর বিহঙ্গকুলের কলকণ্ঠ বাজাইয়া দিয়া, জলপথের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিতে যায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; আর যখন তোমার গৃহিণীর পাদপদ্মে ডায়মনকাটা মল বাজিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন সন্ধ্যাকালে গগনমণ্ডলে সূর্য্যতেজ ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া নীলিমা তাহাকে ধরিতে ধরিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,—আর যখন তোমার গৃহিণী কর্ণাভরণ দোলাইয়া তিরস্কার করিতে করিতে তোমার পশ্চাদ্ধাবিত হন, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। * * * * যখন প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বসন্তের কোকিল ডাকিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; আর যখন প্রদীপমালার আলোকে রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া রমণী সঙ্গীত করে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।"

বিরহে রমণী সুন্দরী। আর মিলনে ভাববৈচিত্র্যে সৌন্দর্য্য স্ফূর্ত্ত হয়। জয়দেব যে বৈচিত্র্য চিত্রিত করিয়াছেন—

সৌন্দর্য্য

"পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চতি পঞ্চমরাগম্।
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজং
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্॥
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে।
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে॥
করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে।"

"বিপিনে গোপিনী রাজে পুলকিত বনমাঝে,
হরির বাঁশরী বাজে শ্রুতিবিনোদন ;
কেন নাচে হরি সঙ্গে করতালি দিয়া রঙ্গে,
মিশে বাঁশী-সুরসঙ্গে বলয়-শিঞ্জন।

পীবর যৌবনভরে অবনত কলেবরে,
কোন গোপনারী করে কৃষ্ণে আলিঙ্গন ;
অনুরাগ ফুল্লপ্রাণ পঞ্চমে তুলিয়া তান
গাহিছে মধুর গান মোহিয়া শ্রবণ।

বিলোল কটাক্ষ-শোভা আঁখিযুগে মনোলোভা,
ধরিছে দ্বিগুণ বিভা হরির আনন ;

কোন বা গোপের বালা হৃদয়ে প্রণয়-জ্বালা,
তন্ময় ধেয়ায় কালা-মুখ-বিমোহন।
কোন নারী কুতূহলে যেন সে কি কথা বলে,
কপোল পরশে ছলে অধরে মোহন।
হেরি' হরিমুখ'পরে পরশপুলকভরে
তৃষিত অধরে করে সরস চুম্বন।
শিরীষ-কোমল দেহ প্রবেশিতে চাহে কেহ
নদীকূলে কুঞ্জগেহ—বেতসে গঠন।
প্রণয়ে অধীরা নারী বিলম্ব সহিতে নারি,
হরির দুকূল ধরি' করে আকর্ষণ।"

আর মানে মানময়ী রমণী ত চিরসুন্দরী। তখন পিপাসার বারি নিকটে, কিন্তু পিপাসা মিটে না—তাই তখন পুরুষ বলেন—

স্ফুরদধরসীধরে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্।"

কারণ—

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।

এ সংসার-বৃন্দাবনে রমণীই পুরুষের আকর্ষণ—রমণী পুরুষের গতি—

"তোমারি লাগিয়া রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি।"

সৌন্দর্য্য

সত্যই—

"স্নেহের প্রতিমা প্রেমের সাগর,
করুণা-নিকর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময়, সব চরাচর,
জগতে নারী না থাকিত যদি।"



রমণীর রূপবহ্নির দাহে কত সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছে—সেই দাহের গীত প্রাচ্যে রামায়ণ ও প্রতীচ্যে ইলিয়ড। কিন্তু বহ্নির অপর নাম—



সর্ব্বশুচি। তাহার মত পবিত্র আর কিছুই নাই। সে যে কেবল স্বয়ং পবিত্র, তাহাই নহে—সে যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেও পবিত্র করে। রমণীর রূপ পবিত্র—মাতৃরূপে তাহার পূর্ণ পরিণতি—পূর্ণবিকাশ। গৌরী সুন্দরী। কালিদাস তাঁহার রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন—

অঙ্গুল বর্ত্তুল স্থূল, নখর-কিরণ
নিক্ষেপেতে রক্ত আভা করে উদ্‌গিরণ ;
স্থলকমলের শোভা করিয়া হরণ,
অবনীতে অবতীর্ণ উমার চরণ ॥

শিখিতে কি মঞ্জীরের মধুর নিস্বন
চরণ-চারণে শিক্ষা দিল হংসগণ ?
নহে কেন ধরিলেন নত-কলেবরা
বিভ্রম-বিক্রমযুক্ত গতি মনোহরা ?

নহে অতি দীর্ঘ, স্থূলতার হ্রাস
সুবৃত্ত জানুর শোভা বিশেষে বিকাশ ;
সৌন্দর্য্যের শেষ বিধি করিয়া তথায়
শেষাঙ্গ রচিতে রূপ সঞ্চে পুনরায় ॥

করিবর-কর-চর্ম্ম বিশেষে কর্কশ,
রামরম্ভা তরু অতি শীতল-পরশ ;



কেবল বিশাল ভাব ধরিলে কি হবে ?
উমা-উরু উপমান নাহি দেখি ভবে ॥



প্রার্থনা



তার পর, নিরুপম কাঞ্চী-গুণ-স্থান,
কি আর বর্ণিব তাহা করি অনুমান ?
অন্য নারী মোহিবারে নারিল যে হরে,
তিনি তারে নিজ অঙ্কে স্থাপিলেন পরে।

তনুতর নব রোমরাজি শোভাধার
প্রবেশিল নতনাভি-বিবরে তাঁহার,
নীবি অতিক্রম করি অপরূপ সাজে ;
নীলমণিচ্ছটা যেন কাঞ্চীগুণ-মাঝে ॥

বেদীসম কৃশোদরী-কটি শোভাকর ;
ধরিলেন তাহে বালা ত্রিবলী সুন্দর ;
মদনের আরোহণে সোপান সমান
নব-যৌবনের যোগে হইল নির্ম্মাণ ॥

কমলনয়নী-কুচদ্বয় পরস্পর
ঘরষণে পাণ্ডুবর্ণ বাড়িল সুন্দর ;
শ্যামমুখ স্থূল কুচযুগল-মাঝারে,
মৃণালের সূত্র মাত্র সঞ্চারিতে নারে ॥

উমা-বাহুযুগে, এই বিতর্ক আমার,
শিরীষ-কুসুমাধিক হবে সুকুমার ;
মনোভব পরাভব করিলা যে ভব,
তাঁহার কণ্ঠের পাশ যে বাহু সম্ভব ॥



সমুন্নত পয়োধরে কণ্ঠ সুবন্ধুর,
মুক্তামালা-শোভা তথা বাড়িল প্রচুর ;
উভয়ই উভয়ের শোভার জনন,
ভূষা আর ভূষ্যভাব হ'ল সাধারণ ॥

চন্দ্রে গিয়ে সরোজ-সুরভি প্রাপ্ত নহে,
পদ্ম-গতা তথা চন্দ্র সুধা নাহি রহে,
চপলা কমলা তাই উমার বদনে,
উভয়ের গুণ লভি রহে প্রীতমনে ॥

নবীন পল্লবে যদি কুসুম ঘটিত,
প্রবালেতে মুক্তাফল যদি প্রকটিত,
উমা অরুণিত ওষ্ঠে স্মিত নিরমল,
তবে সে হইত তাহা উপমার স্থল ॥

কিন্তু সে রূপের পূর্ণতা গণেশজননীতে। সেই রূপ দেখিয়া যেমন "রাণী ভাসেন নয়ন-জলে,"—তেমনই বিশ্ববাসীও বিমুগ্ধ হয়।

পিগমেলিয়ন—স্বরচিত প্রতিমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল—ভগ্নহস্ত ভিনাস-ডি-মিলোর সৌন্দর্য্য আজও বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতেছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ আনন্দের মত পবিত্র—মধুর আনন্দ বুঝি জগতে আর নাই।

রমণী-রূপবহ্নি ভাবুকের হৃদয়ে ভাব জাগাইয়া তুলে, কবির হৃদয়ে



কবিত্ব প্রদীপ্ত করে। তাই রমণী-রূপলাবণ্য-মুগ্ধ কবির গানে জগতের সকল সাহিত্য সমুজ্জ্বল। সে বহ্নিদাহে লালসার কলুষ ভস্ম হইয়া যায়—কামনার কল্মষ বিনষ্ট হয়। তাই রমণীর—দেবীর—শক্তির—করুণাময়ীর রূপলাবণ্য যুগে যুগে বিশ্ববাসীর আকাঙ্ক্ষার বস্তু—যুগে—যুগে বিশ্বমোহন।

সম্পূর্ণ